অবন্তী পর্ব

রম্যাণি বীক্ষ্য

উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ-কাহিনী

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী



এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৭৩

RAMYANI BEEKSHYA

Avanti Parva

(A Bengali Travelogue)

By Subodh Kumar Chakravarti

প্রকাশক :
জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার,
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কো° প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৬৭

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শ্রীসুধীর মৈত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীএককড়ি ভড়
নিউ শক্তি প্রেস
১০, রাজেন্দ্র সেন লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

শ্রীবুদ্ধদেব বসু
শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই লেখকের লেখা

ছোট গল্প

অয়ি অবন্ধনে, কী মায়া

●

ভ্রমণের গল্প

সুন্দর নেহারি, কেরালার উপকূলে

●

ভ্রমণ কাহিনী

তীর্থের পথে, রূপমতীর দেশে, কানাড়া দেখা হল না, তীর্থপরিচয় (যন্ত্রস্থ)

●

ভ্রমণ সঙ্কলন

শ্রীসুষমা চক্রবর্তীর সহযোগিতায়

শতবর্ষের পথযাত্রা

●

ভ্রমণ উপন্যাস

মণিপদ্ম, তুঙ্গভদ্রা, একজন লামা ও মানস সরোবর, আরও আলো, কুটিল কুমায়ুন, কাশ্মীরী বাহার, তিন পাহাড়

●

উপন্যাস

রূপম ?, সেই উজ্জল মুহূর্ত, একটি আশ্বাস, জনম জনম, মেঘ, কঙ্কিরুবাচ, আর চাঁদ, তারারআলোর প্রদীপখানি বাঁধ ভেঙে দাও, মৌন মন, তারা ভেসে চলেছে, চোখের আলোয় দেখেছিলেম, একটি নাটক নিয়ে

●

ছোটদের জন্য

আমাদের দেশ

উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মহিসুর ও তামিলনাড়

●

শাশ্বত ভারত

দেবতার কথা, ঋষির কথা, অসুরের কথা ও উপদেবতার কথা

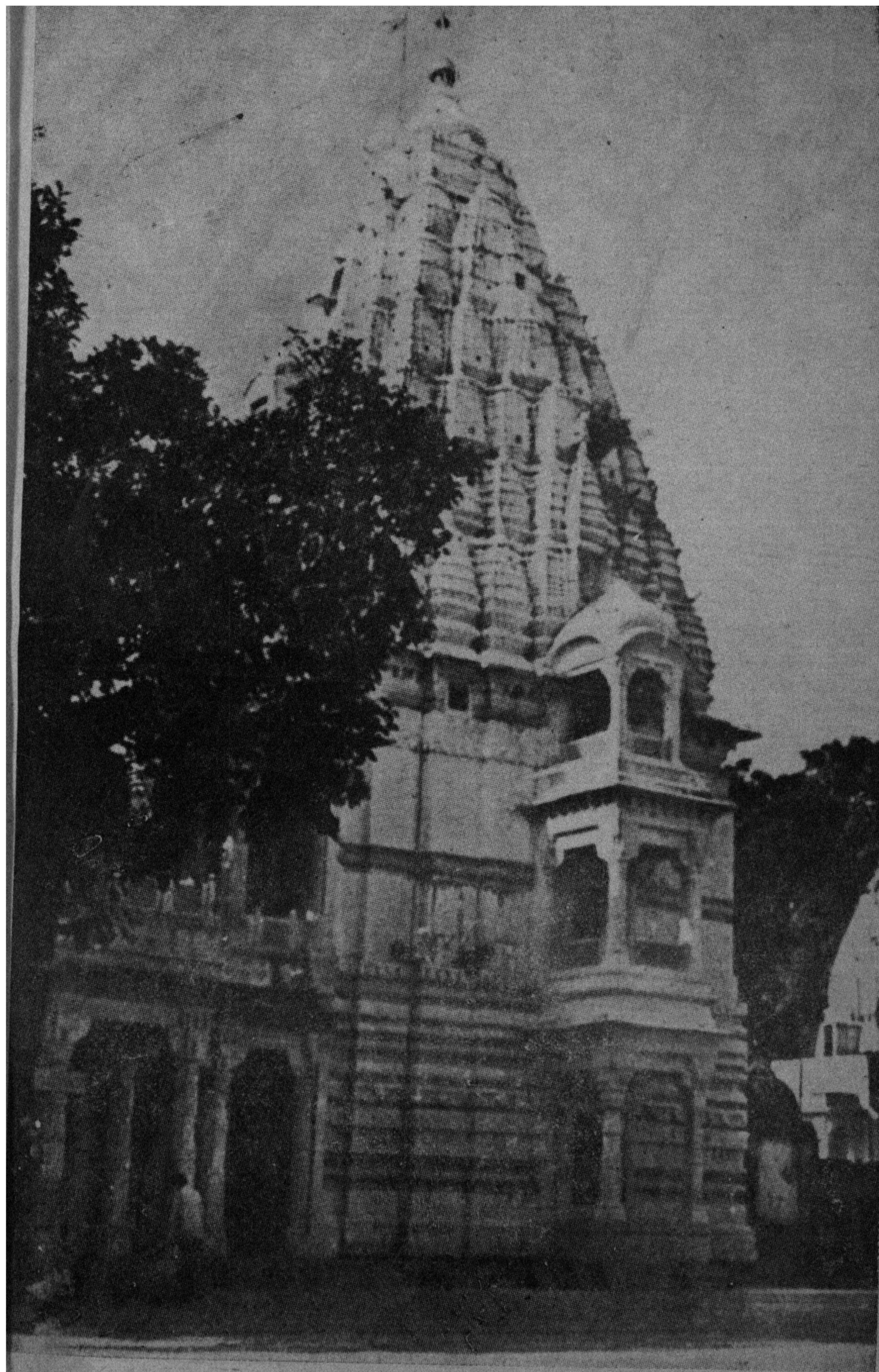
●

রম্যাণি বীক্ষ্য

অন্ধ্র, তামিল, কেরল, কর্ণাট, কালিন্দী, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র, কোঙ্কণ, অবন্তী, উৎকল, মগধ, কোশল, হিমাচল, কাশ্মীর, কামরূপ, গৌড়, ভাগীরথী, হিমালয়, মরুভারত, প্রাচী ও কিষ্কিন্ধ্যা পর্ব

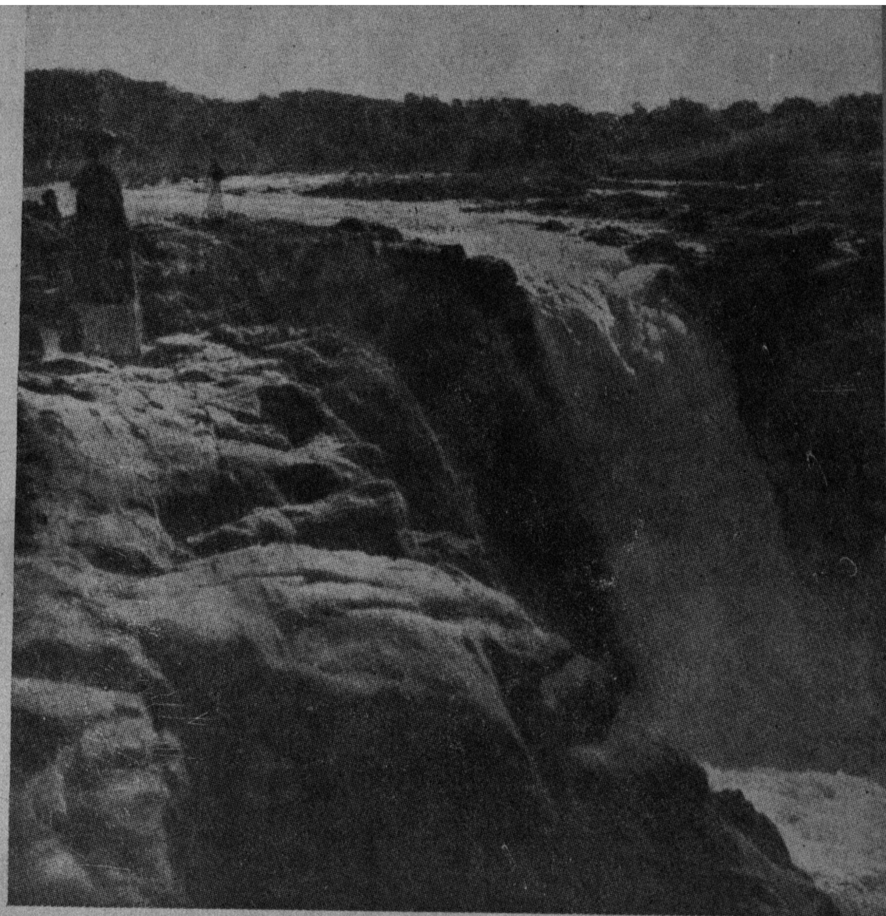
●

বিষ্ণুপুরাণ (সারানুবাদ), কোথায় ঈশ্বর, মার্কেণ্ডেয় পুরাণ



উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দির

(উপরে) উজ্জয়িনীর যন্তর মন্তর, (নিচে) শিপ্রার ঘাট



নর্মদার জলপ্রপাত, জব্বলপুর



…হোর কাণ্ডারীয় মন্দির

ফটো ঃ ডঃ শীতাংশু মিত্র

১

শৈশবে এক সাধুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম। মাথায় জটা নেই, গায়ে ভস্ম নেই, গলায় নেই রুদ্রাক্ষের মালা। একখানা বাঘছাল, কি একটা কমণ্ডলুও সঙ্গে নেই। আমি বলেছিলুম : এ কেমন সাধু!

পরনে এক খণ্ড সাদা কাপড়, গলায় পইতে। গাছের ছায়ায় বসে সাধু রামায়ণ পাঠ করছিলেন গুনগুন করে। আমার দিকে চেয়ে একটুখানি হেসেছিলেন।

কাছে গিয়ে আমি বলেছিলুম : হাসলেন যে?

আমি তো সাধু নই, ভণ্ডও নই। সাধু সাজলে ভণ্ডামি হত।

তবে সাধুর মতো ঘুরে বেড়ান কেন?

সাধু হেসে বলেছিলেন : ঘুরে বেড়াতে যে ভাল লাগে।

পর দিন সকালে এসে সাধুকে আর দেখতে পাই নি। গাছের নিচে লোক জমবার আগেই তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন।

তারপর অনেক দিন সেই সাধুর কথা ভেবেছি। ঘুরে বেড়াবার শখে তিনি সাধু হয়েছিলেন। আমাদেরও শখ আছে, কিন্তু সাধু হই নি। সংসারে থেকে পথের ডাক শুনি। সে ডাক সমুদ্রের গর্জনের মতো নয়, বাঁশির সুরের মতোও নয়। সে ডাক ফুলের সৌরভের মতো নিঃশব্দে বয়ে আসে বাতাসে। আফিঙের নেশার মতো মন আচ্ছন্ন করে, অস্থির করে চিত্ত। সে ডাকে সাড়া না দিয়ে কে থাকতে পারে জানি নে। যে স্থির হয়ে থাকে, তার কানে নিশ্চয়ই পথের ডাক পৌঁছয় না।

হিমালয়ের কথা শুনেছি। হিমালয় ভোলা যায় না একবার দেখলে। এক সন্ন্যাসী নাকি একবার বলেছিলেন, জন্মান্তরেও তার স্মৃতি জেগে থাকে, আকর্ষণ করে চুম্বকের মতো। ভগবান কোথায়? কে দেখেছে ভগবান? হিমালয়ের টানেই তো মানুষ সন্ন্যাসী হয়।

নয়তো এই ঘোর বস্তুবাদের দিনেও এত সন্ন্যাসী কেন হিমালয়ের বুকে! সেখানে ত্যাগ কোথায়! প্রাণ ভরে সেখানে সবাই সৌন্দর্য উপভোগ করছে।

পথের যে টান আছে, দিনে দিনে একথা আমার বিশ্বাসে পরিণত হচ্ছে। তা না হলে বেড়াবার জন্য এই পাগলামি কেন প্রতি দিন বাড়ছে! শুধু একটু প্রশ্রয়ের প্রতীক্ষা, শুধু একটা ডাক। অনিশ্চিতের পথে বেরিয়ে পড়তে এতটুকু দ্বিধা জাগে না। তা জাগলে কি এমন করে খাণ্ডোয়ায় নেমে পড়তে পারতুম!

সোমনাথ থেকে সোজা দিল্লী ফিরতে মামা রাজী হন নি, বলেছিলেন, সৌরাষ্ট্র দেখলুম, গুজরাত আর মহারাষ্ট্র দেখব না!

আমি আমার চাকরির কথা স্মরণ করিয়ে বলেছিলুম, আর দেরি করলে আমার চাকরিটা যাবে।

গম্ভীর ভাবে মামা বলেছিলেন, গেলেই বাঁচি।

এটা শুধু তাঁর রাগের কথা নয়, মনের কথাও। তাঁর ধারণা যে কেরানীগিরিতে আমি আমার ক্ষমতার অপচয় করছি। আমার মধ্যে ক্ষমতার কী পরিচয় পেয়েছেন তিনিই জানেন, কিন্তু দিনে দিনে এ ধারণা তাঁর বদ্ধমূল হয়েছে। মামা আমার আপন মামা নন, পাতানো মামা। আমি পাতাই নি, মামাও না। তু-পুরুষ আগে পাতানো হয়েছিল। যোগাযোগের অভাবে সম্বন্ধটা শেষ হয়ে যাচ্ছিল। এই ভ্রমণ উপলক্ষেই আবার তা ধীরে ধীরে বেঁচে উঠছে।

মামা আমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। দেশের আইনে তাঁর জমিদারী গেছে, কিন্তু ব্যবসা উঠছে ফেঁপে। বৃটিশ আমলে জমিদার অঘোর গোস্বামী রায়সাহেব খেতাব পেয়েছিলেন, আজ স্বাধীন ভারতে এম. পি. অঘোর গোস্বামী ইচ্ছা মতো বাণিজ্যের লাইসেন্স বার করছেন। মামার প্রস্তাবে যে আন্তরিকতা ছিল, তাতে আমার সন্দেহ হয় নি। সেই দিনটির কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। ত্রিবেন্দ্রামের আলো-অন্ধকারে, বৃষ্টিতে আর রোদ্রে,

চড়াই আর উৎরাই-এ, ছায়ায় ও মায়ায় তখন নেশা ধরেছে মনের গভীরে। মামা বলেছিলেন, তোমাকে আর ছেড়ে দেব না গোপাল, ভাবছি আমার কাজকর্ম দেখাশোনার ভার তোমাকেই দেব।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, সরলাদির স্নেহের ঋণ আমার শোধ হয় নি।

সেই মুহূর্তে মামার অন্তরটা যেন আমি দেখতে পেয়েছিলুম স্বচ্ছ ভাবে। এই তাঁর সত্যকার রূপ। এত দিন যা দেখেছি আর যা শুনেছি, সে তাঁর অভিমান, কথার জাল দিয়ে স্নেহের উৎস আটকাবার চেষ্টা।

মামার প্রস্তাবে আমি রাজী হতে পারি নি। আপত্তি যে শুধু নিজের মন থেকেই উঠেছে তা নয়, তার চেয়েও বড় অন্তরায় ছিল স্বাতির অনুরোধ। কন্যাকুমারীর সমুদ্র-তটে বসে সব কিছু আমরা ভুলে যেতে চেয়েছিলুম। আকাশে চতুর্দশীর চাঁদকে ঘিরে বসেছিল নক্ষত্রের নৃত্যসভা। পায়ের নিচে আছড়ে পড়ছে ঢেউ-এর পর ঢেউ। একটানা গর্জন উঠছে দুরন্ত সমুদ্রের। বাতাসে স্বাতির আঁচল উড়ছে, আর আকাশে আলোর প্লাবন। কিন্তু অত জল অত আলো অমন অসীম উদার পরিবেশেও স্বাতি নিজেকে হারাতে পারে নি। বলেছিল, গোপালদা, একটা অনুরোধ আছে তোমার কাছে। দেশে ফিরে বাবার অনুগ্রহ নিয়ে নিজেকে কোনদিন ছোট কোরো না।

স্বাতির কাছে অঙ্গীকার করেছিলুম নিঃশব্দে। তার মনের কথা যে আমি বুঝেছিলুম। যে সুযোগের অভাবে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে আছে, সে সুযোগ আমি চেয়ে নেব না, নেব কেড়ে। আদর্শ থাকবে না শুধু কথায়, জীবনটাই আমার আদর্শ হয়ে উঠবে। পার্থিব সুখের বদলে স্বাতি মানসিক তৃপ্তি চায়। সেই আশা থেকে তাকে বঞ্চিত করলে সে আমায় ক্ষমা করবে না। মামার প্রস্তাবে তাই আমি রাজী হতে পারি নি।

দিল্লীতে মামা আমাকে বলেছিলেন, আমার কাছে মাথা নোয়ালে না, নোয়াবে পরের কাছে। জগতের রীতিই এই। যত আপন, তার সঙ্গে তত লুকোচুরি। সংসারের অভাব-অভিযোগ দুনিয়ার লোকে দেখে যাক তাতে বাধা নেই, আত্মীয়-বন্ধুতে দেখলেই যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়।

স্বাতি বলেছিল, বাবা তোমাকে সবই দিতে পারতেন, দিতেনও। প্রত্যাখ্যান করে তুমি যে ধাক্কা দিয়েছিলে, তাতে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম তোমার মর্যাদা জ্ঞান দেখে।

তারপর?

তারপর স্বাতির সঙ্গে নূতন কোন সম্পর্ক গড়ে উঠল না। উঠতে পারে না। সামাজিক বাধা বড় দুস্তর। সেই বাধা অতিক্রম করতে যে মনোবলের প্রয়োজন, তা কি আমাদের আছে! মামার ধারণা, আমার এই কেরানীর চাকরিই সব চেয়ে বড় বাধা। এই চাকরি ছাড়লে আমাদের সামাজিক ব্যবধান দূর হবে। তাই তিনি আমার চাকরি যাবার ভয়ের কথা শুনে বলেছিলেন, গেলেই বাঁচি।

আমি বাঁচি না। আমাকে স্বাধীন ভাবেই বাঁচতে হবে। তবু আমাকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। সোমনাথ থেকে আসতে হয়েছিল বম্বে। বম্বে থেকে মহারাষ্ট্র দেখে কলকাতায় ফিরছি।

স্বাতিরা আরও কয়েকটা দিন সেখানে থাকবে। শহরটা সকলের ভাল লেগেছে। পার্লামেন্টের সেসন শুরু হবার আগে দিল্লী পৌঁছলেই তাঁদের চলবে। তাই তাঁরা নিশ্চিন্ত মনে আমাকে কলকাতার গাড়িতে তুলে দিয়ে গেলেন।

কিন্তু কলকাতার টিকিট কেটে আমি খাণ্ডোয়ায় কেন নামলুম সেই কথা বলি।

ট্রেন ছাড়বার পর আমি একটা কোণায় এসে বসেছিলুম। ভেবেছিলুম, কিছু দিনের মতো বুঝি ছুটোছুটির শেষ হল, এবারে চাকরিতে যোগ দিতে পারব নিশ্চিন্ত মনে। কিন্তু আমার বিধাতা

অদৃশ্যে বসে হাসেন, অন্তরালে থেকে যেন দাবা খেলেন আমার সঙ্গে। অনেক ভেবে চিন্তে একটা চাল দিয়ে দেখেছি, ওধারের খেলোয়াড়ের বুদ্ধি অনেক বেশি। নিমেষে আমার চালকে বেচাল করে দিয়েছেন। হয় সামনে এগোবার পথ নেই, নয় একটা মূল্য দিয়ে যাও। আমি থেমে থাকতে রাজী হই নি, আমি মূল্য দিয়েই এগোচ্ছি। কিন্তু পারানির কড়ি যে শেষ হয়ে এল।

একটি বছর ছয়েকের ফুটফুটে ছেলে কাছে এসে আমার ঝোলাটা পরীক্ষা করছিল। এক সময় বলে উঠল: এর ভেতর কী আছে?

আমি চমকে উঠেছিলুম। ছেলেটিকে টেনে নেবার আগে একবার চারিধারটা দেখে নিলুম। এক জোড়া সুন্দর চোখ ছেলেটিকে নজর রেখেছে। বড় সতর্ক দৃষ্টি, প্রসন্নও বটে। তাড়াতাড়ি আমি চোখ ফিরিয়ে নিবে দু হাতে ছেলেটিকে কাছে টেনে নিলুন। ঝোলার ভিতরটা দেখিয়ে বললুম: কী নাম তোমার?

জানো না বুঝি? সবাই তো জানে। বাবা জানে, মা জানে—

তবে আমিও জানি। তোমার নাম খোকন।

ছেলেটি হেসে উঠল।

তাড়াতাড়ি বললুম: মনে পড়েছে। খোকা তোমার নাম।

মাথা দুলিয়ে খোকা বলল: এখন আর ও নাম নেই। এখন আমার নতুন নাম। কি নাম বল তো?

আমি তাকে আমার পাশে বসিয়ে নিয়েছিলুম। খানিকটা তফাতে এক ভদ্রলোক বিছানা বিছিয়ে বসে ছিলেন, বললেন: সবাইকে তুমি বলতে নেই, আপনি বল।

খোকার মাকে আগেই চিনেছিলুম, এবারে তার বাবাকেও চিনতে পারলুম। ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে সিগারেট টানছিলেন। একটু অপ্রসন্ন ভাব। মনে মনে যে বিরক্ত হয়ে আছেন, তা তাঁর ধরন দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আমি খোকাকে উত্তর দিলুম: তা হলে তোমার নতুন নাম হল মনোজিৎ।

খোকা হাততালি দিয়ে উঠল : হল না।

বললুম : তা হলে পূর্ণেন্দু।

খোকা এবারে খিলখিল করে হেসে উঠল।

এবারে আমি জোর দিয়ে বললুম : তোমার খোকা নাম, আমি খোকা বলেই ডাকব।

মা তা হলে রাগ করবে।

কেন ?

বিজ্ঞের মতো খোকা বলল : আমার খোকা নাম তা হলে কোন দিন ঘুচবে না। ছেলেও বাপকে খোকা বলে ডাকবে।

এ যে মায়ের কথা, তা বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না। মহিলা তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিলেন, বোধ হয় হাসি লুকোচ্ছেন। আমি বললুম : কোথায় যাচ্ছ এখন ?

আমরা ? আমরা তো মাণ্ডু যাচ্ছি।

সে আবার কোথায় ?

মাণ্ডু জানো না !

না।

ধারা থেকে মাণ্ডু। মার কাছে বই আছে, পড়বে ?

না না, বই থাক্। আমি তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি। তোমার ঘুম পাচ্ছে না ?

রাত আটটায় গাড়ি ছেড়েছে। বম্বে শহরের বুক চিরে ছুটে চলেছে। ধোঁয়া নেই, ধুলো নেই, পথের দু ধারে অন্ধকারও নেই ঘন হয়ে থিতিয়ে। গাড়ির ভিতরে ঝকঝকে আলো। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জীবনে আলো না থাক্, গাড়ির এ আলো নিববে না। এই কৃত্রিম আলোই বাহিরের জমাট অন্ধকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। শহরের সীমানা পেরলেই সেই অন্ধকার এই গাড়ির ভিতর হুমড়ি খেয়ে পড়বে। তাইতেই ঘুমের কথা মনে এল।

খোকা বলল: আমি কি আর কচি খোকাটি আছি যে সন্ধ্যে বেলাতেই ঘুমিয়ে পড়ব!

এও নিশ্চয়ই তার মায়ের কথা। বললুম: তা তো বটে।

খোকা এবারে আর একজন যাত্রীর সামনে গেল। সে ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে জানলার বাহিরে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বোধ হয় সাহস পেল না। আমার কাছেই ফিরে এসে বলল: তোমার বিছানা কোথায়?

আঙুল দিয়ে আমার চাদর-জড়ানো বালিশটা দেখিয়ে দিলুম। শোবার জায়গা নেই।

নিজের বিছানা দেখিয়ে খোকা বলল: তুমি ওইখানে শোও।

হেসে বললুম: বড় হয়ে তুমি তোমার জায়গা ছেড়ে দিয়ো, আজ নয়।

বড় হয়ে ত্যাগের কথা সবাই ভুলে যায়, দিতে কেউই রাজী হয় না। ওটা বয়সের ধর্ম। সবাই তখন চায়, ইচ্ছা শুধু পাবার। যে কিছুই চায় না আর যে সবই দিতে পারে, তাকেই আমরা সত্যিকারের বড় বলি। তেমন বড় মানুষ যে দিনে দিনে দেশে দুর্লভ হচ্ছে। আমার কথা শুনে খোকা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। বললুম: এবারে তোমার নাম বল।

অভিমন্যু।

বাঃ, চমৎকার নাম তো!

আমি মহিলার চোখের দিকে তাকিয়ে একটা তৃপ্তির ইঙ্গিত পেলুম। বললুম: জান খোকা, অভিমন্যু যাদের নাম, তারা খুব তাড়াতাড়ি সব শিখে ফেলে।

আমিও শিখব।

নিশ্চয়ই শিখবে।

জান, আমার জন্যেই মা বেড়াতে বেরিয়েছে!

সত্যি নাকি! তোমরা বুঝি ধারা দেখবে?

অভিমন্যু মাকে জিজ্ঞাসা করল : দেখব নাকি মা?

মা মাথা নাড়লেন সম্মতিতে।

বললুম : কালিদাসের জন্মস্থানটা তা হলে দেখে নিয়ো। কলিদাসের নাম শুনেছ তো? কবি—মস্ত বড় কবি!

অভিমন্যুর বাবার কথায় বাধা পেলুম। গম্ভীর গলায় তিনি বললেন : এবারে শুতে এস।

আমার চেয়ে বেশি লজ্জা পেলেন অভিমন্যুর মা। সেই লজ্জা ঢাকার জন্যই যেন আমার সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন : কালিদাসের জন্ম ধারায়, না উজ্জয়িনীতে?

শুধুমাত্র সৌজন্য রক্ষার জন্যই উত্তর দিলুম : কেউই সে কথা জানে না।

তবে এ কথা কেন বলছেন?

এও একটা মত আছে। ধারার মাইল দেড়েক দূরে একটা কালীস্থান আছে, ধারার লোকেরা বলে কালিদাসের সাধনার স্থান।

আপনি দেখেছেন বুঝি?

না।

মহিলা আমার সম্পূর্ণ উত্তরের জন্য মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বললুম : বইএ পড়েছি। কালিদাস আর ভোজরাজকে নিয়ে একটা মজার গল্প আছে। তুমি শুয়ে পড় অভিমন্যু।

আগে তোমার মজার গল্প বল।

অভিমন্যুর মা বললেন : ও শোবে না। আপনি গল্প বলুন।

বললুম : ধারার রাজা ভোজরাজের সভাসদ ছিলেন কালিদাস। ভারি বন্ধুতা। কিন্তু এক দিন ঝগড়া হয়ে গেল। কালিদাস বললেন, আর নয়, এ রাজ্যে আর থাকব না। বলে চলে গেলেন। ভোজরাজের মন খারাপ। এত দিনের পুরনো বন্ধু এমন করে এক কথায় চলে গেল! অনেক ভেবে চিন্তে তিনি এক ফন্দি বার করলেন। নিজের মৃত্যু-সংবাদ তিনি নিজেই রটিয়ে দিলেন। বুঝলে অভিমন্যু,

রাজ্যের লোক শুনল যে ভোজরাজ মারা গেছেন। আর এ দিকে তিনি ছদ্মবেশে নগরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত যা ভেবেছিলেন তাই হল। ভোজরাজের মৃত্যুর খবর কালিদাসের কানেও পৌঁছল। তাঁর ভারি দুঃখ হল। ভাবলেন, বন্ধুর রাজ্যের কী দশা হল একবার দেখে আসি। এসে দেখলেন, সবই নিরানন্দ।

তারপর অভিমন্যুর মায়ের দিকে তাকিয়ে বললুম: কালিদাস বললেন—

অদ্য ধারা নিরাধারা নিরালম্ব সরস্বতী।
পণ্ডিতা খণ্ডিতা সর্বে ভোজরাজে দিবং গতে॥

এই শ্লোকের কথা ভোজরাজের কানেও পৌঁছল। তিনি বুঝলেন যে কালিদাস ফিরে এসেছেন, তা না হলে এমন শ্লোক আর কে লিখবে! বন্ধু যে তাঁকে কত ভালবাসেন তা বুঝতেও তাঁর দেরি হল না। তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে দেখা করে সব কথা খুলে বললেন। দুই বন্ধুর আবার ভাব হয়ে গেল।

গল্পটি অভিমন্যুর ভাল লেগেছে। কিন্তু আমি তার মাকে বললুম: কালিদাস তাড়াতাড়ি শ্লোকটি পালটে দিয়ে বললেন—

অদ্য ধারা সদাধারা সদালম্বা সরস্বতী।
পণ্ডিতা মণ্ডিতা সর্বে ভোজরাজে ভুবং গতে॥

অভিমন্যুর বাবা ডাকলেন: খোকা—

অভিমন্যু ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেল।

ভদ্রলোক গম্ভীর ভাবে বললেন: শুয়ে পড়।

অভিমন্যুর মা আর বাধা দিলেন না। জামাকাপড় বদলে ছেলেকে শুইয়ে দিলেন। ভদ্রলোক বললেন: তুমিও শুয়ে পড়। সেই শেষ রাতে তো আবার উঠতে হবে!

শেষ রাত কোথায়, সকাল বেলায় বল।

মহিলা আমার দিকে ফিরে বললেন: আপনিও খাওয়ায়

নামবেন তো ?

আমি কলকাতা যাচ্ছি।

ভদ্রলোক বললেন : তবে এ গাড়িতে কেন উঠেছেন! এ গাড়ি তো ঘুরে এলাহাবাদ হয়ে যাবে। নাগপুর হয়ে ফিরলে আপনি তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারতেন।

হেসে বললুম : বম্বেতে যে এক ঘণ্টা বেশি সময় পেলুম!

মহিলাও হাসলেন।

ভদ্রলোক বললেন : আমারও ইচ্ছে ছিল সোজা কলকাতা ফিরবার। কিন্তু ভাগ্যের দোষে এখন অনেক ঝামেলা পোয়াতে হবে।

ভাগ্যের দোষে কেন বলছ, সৌভাগ্য বল। কজন এ সব দেশ দেখবার সুযোগ পায়!

আমাকে প্রশ্ন করতে হল না। মহিলা নিজেই বললেন : আমরা একটুখানি ঘুরে যাব—উজ্জয়িনী বিদিশা আর খাজুরাহো দেখে। এ দিকে আর আসা হবে কি না কে জানে, দেখে গেলে অনেক দিনের সাধ মিটবে।

খুব সত্যি কথা।

আপনার শখ নেই ?

আমার!

এ কথার কী উত্তর দেব ভেবে পেলুম না। ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে এসে এখন বলতে পারি নে যে আমার শখ নেই। ভ্রমণের আনন্দের সঙ্গে আরও একটু তৃপ্তি ছিল জড়িয়ে। সেই তৃপ্তির অভাবে এই যাত্রা এখন বিস্বাদ লাগছে। বললুম : ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এবারে বিশ্রামের দরকার।

মহিলা বললেন : বেড়াতে আমরা ক্লান্ত হই নে। রাতে ঘুমোতে না পেলে যে কষ্ট হয়, দিনের বেলায় নতুন দেশ দেখার আনন্দে তা ভুলে যাই।

মনে মনে তাঁর সমস্ত কথা আমি মেনে নিলুম।

মহিলা বললেন: আপনারও যে ভাল লাগবে তাতে সন্দেহ নেই।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: কেন বলুন তো?

যে কালিদাসের কথা বললেন, আমরা সেই কলিদাসেরই বিদিশা আর উজ্জয়িনী দেখব। তারপর খাজুরাহো। অদ্ভুত কবিত্বময় স্থান বলে শুনেছি।

ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরাচ্ছিলেন। কী মনে করে আমার দিকেও একটা বাড়িয়ে দিলেন। অন্যমনস্ক ভাবে আমি সেটা নিয়ে নিলুম। যখন মনে পড়ল আমি সিগারেট খাই না, তখন ভদ্রলোক দেশলাই জ্বেলে সেটা ধরিয়ে দিচ্ছেন। আমি আর আপত্তি করলুম না।

ভদ্রলোক সিগারেটে একটা টান দিয়ে বললেন: দুর্গা বলে নেমে পড়ুন, তারপর দেখা যাবে।

সিগারেটের ধোঁয়ায় গলাটা জ্বালা করছে। মনে হল, বুকটাও বুঝি জ্বলছে। বললুম: ভেবে দেখি।

বম্বের আলো অনেকক্ষণ হল মিলিয়ে গেছে। যাঁরা জেগে আছেন তাঁরা ঘুমোবার আয়োজন করছেন। অনেকে ঘুমিয়েও পড়েছেন। অভিমন্যু ঘুমিয়ে পড়েছে, তার বাবা মাও শুয়ে পড়েছেন। আমি আমার কোণটিতে জেগে বসে আছি। আমার চোখে আজ ঘুম আসছে না। দুটি স্বপ্নময় নাম মনে পড়ছে। বিদিশা আর উজ্জয়িনী। আকাশের মেঘের মতো মন যায় মুক্ত হয়ে। লঘুপক্ষ পাখির মতো ওড়ে, যুগ থেকে যুগান্তরে চলে যায়, বর্তমান থেকে স্বর্ণময় অতীতে। কে দেখেছে সে দিনের ভারত, কে শুনেছে সে দিনের বাণী! সেই যুগান্তরের বার্তা আজ শ্লোকের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। আর কয়েকটি নাম সেই কল্পনার বিলাসকে রেখেছে বাঁচিয়ে। বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব বড় স্থূল হয়ে গেছে। যা চাই তা হাতের মুঠোর মধ্যে পেতে চাই। নিংড়ে নিংড়ে তার রস বার করে নেব, তারপর অপরিসীম অবজ্ঞায় তার ছিবড়ে ফেলে দেব পথের

ধুলোর উপর। বিশ্ব হয়েছে ভোগসর্বস্ব। অনুভবের জগৎ আমরা অনাদরে হারিয়েছি। দেহ সেখানে মিলিয়ে যায়, বিদেহী মন খোঁজে হৃদয়ের স্পন্দন। রামগিরির প্রাণের স্পন্দন বিন্ধ্যকে অতিক্রম করেছে অনায়াসে। যেমন করে আলো বাতাস মেঘ অতিক্রম করে, তেমনই করে প্রাণও সব অতিক্রম করে। প্রাণও কথা কয়, এক প্রাণের কথা আর এক প্রাণ শোনে প্রেম দিয়ে, তপস্যা দিয়ে দেখে। প্রেমিকে আর সাধকে কোন তফাৎ নেই। দুজনেই তো পাগল।

কিন্তু আমার আজ এ কী হল? কেন আমি ঘুমোতে পারছি না! দুটো নাম আজ কেন আমায় অশান্ত করে তুলেছে! আমি তো কবি নই, কল্পনার বিলাস নেই আমার। তবু কেন ওরা আমায় টানবে!

সেই সাধুর কথা আমার মনে পড়ল, পথের ডাকে যে মানুষটি সংসার ছেড়েছিলেন তাঁর কথা। সংসার ত্যাগের প্রয়োজনের কথা আমি মানি না। সংসারে থেকেও তো ঘুরে বেড়ানো যায়। কিন্তু আজ আমার অন্য কথা মনে এল। আজ খানিকটা সন্দেহ জাগছে। স্বাতিকে ফেলে মামা-মামীকে ছেড়ে আমি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি। আমার চাকরি আছে। পূজোর ছুটিতে বেরিয়েছিলুম। সে ছুটি আমার কবে শেষ হয়ে গেছে। কাজে তো যোগ দিতে হবে! পয়সা দিয়ে যারা কাজ নেয়, তারা আমার অনিয়মের আর কত প্রশ্রয় দেবে! এ সবই যুক্তির কথা, সত্য কথা। কিন্তু মন কেন মানতে চাইছে না! এমন অবুঝ হলে কি সংসারে থাকা চলে! সংসারে শৃঙ্খলা আছে, শাসন আছে। সংসারে বাস করতে হলে তার বিধি নিষেধকে শ্রদ্ধা করতে হবে। না পারলে সন্ন্যাস নাও, বানপ্রস্থে যাও। সংসারে থেকে বিদ্রোহ কোরো না। সেই সাধুকে আজ আমার শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হল। মুক্ত মনের সঙ্গে বন্দী জীবনের সন্ধি করার চেষ্টা তিনি করেন নি। একটা পথ তিনি বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু—

এই কিন্তুটা বড় মর্মান্তিক। শুধু ঘুরে ঘুরে যে মন ভরে না! মন ভরাবার জন্য আরও কিছু চাই। ওই সাধুও কি আর কিছু চাইছেন না? একান্তে তাঁর তপস্যায় আর কোন বাসনা কি তাঁকে অশান্ত করে তুলছে না? সমুদ্র থেকে হিমালয়ে, মন্দির থেকে তীর্থে নিয়ে যাচ্ছে না উদ্‌ভ্রান্তের মতো টেনে টেনে?

পিছনে যে আমারও আছে টান নতুন টান। এক বছর আগে যখন মুক্ত বলে গর্ব করেছি, তখন কি এই টানের কথা জানতুম! আজ সাধু হবার সংকল্প নিতে ভয় করে। আমার স্বর্গ যে সংসারে নেমে এসেছে। সাধনা নেমেছে জীবনে। যক্ষের স্বপ্নই আজ আমার স্বপ্ন হোক।

জানি নে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। যখন ঘুম ভাঙল, বাহিরের আকাশ তখন স্বচ্ছ হয়ে গেছে। অভিমন্যুর মা পূর্বাকাশের দিকে চেয়ে বসে ছিলেন। আমার দিকে চোখ পড়তেই বললেন: বসে বসেই ঘুমিয়ে নিলেন তো!

মুখে তাঁর প্রসন্ন হাসি।

আমিও হেসে বললুম: তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর এই তো শৌখিনতা।

তা বটে।

তারপরেই বললেন: খাণ্ডোয়াতেই তা হলে নামবেন তো!

নামব?

মহিলার দৃষ্টিতে আমি অনুরোধের বেদনা দেখলুম। অভিমন্যুর বাবা অকাতরে ঘুমচ্ছিলেন। তাঁর দিকে চেয়ে বললেন: দেখছেন তো ওঁকে? জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।

কিন্তু আমি কী করতে পারি!

ভাল সঙ্গী কি হতে পারবেন না ভাই?

অদ্ভুত শোনাল এই সম্বোধনটা। কত দিন আগে কে আমাকে

ভাই বলে ডেকেছে মনে পড়ল না। আজকের এই সকালে একটা নূতন আস্বাদ পেলুম। সহসা কোন উত্তর আমার মুখে যোগাল না।

গাড়ির ভিতরে আরও অনেকে উঠে বসেছে। আলাপও শুরু হয়েছে। অভিমন্যুর মাও আবার কথা কইলেন: আপনার আপত্তি কিসের?

সময়ের। আমাকে তাড়াতাড়ি কলকাতা পৌঁছতে হবে।

আমাদেরও সময় কম। ওঁর ছুটি ফুরোচ্ছে—

কথাটা সম্পূর্ণ করলেন না। মনে হল বলতে চেয়েছিলেন, পয়সাও ফুরিয়েছে। আমার পকেটেও বেশি পয়সা ছিল না। বোধ হয় সেইজন্যই এই কথা মনে এল। ভাল করে স্মরণ করে দেখলুম যে পয়সার অভাব আমার অন্তরায় হবে না। কলকাতা পর্যন্ত টিকিট কাটা আছে। একটু ঘুরে যাবার জন্য কিছু অতিরিক্ত ভাড়া লাগবে, আর কিছু বাস-খরচ। এত দিনের অনুপস্থিতির জন্য যদি চাকরি গিয়ে না থাকে তো আর কয়েকটা দিন বাড়লে বেশি কিছু ক্ষতি হবে না। তবু আমার রাজী হতে সঙ্কোচ হল।

খাণ্ডোয়ায় পৌঁছে শেষ পর্যন্ত নামতেই হল। অভিমন্যু আমাকে নামাল। বলল: তুমি না থাকলে গল্প শোনাবে কে?

তার মা বললেন: সত্যিই তো, কালিদাসের গল্প আমি জানি নে।

তার বাবা বললেন: সবাই যখন বলছে, দুর্গা বলে নেমেই পড়ুন।

এ দেশের আকাশ বড় স্বচ্ছ। দুর্গানাম করেই আমি গাড়ি থেকে নেমে পড়লুম।

২

আমরা অনেকটা সময় পেয়েছি। ওয়েটিং রুমে স্নান করে চা খেয়েছি। টিকিট নিয়েছি পালটে। ভোর সাড়ে ছটায় নেমে পৌনে এগারোটা পর্যন্ত অবসর। বাহিরে বেরিয়ে শহরটাও দেখে নেওয়া যেত, কিন্তু অভিমন্যুর মায়ের অনুরোধে তাঁদের সঙ্গেই খেয়ে নিতে হল। এ ট্রেন বিকেলে মৌ পৌঁছয়। তার আগে কোন খাবার জায়গা নেই। তাই বললেন: হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই।

বিরূপাক্ষ বললেন: ঠিক কথা। কাল হয়তো কিছুই জুটবে না।

খেয়ে দেয়ে আমরা ছোট লাইনের গাড়িতে চাপলুম।

এ দিকের রেলপথের কোন ধারণা আমার ছিল না। গাড়িতে বসে টাইম টেবলের মানচিত্র দেখে মোটামুটি একটু বোঝা গেল। বম্বে থেকে দিল্লীর দুটো পথ আছে। পশ্চিম রেলের পথ সুরত বড়োদা রতলাম হয়ে দিল্লী গেছে, আর মধ্য রেলের পথ নাসিক খাণ্ডোয়া ভোপাল আগ্রা হয়ে দিল্লী পৌঁছেছে। এই দুটো পথ মিলেছে মথুরায় এসে। এদের যোগাযোগ আছে তিন জায়গায়—জলগাঁও থেকে সুরত, ভোপাল থেকে নাগ্‌দা, আর বিনা থেকে কোটা। উজ্জয়িনী নাগ্‌দার কাছে ভোপালের পথে বড় লাইনের স্টেশন। খাণ্ডোয়ার ছোট লাইন ইন্দোরের উপর দিয়ে এসে এখানে মিলেছে। ইন্দোর থেকে রতলামের দিকেও গেছে একটা ছোট লাইন। অভিমন্যুর বাবা বললেন: আমরা মৌ-এ নামব। ইন্দোরে নামলেও চলে। ইন্দোর থেকেও মাণ্ডুর বাস মৌ আর ধার হয়ে যায়।

তারপরে নিশ্চয়ই উজ্জয়িনী!

সেখান থেকে ভোপাল সাঁচি ও বিদিশা।

আমরা আর কী দেখব ?

খাজুরাহো।

অভিমন্যুর বাবার মেজাজ এখন রাতের মতো অপ্রসন্ন নয়। বললেন : মিনতির মিনতিতে এই কেলেঙ্কারি করলাম।

কিসের কেলেঙ্কারি !

ভদ্রলোক বললেন : সোজা পথে ঘরে না ফিরে বাঁকা পথে এই ঘুরপাক খাওয়া কেলেঙ্কারি নয় ! তবু রক্ষা যে রেলের পাসে যাচ্ছি। পাস হাতে নিয়ে ইঞ্জিনের মতো আগে-পিছে যাবার উপায় নেই। আপনাদের মতো টিকিট-কাটা যাত্রী হলে তা সম্ভব হত।

আপনি তা হলে রেলের লোক !

খাঁটি রেলের। আপিসে বসে ফাইল ঘাঁটি নে, বিল পাস করি নে। সারাদিন রেল নিয়েই কারবার। পাণ্ডববর্জিত দেশে আমি স্টেশন-মাস্টার। তের জন লোকের ইস্টিশনের ছোটবাবু। আমার অনুমতি পেলে ট্রেন আসে, ট্রেন যায়। মেল ট্রেন থাকলে তাকেও আমার অনুমতি নিয়ে যাওয়া-আসা করতে হত। আমার নাম বিরূপাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়। আসুন, একটা সিগারেট ধরান।

বলে পকেট থেকে তাঁর সিগারেটের প্যাকেট বার করলেন।

আমি হাত গুটিয়ে বললুম : ধন্যবাদ, আমি সিগারেট খাই নে।

সে কি !

মিনতিও আশ্চর্য হয়েছেন দেখলুম। বললুম : কালকের কথা ভাবছেন তো, কাল অন্যমনস্কভাবে নিয়ে ফেলেছিলুম।

বিরূপাক্ষ বললেন : ভাল। নামেই এ সিগারেট, কাজে বিড়ির গোত্র। মিনতি আমাকে শৌখিনতা শেখাচ্ছে।

প্যাকেটটা লক্ষ্য করে বললুম : ও তো আজকাল উঁচু তলার জিনিস। বড় বড় সরকারী কর্মচারীরা আজকাল ওই ব্র্যাণ্ড খাচ্ছেন। সোনার কেস থেকে তাঁরা বার করেন।

বলেন কি !

কিন্তু আমাদের বেসরকারী অফিসে তত চলে না। আমাদের সাহেবরা ব্র্যাণ্ড দেখাবার জন্যে কৌটো হাতে রাখেন।

বিরূপাক্ষ তাঁর সিগারেট ধরালেন। কড়া তামাকের গন্ধ। মিনতি বললেন : যাই বল, এ তোমার বিড়ির চেয়ে ঢের ভাল। বিড়ির গন্ধে আমার বমি আসে।

অভিমন্যু এতক্ষণ চুপ করে ছিল। হঠাৎ বলে উঠল : আমিও সিগারেট খাব মা।

আমি কৌতুক বোধ করলেও হাসবার সাহস পেলুম না। বিরূপাক্ষর মেজাজকে আমার ভয় ছিল। কিন্তু এখন তাঁকে একেবারে স্বতন্ত্র মানুষ বলে মনে হল। বললেন : বাপকো বেটা হবে।

মিনতি বললেন : আপনার বাড়িতে সবাই ভাববেন তো ?

প্রশ্ন শুনে আমি হাসলুম।

বিরূপাক্ষ মিনতিকে বললেন : তোমার সঙ্গে পোস্টকার্ড আছে তো, একখানা বার করে দিয়ো।

আর আমাকে বললেন : খাণ্ডোয়ায় ফেললেই ভাল হত ! মৌ-এ নেমে গাড়িতেই ফেলে দেব।

মিনতি তখুনি তাঁর বাক্স থেকে পোস্টকার্ড বার করবেন ভাবছিলেন। বাধা দিয়ে বললুম : তার দরকার নেই।

সে কি, বাড়িতে একটা খবর দেবেন না ?

বাড়ি থাকলে তো খবর দেব !

আমি এই তরুণ দম্পতির চোখে গভীর অবিশ্বাস দেখলুম। বাড়ি নেই এমন লোকও এ দেশে আছে !

হেসে বললুম : উত্তরপাড়ার একখানা ভাড়াটে ভাঙা ঘরে আমার একার সংসার। দেশের বাড়িতে আমার শেষ আত্মীয়ের শেষ নিঃশ্বাস পড়েছে, বিদেশের ঘরে নতুন আত্মীয় আনবার ভরসা আজও পাই নি।

মিনতি বললেন: বিয়ে করেন নি বুঝি?

বিরূপাক্ষ বললেন: ভাল করেছেন।

অভিমন্যু অনেকক্ষণ থেকে উসখুস করছিল, বলল: কে তোমাকে খেতে দেয়?

কেউ না।

কেউ না!

অভিমন্যু কিছু মর্মাহত হয়ে বলল: তুমি রোজ না খেয়ে থাক?

হেসে বললুম: তুমি আমাকে খেতে দেবে?

একটু ভেবে সে উত্তর দিল: তুমি আমাদের কাছে কেন থাক না? তা হলে তো মা তোমাকে খেতে দিতে পারে।

মিনতি বললেন: মামীমা এসে তোমার মামাকে খেতে দেবেন। হ্যাঁ ভাই, আপনার নামটা কী!

গোপাল।

বিরূপাক্ষ বললেন: চমৎকার নাম।

কেন?

প্রথম ভাগ পড়তে পড়তেই নাম লেখা যায়, আমার নাম আমি এখনও ভুল লিখি।

মিনতি সকৌতুকে বললেন: ভুল লেখার ভয়ে উনি শুধু 'বি. বি.' লেখেন।

আর বিরূপাক্ষ বললেন: সাহেব নই বলেই বিবির প্রতি একটু দুর্বলতা।

মনে হল যে এ সব তাঁদের পুরনো রসিকতার কথা, পুরনো জিনিস উপভোগের মতো আবেগশূন্য। আমি কিছু বলতে গিয়েও মিনতির দৃষ্টিতে উদ্বেগ দেখে থেমে গেলুম। উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। অভিমন্যু আর বসে থাকতে না পেরে গাড়ির ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু দরজা বন্ধ। চলতি গাড়িতে টাল সামলাতে না

পারলে মারাত্মক কিছু ঘটবে না। মিনতি তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। অভিমন্যু একজন যাত্রীর জিনিসপত্র পরীক্ষা করছিল। বিরূপাক্ষ তাকে ডাকলেন : খোকা।

অভিমন্যু মুখ ফিরিয়ে হাসল। ভাবখানা এই রকম যে তোমরা অকারণে ব্যস্ত হচ্ছ। প্রথম পদক্ষেপ মানুষ আশঙ্কার চোখে দেখে। অথচ এই পদক্ষেপের প্রেরণা ফুরলেই পৃথিবীর যাত্রা যাবে বন্ধ হয়ে। মনের আবেগ যখন পায়ে সঞ্চারিত হয়, মানুষ তখন চলে। কে জানে এই চলা কবে শুরু হয়েছিল। চলার ইতিহাস বলার ইতিহাসের চেয়েও পুরনো। লেখার ইতিহাসে এ সব কথা লেখা নেই। খানিকটা অনুমান আছে মাত্র। সেই অনুমান দিয়ে আমরা প্রাগৈতিহাসিক ঘটনাকে স্বপ্নময় করে রেখেছি।

একদা এই বিরাট দেশে আর্য সভ্যতার পদক্ষেপ হয়েছিল আজকের অভিমন্যুর মতো টলমল করে। দূরে দাঁড়িয়ে আদিম সভ্যতা তাকে সশঙ্ক পিতামাতার মতো প্রত্যক্ষ করেছে। পৃথিবীর জন্মের যেমন হিসাব নেই, তেমনি নেই সভ্যতার জন্মের হিসাব। মহাভারতের কাল আমরা নির্ণয় করেছি, পারি নি রামায়ণের কাল নির্ণয় করতে। পুরাণের হিসাবে তার বয়স তের লক্ষ এক হাজার বছর। বিদেশীরা পুরাণ মানে না। খ্রীষ্টের জন্মের তারিখ দিয়ে তারা ইতিহাস রচনা করেছে। সে ইতিহাস মাত্র কয়েক হাজার বছরের। এই গোলার্ধে তখন তিনটি নদীর উপত্যকায় সভ্যতার বিকাশ হয়েছে। সিন্ধু, নীল আর ইউফ্রেতিস। মেম্ফিস, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা তার সাক্ষী দিচ্ছে। মাটি খুঁড়ে নগরের ধ্বংসাবশেষ না পেলে বিদেশীরা বোধ হয় এ কথাও অস্বীকার করত। তারা দাবি করে, এ দেশের সভ্যতা এসেছে ভোলগার উপত্যকা থেকে। ইংরেজ যেমন দাবী করে যে তারা ভারত উদ্ধারে এসেছে, পাদরিরা ঘুরে বেড়িয়েছে হিদেনদের মুক্তির জন্যে, তেমনি করেই নাকি ভোলগার মানুষ এ দেশে এসেছে সভ্যতার মশাল হাতে। আসুক,

এখানে সে তর্ক নয়। ভারতে আর্য সভ্যতার উন্মেষ হয়েছে খ্রীষ্টের জন্মের দু হাজার বছর আগে। প্রথমে পঞ্চনদে, তারপর ব্রহ্মাবর্তে, গঙ্গা যমুনার উপত্যকায় হয়েছে তৃতীয় অবস্থায়। ধীরে ধীরে সভ্যতা এল সুরাষ্ট্র আর অবন্তীতে। উজ্জ্বল হল উজ্জয়িনী আর বিদিশা। সেও খ্রীষ্টের জন্মের সাত-আটশো বছর আগের ঘটনা। সাতপুরার দক্ষিণে বিদর্ভে ছিল অনার্য অধিকার। দণ্ডকারণ্যেও। বিংশ শতাব্দীর প্রখর আলো আজও এই অরণ্য ভেদ করে নি। এবারে বুঝি করবে।

অতীতের বিস্মৃত ইতিহাসে এ অঞ্চলের একটা ঐতিহ্য ছিল। শুধু ইতিহাসে কেন, রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের যুগেও এই ঐতিহ্য ছিল ভারতবিশ্রুত। স্কন্দ পুরাণে অবন্তীর উল্লেখ আছে ভারতে সাতটি মোক্ষদায়িকা জনপদের সঙ্গে:

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরীদ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা॥

অবন্তী উজ্জয়িনী মালব বোধ হয় একই স্থানের ভিন্ন নাম। যুগে যুগে এই নাম পরিবর্তিত হয়েছে। একদা নাকি অবন্তী ছিল মালব রাজ্যের রাজধানী। কেউ বলেন, অবন্তীই রাজ্যের নাম, উজ্জয়িনী তার রাজধানী। প্রাচীন গ্রন্থ আলোচনায় শুধু সংশয় বাড়ে, প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। ঋক্ সংহিতায় অবন্তীর উল্লেখ নেই, আছে সূত্রগ্রন্থে। তখন এ দেশে যাদের বাস ছিল তারা নামে মানুষ হলেও ঠিক মানুষের মতো ছিল না। তারা ছিল একটা মিশ্র জাতি। বেদের আর্যরা সহস্রাধিক বৎসর ধরে এ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছেন।

রামায়ণে অবন্তীর নাম আছে। সীতার অন্বেষণে সুগ্রীব বিন্ধ্যাশ্রিত অবন্তীতেও বানর পাঠিয়েছিলেন। মহাভারতে সঞ্জয় অবন্তীর নামোল্লেখ করেছেন। উজ্জয়িনী নামও পাওয়া যায়। কিন্তু মালব রাজ্য বলেছেন দক্ষিণ-ভারতে। পুরাণের কত স্থানে অবন্তী

উজ্জয়িনীর নাম আছে জানা নেই। তবে স্থানে স্থানে যে আছে তা জানা গেছে। মৎস্য পুরাণে বিন্ধ্যপৃষ্ঠনিবাসী জনপদের তালিকায় অবন্তীর নাম পাওয়া গেছে। অবন্তী নগরে মঙ্গল গ্রহের জন্ম হয়েছিল। বিষ্ণু পুরাণে পাওয়া যায়, কৃষ্ণ বলরাম অস্ত্রশিক্ষার জন্য অবন্তী নগরে এসেছিলেন সন্দীপনি মুনির নিকটে।

অবন্তীর পরিচয় আছে বৌদ্ধশাস্ত্রেও। সিংহলের মহাবংশে আছে যে সম্রাট বিন্দুসার তাঁর পুত্র অশোককে উজ্জয়িনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। বৌদ্ধ সমৃদ্ধি কী করে গড়ে ওঠে সে ইতিবৃত্ত আমাদের জানা নেই। তবে সমৃদ্ধির সংবাদ প্রসারিত হয়েছিল সারা ভারতে এবং বহির্ভারতেও। তাই চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন চাঙকে এ দেশে আসতে হয়েছে। তখনও এখানে তিন-চারটি বিহার বিদ্যমান ছিল। শ তিনেক বৌদ্ধ নাকি ধ্বংসের হাত থেকে সেই বিহারগুলিকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। পশ্চিমে মালবের রাজধানী ধারা নগর, পূর্বে মহেশ্বরপুর, উত্তরে মথুরা ও জজহোতি, এবং দক্ষিণে সাতপুরার পর্বতমালা—এই ছিল সে যুগের উজ্জয়িনী রাজ্য। রাজা ব্রাহ্মণ। রাজ্যে তাই হিন্দুধর্মের প্রাধান্য।

পাশ্চাত্ত্য দেশের পণ্ডিত টলেমির গ্রন্থে ও পেরিপ্লাসে উজ্জয়িনীর উল্লেখ আছে বিকৃত অবস্থায়। তাঁরা ওজিনি বলেছেন, ইউয়েন চাঙের মতো উ-শে-এন-না বলেন নি।

বরাহ মিহিরের বৃহৎ সংহিতায় অবন্তীর সমৃদ্ধির পরিচয় আছে। সমাজের পরিচয় আছে শূদ্রকের নাটক মৃচ্ছকটিকে। ব্রাহ্মণ চারুদত্তের সঙ্গে বারবনিতা বসন্তসেনার প্রেমকে অবলম্বন করে কবি উজ্জয়িনীরই উজ্জ্বল চিত্র এঁকেছেন। এ কাহিনী আধুনিক কালের যে কোন কাহিনীর মতো চমকপ্রদ, চির নূতনও বটে।

তারপর কালিদাসের মেঘদূত।—

প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্
পূর্বোদিষ্টমনুসরপুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্।
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিনাং গাং গতানাং
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্॥

"সিন্ধুপারে অবন্তীপুর
যেথায় উদয়নের গান,
বৃহৎ-কথার গল্পে ভরা
গাঁয়ের পিতামহের প্রাণ!
উজ্জয়িনী নগর সেথা
শ্রীবিশালা শ্রেষ্ঠপুরী
মর্ত্যলোকে খানিক যেন
করেছে কেউ স্বর্গ চুরি!
পুণ্যক্ষয়ে ত্রিদশ হতে
ধারায় এসে নামল যারা,
তাদের বাকি সুকাজটুকুর
ফল কি হেথায় আনলো তারা?"

৩

বিরূপাক্ষ বললেন : রাতে একেবারেই ঘুম হয় নি, তাই না ?

মিনতি সরে বসে বললেন : একটু গড়িয়ে নেবেন ?

আমি লজ্জা পেলুম। বসে বসেই আমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম ! না স্বপ্ন দেখছিলুম এতক্ষণ !

বিরূপাক্ষ বললেন : আজ রাতে আমরা টেনে ঘুমব। মৌ-এ ভাল ওয়েটিং রুম আছে।

ওয়েটিং রুমে কেন ?

এ তো বিলিতি ধর্মশালা। ছারপোকা নেই, তার বদলে ভাল বাথ রুম আছে।

তা হলে ইন্দোরে যাওয়াই ভাল। সেখানকার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আরও ভাল হবে।

বিরূপাক্ষ বললেন : তা হলে অন্য বিপদ আছে। স্থানাভাব হবে। আর বাসেও তেরো তেরো ছাব্বিশ মাইলের বেশি ভাড়া দিতে হবে। ইন্দোর থেকে যে বাস ছাড়ে, তা মৌ ধার হয়ে মাণ্ডু যায়।

বলে ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে টাইম টেবলখানা চেয়ে নিলেন। বইএর শেষে মানচিত্র আছে। সেখানা খুলে আমাকে বোঝাতে বসলেন : এই হল মৌ বা মাউ। এখানে নেমে আমরা বাসে মাণ্ডু যাব। পঞ্চান্ন মাইল পথ, সময় লাগবে প্রায় চার ঘণ্টা, ভাড়াও কম। ধারে অনেকক্ষণ দাঁড়াবে।

তারপর ?

মিনতির দিকে চেয়ে বিরূপাক্ষ বললেন : তারপর মোক্ষলাভ। যার জন্যে এত শ্রম, সে রত্ন মুঠোর ভেতর।

মিনতি লজ্জা পেয়েও পেলেন না। বললেন : ভোর বেলায়

আমাদের যাত্রা। শুনেছি, সকাল সকাল বেরিয়ে পড়তে পারলে সন্ধ্যে বেলাতেই ফিরে আসা যায়।

আমি দেশে ফেরার কথা ভাবছিলুম। ঘুরে ঘুরে শরীর কত ক্লান্ত হয়েছে, এখন বোঝা যাচ্ছে না। মনটা ঝিমিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে। আমি তাঁর মানচিত্রের উপর ঝুঁকে পড়ে বললুম: তারপর আমরা কোথায় যাব?

বিরূপাক্ষ বললেন: মৌ থেকে ইন্দোর যাবার অসংখ্য ট্রেন আছে, তারই কয়েকখানা যায় উজ্জয়িনী। ইন্দোরে ঘণ্টা কয়েক কাটিয়ে আমরা উজ্জয়িনী যাব। সেখানে পুরো একটি দিন।

মিনতি বললেন: একটি সন্ধ্যাও কাটাব শিপ্রার তীরে। সম্ভব হলে রাত।

সুর করে বিরূপাক্ষ বললেন:

"দূরে বহু দূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রা নদীপারে
মোর পূর্ব জনমের প্রথমা প্রিয়ারে।"

মাঝখানেই মিনতি বলে উঠেছিলেন: থাক্ থাক্, তোমার কাব্য এখন থাক্।

আমি প্রশ্ন করলুম: আপনি কবিতা লেখেন বুঝি?

কবিতা বলি।

পরম কৌতুক ভরে মিনতি বললেন: বলে দেব?

না বললেও বুঝতে পারলুম যে বিরূপাক্ষ কোন সময় কবিতা লিখেছেন, কিংবা এখনও লেখেন। এই প্রসঙ্গটি এড়াবার জন্য তাড়াতাড়ি বললেন: উজ্জয়িনী থেকে ভোপালের বড় লাইন দেখুন। ভোপাল থেকে ঝাঁসির গাড়ি ধরব। মাঝখানে সাঁচি আর বিদিশা।

এ সব জায়গাতেই ওঠা নামা আছে। পরিশ্রম আছে, সময়েরও

দরকার। বিরূপাক্ষ বলে চললেন: ঝাঁসি থেকে হরপালপুর খাজুরাহোর জন্যে।

বললুম: গোয়ালিয়র!

উপায় নেই। রেল কোম্পানির পাস আমাকে হরপালপুর থেকে মানিকপুর, সেখান থেকে এলাহাবাদ হয়ে দেশে নিয়ে যাবে। তা না হলেই গাঁটের কড়ি। গাঁট শূন্য।

আমার পকেটও ভর্তি নয়। যা সামান্য পুঁজি নিয়ে বেরিয়েছিলুম, খরচ করলে তা অনেক আগেই শেষ হয়ে যেত। মামা ঈগল পাখির মতো আমার পকেট আগলেছেন। কোনখানে আমায় খরচ করতে দেন নি। কলকাতার টিকিটখানাও নিজে কেটে দিয়েছেন। বলেছিলেন, তোমাকে আমি ডেকে এনেছি, কলকাতা থেকে জয়পুরের ভাড়াটাও আমার দেওয়া উচিত।

হাত পেতে পয়সা নিতে আমি শিখি নি। শুধু মাইনের টাকা নিই গুনে গুনে। সেই টাকারই কিছু অবশিষ্ট আছে।

বিরূপাক্ষর হাত থেকে আমি টাইম টেবলটা নিলুম। মিনতি একখানা গাইড বই বার করে দিলেন। নিবিষ্ট মনে আমি সব মিলিয়ে নিতে লাগলুম। এক সময় মনে হল যে একটা দিন আমরা সংক্ষেপ করতে পারি। বিরূপাক্ষকে সেই কথা বলতেই তিনি উৎসাহ পেয়ে বললেন; সত্যি!

গাইড বই খুলে তাঁকে বুঝিয়ে দিলুম: মৌ থেকে মাণ্ডু পঞ্চান্ন মাইল, আর ইন্দোর থেকে মাণ্ডু বাষট্টি মাইল। ভাড়ার তফাৎ সামান্যই, তাই এই পয়সাটা খরচ করলে একটা দিন সময় বাঁচে।

মিনতি একখানা বই পড়ছিলেন, আমার দিকে মুখ তুলে তাকালেন।

বললুম: বিকেলে মৌ পৌঁছে কিছু করবার নেই। কিন্তু একটু এগিয়ে ইন্দোরে নামলে শহরটা আজই দেখা হয়ে যাবে। তারপর কাল মাণ্ডু, পরশু উজ্জয়িনী।

অত্যন্ত তৎপর ভাবে বিরূপাক্ষ একটা সিগারেট বার করে বললেন : ইচ্ছা করুন।

তাঁর কথায় ও কাজে আমি হাসলুম। মিনতিও হাসলেন। বিরূপাক্ষ নিজেই সিগারেট ধরালেন।

মিনতি আস্তে আস্তে বললেন : রেলের লোক কিনা—

কথাটা বিরূপাক্ষ লুফে নিয়ে বললেন : টাইম টেবল দেখা আর টিকিট কাটা, এ কাজ দুটো যাত্রীরাই ভাল পারে। আমার নিজের স্টেশনের সময় জিজ্ঞেস কর, সব মুখস্থ।

মিনতি বললেন : দেখুন তো ভাই গোপালবাবু, উজ্জয়িনীতে একটা রাত থাকা যায় কিনা!

টাইম টেবল আমার হাতেই ছিল। দেখে বললুম : অনায়াসে। মাণ্ডু থেকে ফিরে এসে ইন্দোরেই রাত কাটাব। উজ্জয়িনীর ট্রেন দেখছি সকাল পৌনে আটটায়, পৌঁছবে বেলা সাড়ে দশটায়। ভোপালের গাড়ি আমরা বিকেল সাড়ে ছটায় ধরব না। রাত দুটো দশে একটা ট্রেন ছাড়ে—উজ্জয়িনী থেকেই ছাড়ে। সকাল সাতটায় ভোপাল।

উজ্জ্বল চোখে মিনতি বললেন : দেখলে তো!

সহাস্যে বিরূপাক্ষ বললেন : এ তো চিরকালই দেখছি। আমি কেন, সবাই দেখছে যে গাঁয়ের যোগী কোন দিন ভিখ পায় না।

এক সময় আমরা নর্মদার পুল পেরিয়ে গেলুম। আরও কিছু পরে বিন্ধ্যের পাদদেশে গিয়ে পৌঁছব। উঠব তার মালভূমির উপর। ভারতের মানচিত্রের দিকে চেয়ে চিরকাল একটি বিস্ময় জেগেছে। এ অঞ্চলে দুটি পর্বতশ্রেণী পূর্ব থেকে পশ্চিমে সমান্তরাল ভাবে বিস্তৃত। বিন্ধ্য ও সাতপুরা। বিন্ধ্য উত্তরে, সাতপুরা দক্ষিণে। আর এই দুয়ের দক্ষিণ প্রান্তে প্রবাহিত হচ্ছে দুটি বিখ্যাত নদী —নর্মদা ও তাপ্তি। বিন্ধ্যের দক্ষিণে নর্মদা, আর সাতপুরার দক্ষিণে তাপ্তি। বম্বের পর পশ্চিমঘাট পর্বতমালা অতিক্রম করে এসেছি।

সাতপুরার নিচে দিয়ে রেলপথ। ভুসাবলের পর তাপ্তি পেরিয়ে আমরা মহাদেও পর্বতের দিকে যাই নি, উত্তরে এসেছি বিন্ধ্যপর্বতের দিকে। আর কিছু দূর এগিয়ে মধ্যভারতের মালভূমি শুরু হবে।

রাজস্থান ভ্রমণের সময় আরাবল্লীর পর্বতমালা দেখেছি। আবু থেকে আজমের পর্যন্ত। জয়পুর আলোয়ারে কেন, দিল্লীতেও এই পাহাড়ের নমুনা দেখি। দিল্লীর রোমান্স তো আবু পাহাড়ে গিয়ে শেষ হল। শেষ কেন, নূতন রোমান্সেরও তো শুরু সেইখানে। এই তো কয়েকটা দিন আগের ঘটনা। পনেরো কুড়ি দিন আগে মিত্রা ও চাওলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। রাণা আসে নি। মামীমা খুব আশা করেছিলেন রাণা আসবে। চিতোর আর উদয়পুরে তিনি অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। রাণা এসে আবু পাহাড়ে বসে থাকবে, এ ভারি অন্যায় কথা। রাণার সঙ্গে যে স্বাতির বিয়ে তিনি ঠিক করেছেন।

মামাকে বড় নির্বিকার বোধ হয়েছিল। রাণা আসবে না, এ কথা তিনি বলেন্‌নি। কিন্তু আসবে বলেও তাঁর ভরসা ছিল না। রাণার বাবা মিস্টার ব্যানার্জি তাঁর সহপাঠী বন্ধু। প্রেসিডেন্সী কলেজে এক সঙ্গে পড়েছিলেন। সেইখানেই সম্বন্ধের শেষ। বি.এ. পাস করে তিনি বিলেত গিয়েছিলেন। ফিরেছিলেন সিভিলিয়ান হয়ে। মামা দেশে ফিরলেন বাপের জমিদারী দেখতে। বাঙলার জমিদারদের সম্বন্ধে মিস্টার ব্যানার্জির মনোভাবের কথাও মামা বলেছিলেন: সম্পত্তি দেখছে, না অধঃপাতে গেছে। আশকারা দিয়ে গভর্মেণ্ট এক গুষ্টি অপদার্থ পুষছে।

বলেছিলেন, তুমি জান না গোপাল। আমাদের প্রতি কত গভীর ঘৃণা ওরা বুকের ভিতর পুষে রেখেছে। যাদের চালচুলো ছিল না, আর যাদের প্রচুর ছিল, তাদের দু দলকেই ওরা ঘৃণা করে। সরকারী প্রতিপত্তিওয়ালা বন্ধুমহলে যা বলে, তাও জানি। সে সব নোংরা কথা আর নাই বা শুনলে।

শুনতে আমি চাই নি। আর সে সম্বন্ধে যা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন,

তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। শুধু তাঁর মতো আমার মনেও একটা প্রশ্ন জেগেছিল। তাঁর উপযুক্ত পুত্র রাণা কেন স্বাতিকে বিয়ে করতে চাইল! সে কি তার বাপের কাছে এ যুগের শিক্ষা পায় নি, না তার অন্তরে অন্য কিছু ছিল সবার উর্ধ্বে! তাই যদি হবে তো আবু পাহাড়ে সে এল না কেন!

এল তার বোন মিত্রা, আর সেই পাঞ্জাবী যুবক চাওলা। মিত্রার কথা আমি ভুলব না। এমন স্পষ্টবাদী মেয়ে আমি বোধ হয় আজও দেখি নি। গোড়া থেকেই আমি এ কথা অনুভব করেছিলুম। সমস্ত বুদ্ধি দিয়ে বিশ্বাস করলুম সেই দিন, যেদিন ওখলায় আমার পাশে বসে বলল, চাওলাকে আমি ভালবাসি, কিন্তু বিয়ে করব না। সে কথা আমি ওকে জানিয়ে দিয়েছি।

মিত্রা আমাকে মামার বাড়ি থেকে তুলে এনেছিল, স্বাতিকে আনে নি। ইচ্ছে করেই আনে নি। যমুনার ধারে সেই ছায়াঘন শ্যামল পরিবেশে বসে বলেছিল, আপনার পোশাকী রূপটা দেখেছি, ইচ্ছে হল আপনাকে একান্তে একবার দেখি।

বলেছিল, মানুষের দুটো রূপ অত্যন্ত স্পষ্ট। একটা তার সমাজের কাছে—অভিনেতার মতো সেটা তার বাইরের রূপ। আর একটা তার নিজের রূপ—সেটা ভেজালহীন খাঁটি পরিচয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে মানুষের একটা তৃতীয় রূপও আছে। সেটা তার একান্তে কোন একজনের সামনে, যাকে সে—

ছোট একটা ঢোক গিলে বলেছিল, ভালবাসে।

মিত্রা তার বিশ্বাসের কথা আমায় বুঝিয়ে বলেছিল, মানুষ যখন প্রথম ভালবাসে তখন তার তৃতীয় রূপ কতকটা অভিনেতারই মতো কৃত্রিম রূপ। ভালবাসা যত গভীর হয়, ততই সে রূপ বদলায়। শেষে তার সত্য রূপের সঙ্গে আর কোন তফাত থাকে না। কোন মানুষকে চিনতে হলে তাই তাকে একান্তে দেখতে হয়।

অন্য মেয়ে হলে নিজের মনকে মিত্রার মতো এমন অকপটে মেলে

ধরত না। লজ্জা পেত, হয়তো ভয়ও পেত। কোন স্বল্প পরিচিত পুরুষ তাকে নির্লজ্জ ভাববে, এ তো ভয়েরই কথা। মিত্রা ভয়কে জয় করেছে, সংস্কারকে উপেক্ষা করছে। তাই তাকে আমার ভাল লেগেছিল। বলেছিলুম, চাওলাকে যখন ভালই বাসেন, তখন বিয়ে করতে আপত্তি কি?

মিত্রা বলেছিল, তার সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। সে ভাবে ঘুঁটেকুড়ুনীর দুঃখই দুঃখ, রাজকন্যের দুঃখ দুঃখ নয়। তার মন সমাজ-সচেতন। কিন্তু একটা মতবাদকে ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে আর একটা মতবাদের ভারে বেঁকে গেছে। লোকটা এখন আর সুস্থ নয়।

আবু পাহাড়ে রাণা স্বাতির জন্য এল না। মিত্রা এল চাওলার সঙ্গে। যাকে সে অসুস্থ ভাবে, তারই সঙ্গে এল। মনে হল যে তাদের এই আসার ভিতর আরও কোন গভীর অর্থ আছে। সে কথা আমার কাছে এখনও স্পষ্ট হয় নি।

মামী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রাণা এল না কেন?

মিত্রা সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিল, চাকরি।

পুজোর সময়েও চাকরি!

চাওলা আমায় একটা চিমটি কেটেছিল লুকিয়ে, বলেছিল, সিনিয়রের ইচ্ছে নয়।

মামা গম্ভীর ভাবে বলেছিলেন, বুঝেছি।

মিত্রার দৃষ্টি একটু অবনত হয়েছে, আর মামী হয়েছেন বিষণ্ণ। তিনিও বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন যে রাণা আর আসবে না।

আবু পাহাড় থেকে নেমে যাবার সময় চাওলা বলেছিল, তুমি থাক, তোমার জায়গায় আমি নেমে যাই।

সবাই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, কিন্তু স্বাতির চোখে আমি কৌতুক দেখেছিলুম। আমার কর্তব্য স্থির করতে একটুও দেরি হয় নি। বলেছিলুম, আসি।

এক টুকরো কাগজ আমার পকেটে গুঁজে দিয়ে চাওলা বলেছিল,

ভেবেছিলুম, মিত্রার হাতে গুঁজে দিয়ে আমি তোমার জায়গায় ফিরে যাব। কিন্তু তার যখন দরকার হল না, তুমি ওখানা নিয়ে যাও।

চল্‌তি বাসে কাগজের টুকরোটা আমি পড়ে দেখেছিলুম। অত্যন্ত কাঁচা হাতে এক ছত্র কবিতা লেখা—তোমারই হউক জয়।

চাওলা একদিন আমাকে বলেছিল যে মিত্রার কাছে সে বাঙলা শিখছে।

আগে দেখলে এটা আমি তাকেই উপহার দিতুম। পিছন ফিরে দেখেছিলুম যে তারা হাত ধরাধরি করে হাঁটতে শুরু করেছে। দেখে আমার অদ্ভুত ভাল লেগেছিল।

৪

মৌঅ আমরা নামলুম না। দু-তিনটে স্টেশন পেরিয়ে ইন্দোরে এসে আমাদের যাত্রা ভঙ্গ হল। অভিমন্যুও আমার মতো ঘুমিয়ে উঠল। আমি একটা কোণায় হেলান দিয়ে ঘুমিয়েছিলাম, আর সে ঘুমিয়েছিল মায়ের কোলে মাথা রেখে। মিনতি কী করেছিলেন জানি নে। তবে ছেলের জন্য খাবার রেখেছিলেন তৈরী করে। পাঁউরুটি মাখন আর কলা। বললেন: আকাশে রোদ এখনও আছে। খোকাকে খাইয়ে বেড়াতে বেরব।

জিনিসপত্র আমরা ওয়েটিং রুমে রাখলাম।

বিরূপাক্ষ বললেন: আমাদের জন্যে তো সব জায়গায় ঘর নেই, চারিদিক খোলা একটা 'হল' হয়তো থাকে। রাতে সেখানে থাকা চলে না।

কেন চলে না?

বিরূপাক্ষ আমার মুখের দিকে তাকালেন গভীর বিস্ময়ে।

বললুম: গাছতলায় যদি মানুষের চলে যায় তো এমন ছাদের নিচে চলবে না!

বিরূপাক্ষ হা হা করে হাসলেন, বললেন: খাঁটি কথা বলেছেন। এ দেশের কটা লোকের মাথায় এমন ছাদ আছে!

মিনতি বললেন: নিজেদের ছাদ চুঁয়ে যখন জল পড়ে, তখন তো এই আমাদের সান্ত্বনা।

বললুম: মানুষ পরশ্রীকাতর, কিন্তু পরের দুঃখ দেখে কাতর হলে পৃথিবীটাই স্বর্গ হত।

কী বললেন?

বিরূপাক্ষের প্রশ্নের উত্তরে বললুম: এক দিন নিশ্চয়ই তা হত। এ দেশে সেদিন তেত্রিশ কোটি দেবতা ছিল।

অভিমন্যুর সঙ্গে মিনতি আমাকেও খেতে দিলেন। অভিমন্যু কিছু

না বললেও দিতেন। সে শুধু জানতে চেয়েছিল, আমাকে কে খেতে দেবে। আর আমাকে খাবার খেতে দেখে খুশী হয়েছিল সকলের চেয়ে বেশি।

বিরূপাক্ষ বললেন: আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। শহরের খবর আমি আত্মীয়দের কাছে জেনে আসি।

আত্মীয়দের কাছে!

মিনতি হেসে বললেন: রেলের সব লোকই তো ওঁর আত্মীয়।

সেই সঙ্গেই যোগ করলেন: আর রাগ হলেই আমার ভাই।

বিরূপাক্ষ বেরিয়ে গিয়েছিলেন। মিনতির শেষ কথাটি শুনতে পেলে হয়তো একটা মন্তব্য করে যেতেন, কিংবা উপভোগ করতেন।

অভিমন্যু আমাকে বলল: একটা গল্প বল।

মিনতি বললেন: ভাল লোক ধরেছে।

গল্প বলা তো কঠিন নয়, এই বালকের উপযোগী গল্প বলা কঠিন। নিজের ছোট ভাই বোন ছিল না, ছোট ছেলে মেয়ের সঙ্গে মেলামেশারও সুযোগ পাই নি। তাদের মনের কথা আমার জানা নেই, তাদের ভাল মন্দ লাগানোর কৌশল আমার অজ্ঞাত। গাড়িতে যে ভোজরাজের গল্প বলেছি, অভিমন্যুর উপযোগী তা নিশ্চয়ই হয় নি। তার উপযোগী গল্প আমার সহসা মনে পড়ছে না।

অভিমন্যু তাড়া দিল: বল না!

হঠাৎ আমার এক কৃষক কন্যার কথা মনে পড়ে গেল। উত্তর জীবনে সেই কন্যাই এই শহরকে বর্তমান ইন্দোরে পরিণত করেন। বললুম: একটা মেয়ের গল্প শুনবে?

অভিমন্যু বলল: ছেলের গল্প বল।

বিপদের কথা।

মিনতির দিকে চেয়ে বললুম: এর চেয়ে ভূতের গল্প বলা সোজা দেখছি।

না না, ভূতের গল্প নয়: মিনতি যেন আর্তনাদ করে উঠলেন:

ওই সব আজগুবি গল্প শুনে শুনে ছেলেরা বড় ভীতু হয়ে যায়। তার চেয়ে আপনি মেয়ের গল্পই বলুন।

ততক্ষণে আমার সেই মেয়ের শ্বশুরের কথাও মনে পড়েছে। তাঁর শৈশবটাও গল্পের মতো। বললুম : বেশ তো, ছেলের গল্পই বলছি। মলহর রাও নামে একটি মারাঠী ছেলে। খুব গরিব। মামার বাড়িতে সে রাখালের কাজ করে। কিন্তু সে কাজ তার একটুও পছন্দ নয়। তার ইচ্ছে সৈনিক হয়ে যুদ্ধ করবে। যতই সে বড় হচ্ছে ততই তার আগ্রহও বাড়ছে। এক দিন তার সুযোগ এসে গেল। শিবাজীর নাম শুনেছ ?

মিনতি তাড়াতাড়ি বললেন : মারাঠা বীর শিবাজী। সেই বাঘের নখের গল্প মনে নেই ?

বিজ্ঞের মতো অভিমন্যু বলল : আছে বইকি !

বললুম : শিবাজী তখন মারা গেছেন, কিন্তু পেশোয়ারা খুব জোর করেছে। তাদের অনেক সৈন্য, অনেক শক্তি। সবার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে তারা সারাক্ষণ তৈরি। পেশোয়া বাজীরাওএর সেনাদলে মলহর রাও একটা সামান্য চাকরি পেয়ে গেল। কিন্তু যে সাহসী ও বীর, সে কি একটা সামান্য চাকরিতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে ! দেখতে দেখতে সবাই তার সাহস আর বীরত্বের কথা জেনে গেল। বাজীরাও মহা খুশী। বললেন, তোমাকে আমি এই মালব রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলাম। শাসনকর্তা কাকে বলে জান তো ! প্রায় রাজারই মতো। এই ইন্দোর তখন একটা ছোট্ট শহর, এখানেই তার রাজধানী হল।

অভিমন্যু মনোযোগ দিয়ে গল্প শুনছে। আমি থামতেই বলল : তারপর ?

তারপর সেই ছোট্ট মেয়ের গল্প। চাষীর মেয়ে। কিন্তু আজ তাঁকে সবাই জানে। বলে, প্রাতঃস্মরণীয়া। সকালে উঠে প্রণাম করবার মতো মহারাণী।

অভিমন্যু এবার আর আপত্তি করল না। বললুম: মলহর রাও এক দিন পুনা যাচ্ছিলেন। পথে একটি মন্দিরে বসে একজন লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। সেই সময় সেই মেয়েটি এল। চমৎকার ফুটফুটে মেয়ে। তাঁর ভারি ভাল লাগল। ভাবলেন, তাঁর ছেলে খণ্ডে রাওএর সঙ্গে এই মেয়েটির বিয়ে দেবেন। বড়লোকের এক কথা—তাঁরা যা ভাবেন তাই করেন। মলহর রাও তাঁর ছেলের সঙ্গেই এই চাষীর মেয়ের বিয়ে দিলেন।

মিনতি বললেন: কার কথা বলছেন?

বলছি।

কিন্তু আর কিছু বলবার আগেই বিরূপাক্ষ ফিরে এলেন। এসেই বললেন: চল।

অভিমন্যু বলল: গল্প?

তার জন্য ভাবনা কি! পথেই আমরা গল্প করব।

বিরূপাক্ষ একখানা টাঙ্গা ঠিক করেছিলেন। ভাল করে অন্ধকার হবার আগে সে-ই আমাদের সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবে। রেলের লোকের মধ্যস্থতায় গাড়ির ব্যবস্থা। ভাড়া নাকি সামান্যই লাগবে।

অভিমন্যুকে নিয়ে আমি টাঙ্গার সামনে বসলুম। কিন্তু চুপ করে বসে থাকতে সে দিল না। চারি দিকটা ভাল করে দেখে নিয়েই বলল: বল এই বারে।

বললুম: চাষীর মেয়ের কপালে অত সুখ সইবে কেন! ভরতপুরের কাছে কুম্ভের দুর্গ অবরোধ করতে গিয়ে খণ্ডে রাও মারা গেলেন। সেই মেয়েটির বয়স তখন আঠারো বছর, একটি ছোট ছেলে আর একটি মেয়ে হয়েছে তার। বলল, চিতায় উঠে আমি সহমরণে যাব, এক সঙ্গে পুড়ে মরব। কিন্তু বুড়ো রাজা রাজী হবেন কেন! তিনি বললেন, ছেলে গেছে, মেয়েও যদি যায় তো আমি কাকে নিয়ে বাঁচব! বুড়োর কান্না দেখে বউএর আর মরা হল না।

বিরূপাক্ষ বললেন: এ কার কথা বলছেন?

বললুম : এক চাষীর মেয়ের কথা। সামান্য শিক্ষা পেয়ে রাজ-অন্তঃপুরে এসেছিলেন। স্বামীকে হারিয়ে এবারে রাজকার্য শিখতে লাগলেন বুড়ো রাজার কাছে। যখন তাঁর বছর চল্লিশেক বয়স, তখন বুড়ো রাজার মৃত্যু হল। রাজা হল তাঁর নাতি, রাজা হবার অযোগ্য ছেলে মালে রাও। ন মাস পরে তারও মৃত্যু হল।

বিরূপাক্ষ জানতে চাইলেন : যুদ্ধে ?

বললুম : না। শৈশবে তাকে নির্বোধ ও লঘুচিত্ত বলে মনে হত। সিংহাসনে বসবার পর পাগলের লক্ষণ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত একজনকে হত্যা করে পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে যায়। এর অল্প দিন পরেই মৃত্যু হয় তার। তারপরেই প্রজা বিদ্রোহ। প্রজারা চায় তাদের মনোনীত কোন লোক রাজা হোক, আর রাজমাতা চান রাজ্য তাঁরই হাতে থাক। এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ পেয়েই তিনি কঠিন হাতে এই বিদ্রোহ দমনের ব্যবস্থা করলেন। প্রতিবেশী মারাঠা রাজাদের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়ে নিজে বেরলেন তাঁর সেনাদল নিয়ে। রাজমাতাকে হাতির পিঠে উঠে সৈন্য চালনা করতে দেখে সবাই মেতে উঠল। যুদ্ধ আর হল না, ভয়ে সবাই পালিয়ে গেল। ইন্দোর রাজ্যের রাণী হলেন চাষীর মেয়ে অহল্যাবাঈ।

মিনতি আশ্চর্য হলেন। কিন্তু বিরূপাক্ষ বললেন : চাষীর মেয়ে কথাটার ওপর আপনি বড় বেশি জোর দিচ্ছেন।

আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।

আপনি বোধ হয় বলতে চেয়েছেন যে প্রাতঃস্মরণীয়া হবার জন্য রাজকন্যা হবার প্রয়োজন নেই!

মীরাবাঈও সাধারণ ঘরের মেয়ে ছিলেন। আধ্যাত্মিক জগতে তিনি অবিস্মরণীয়া।

মিনতি বললেন : শুনেছি, দুজনেরই জীবন ছিল দুঃখের।

কিন্তু তফাৎ আছে অনেক। একজন রাজরাণী হয়ে গিরিধারী গোপালের জন্য সব ত্যাগ করেছিলেন, অন্য জন সংসারের সব

সুখ হারিয়ে রাজরাণী হয়েছিলেন।

তাঁর মেয়ে-জামাই?

বলে মিনতি পিছন ফিরে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম: মেয়ে জামাইকেও তিনি অকালে হারিয়েছিলেন। কবে কেমন করে তাঁর জামাইএর মৃত্যু হয়েছিল তা জানি নে, তবে এ কথা জানি যে সেই মেয়ে মুক্তাবাঈ মায়ের সমস্ত অনুরোধ উপেক্ষা করে সহমরণে গিয়েছিল। মেয়েকে রক্ষার জন্য অহল্যাবাঈ অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাকে নিবৃত্ত করতে পারেন নি। তাঁর তো গিরিধারী গোপাল ছিল না! পুত্র কন্যা জামাতাকে হারিয়ে কী নিয়ে তিনি বেঁচে ছিলেন বলুন তো?

কোন উত্তর না দিয়ে মিনতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

আমার প্রশ্নের উত্তর আমি নিজেই দিলুম, বললুম: প্রজাদের নিয়ে। তিনি বলতেন খাজনা আমার চাই নে, চাই প্রজাদের সুখ। আমার প্রজা সুখী হলেই আমি সুখী হব। এ তাঁর মুখের কথা নয়। জনৈক রাজকর্মচারীকে তিনি লিখে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার জন ম্যাল্‌কম্ ছিলেন তাঁর সমসাময়িক। এঁরই লেখায় আমরা আবিষ্কার করেছি অহল্যাবাঈকে। ব্যক্তিগত জীবন যাত্রায় যেমন সরল ও স্বভাবে কোমল ছিলেন, রাজ্য শাসনের ব্যাপারে তেমনি পরিশ্রমী ও কঠোর ছিলেন। শান্তি রক্ষার জন্য একবার তাঁকে হত্যার আদেশ দিতে হয়েছিল—একজন দুজনকে নয়, তাঁর রাজ্যের বহু ভীল সর্দারকে হত্যা করতে বলেছিলেন। ম্যাল্‌কম্ বলেছেন, মালব দেশে অহল্যাবাঈ ছিলেন সুশাসনের প্রতীক। সে যুগের মহিলারা যখন অন্তঃপুরে অসূর্যম্পশ্যা, অহল্যাবাঈ তখন রাজসভায় পাত্রমিত্র পরিবৃত হয়ে রাজকার্য করতেন। তাঁর নিজের জীবন ছিল ফুলের মতো পবিত্র। প্রত্যুষে স্নান-সন্ধ্যার পর তিনি ধর্মপুস্তক পাঠ করতেন। দরিদ্রকে ভিক্ষা দিয়ে ও ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে সামান্য কিছু আহার করতেন।

তারপর রাজকার্য, সে প্রায় রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত। সায়াহ্নে ঘণ্টা তিনেক সন্ধ্যাবন্দনা।

আর একটি কথা না বললে অহল্যাবাঈএর কথা সম্পূর্ণ হবে না। কেন তিনি তীর্থে তীর্থে তাঁর সমস্ত সম্পদ ব্যয় করেছিলেন, সেই কথা। ব্যয়ের জন্য রাজকোষ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা বাৎসরিক বরাদ্দ ছিল। আর রাণী হবার সময় তিনি হাতে পেয়েছিলেন ষোল কোটি টাকা। নিজে তপস্বিনীর জীবন যাপন করে এই টাকা তিনি ভুখা ভারতবাসীর ভোগে দিয়েছিলেন—দেহের ক্ষুধা নিরসনে নয়, আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষের জন্য। গৃহে আছে বন্ধন, সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা। পথে মুক্তি, উদার প্রসন্নতা। অনির্দিষ্ট পথের শেষ নেই, তীর্থের পথ এক তীর্থ থেকে অন্য তীর্থে গেছে। রাণী অহল্যাবাঈ বেরতেন মুঠো মুঠো বীজ সঙ্গে নিয়ে। রাস্তার দুধারে সেই বীজ বপন করতেন। সেই বীজ আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

একটি প্রাণ। শাশ্বত ভারতীয় প্রাণ। পথে কাঁটা আছে, তুলে ফেলে দাও। মৃত্যু ভয় আছে, নিজে বুক পাত। পিছনের পথ হোক নিষ্কণ্টক, পিছনের মানুষ আসুক নির্ভয়ে। অহল্যাবাঈ ভারতের সেই আদিম পথিক। নমস্যা, প্রাতঃস্মরণীয়া।

৫

বিরূপাক্ষ আমাদের টাঙ্গাওয়ালাকে সোজা কাচ মন্দিরে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কাচ মন্দির জৈন দিগম্বরদের মন্দির, কিন্তু তার দরজা সরকারী দপ্তরের মতো দশটা পাঁচটা খোলা থাকে। তার পরে পৌঁছলে ইন্দোরের এই প্রধান দর্শনীয় স্থানটি আমাদের নাকি দেখা হবে না। টাঙ্গাওয়ালাও এ কথা জানত, তাই কোনখানে দেরি না করে কাচ মন্দিরের দরজায় এসেই থামল। আমরা তাড়াতাড়ি নেমে পড়লুম।

কিন্তু মন্দির কোথায়! মন্দিরের মতো তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না!

টাঙ্গাওয়ালাই দেখিয়ে দিয়ে বলল : এই তো মন্দির!

বাহির থেকে এটি একটি ধনীর বাসগৃহ বলে মনে হচ্ছে। তারই পাশে প্রাসাদের মতো একটি বিরাট অট্টালিকা। আরও সুন্দর, আরও জমকালো। এই কাচ মন্দির নির্মাতা স্বর্গত হুকুমচাঁদের বাসগৃহ শীশমহল। তাঁর ইন্দ্রভবন ও রঙ্গমহলও দেখবার মতো। কিন্তু বিরূপাক্ষ আমাদের দাঁড়াতে দিলেন না, বললেন : চলে আসুন তাড়াতাড়ি, দরজা বন্ধ হয়ে গেলে পস্তাতে হবে।

দিনের আলো তখন নিবে এসেছিল, মন্দিরের দরজা বন্ধের সময় বোধহয় অনেক আগেই হয়েছিল। ভিতরে ঢোকবার জন্যে বাধা পেয়েও আমরা পেলুম না। পরে জানলুম যে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয় না। মন্দিরের দরজা খোলাই থাকে। যাঁরা জৈন নন, তাঁদের জন্যেই শুধু প্রবেশ নিষেধ হয়ে যায়। ধর্মে জৈন এ কথা প্রমাণ করতে না পারলে ফিরে আসতে হয়। তার জন্য দ্বাররক্ষীর কাছে পরীক্ষা দিতে হয়, কতকটা পুরাকালের নালন্দা বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের মতো। পরিচিতদের কোন পরীক্ষা দিতে হয় না। অপরিচিত হলে ধর্মের দু-চারটে সূক্ষ্ম প্রশ্নের উত্তর যথাযথ দিতে না পারলে অপরিচিত জৈনদেরও বিপদে পড়তে হয়।

পরে একটি ছেলের কাছে আমি এই গল্প শুনেছিলুম। সে তার এক জৈন বন্ধুর সঙ্গে সন্ধ্যা বেলায় এসেছিল কাচ মন্দির দেখতে। একালের ছেলে, মেডিকেল কলেজের ছাত্র। ধর্মের কথা নিজেই ভাল জানে না, অথচ জৈন। কিছু উত্তর দিতে পেরেছিল, কিছু পারে নি। অনেক অনুনয় করে প্রবেশের অধিকার পেয়েছিল।

আমাদের বেলায় সে রকম কিছু হল না। বিদেশী বলেই বোধহয় বলল: তাড়াতাড়ি দেখে নিন।

তাড়াতাড়ি দেখব কি! ভিতরে ঢুকেই হতবাক হয়ে যেতে হয়। এ মোগল বাদশাহের শীশমহল নয়, এ কাচ মন্দির, ধর্মমন্দির। শুধু কাচ, নানা রঙের কাচ, আর কাচের মতো রঙ বেরঙের পাথর। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দার মতো একটি ঘর, তার ভারী রূপোর দরজা আগলে আছে বন্দুকধারী দ্বারপাল। এক ভদ্রলোকও আছেন। মন্দিরের অপর দিকেও ঠিক এই রকম। সেদিকেও সিঁড়ি আছে মন্দিরে ঢোকবার, রূপোর দরজা আছে, বন্দুকধারী দ্বারপাল আছে, আছেন এক ভদ্রলোক।

ফেরার সময় আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম: মন্দিরের প্রধান দরজা কোন্‌টি?

যে ধার দিয়ে ঢুকেছিলাম সেই দরজার প্রহরী বলল: সদর রাস্তার উপরে এই দরজাটিই প্রধান দ্বার।

কিন্তু অন্য দিকের দ্বারপাল বলেছিল: এ দিকের দরজাটিই প্রধান।

কেন?

এই দ্বার দিয়ে ঢুকলে দেবতার দর্শন পাওয়া যায় মুখোমুখি।

কথাটা মিথ্যা নয়। ছোট ঘর থেকে বড় ঘরে ঢুকলেই এই

ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রথমেই চোখে পড়ে না, ভিতরের ঐশ্বর্য দেখে ধাঁধা লাগে চোখে। কী উজ্জ্বল জমকালো পরিবেশ। দিনের বেলাতেই মনে হয় যে অসংখ্য বাতি জ্বলছে উপরে ও নিচে। কিন্তু আসলে একটি বাতিও জ্বলছে না। বড় বড় ঝাড় লণ্ঠন ঝুলছে উপর থেকে, অন্ধকার হলে এগুলো জ্বলে কিনা জানি না। দেবতার দর্শন পেলুম পিছন ফিরে। রূপোর তিনটি বেদীর উপরে তিনজন তীর্থঙ্করের পদ্মাসন মূর্তি—একটি কষ্টি পাথরের বৃহৎ কালো মূর্তি, আর দুটি শ্বেত পাথরের—চন্দ্রপ্রভু শান্তিনাথ ও আদিনাথ।

অভিমন্যুর উল্লাস আর ধরে না, বলল: কী সুন্দর মন্দির মা, এরকম মন্দির আমরা কোথাও দেখি নি।

বলে মেঝের উপরে নেচে নেচে সব দেখতে লাগল।

মিনতি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, তার হাত ধরে বললেন: লাফিও না, পা কেটে যাবে।

সত্যিই পা কাটবার ভয় হচ্ছিল আমার। বাহিরে জুতো ও চটি খুলে আমাদের ভিতর ঢুকতে হয়েছে। খালি পায়ের নিচে কাচের মেঝে। বড় কাচ নয়, কাচের ছোট ছোট চৌকো টুকরো জুড়ে এই মেঝে, জোড়াগুলো পায়ের নিচে বেশ অনুভব করা যায়। কোথাও ভাঙা বা জোড়া আলগা থাকলেই পা কেটে যাবে। ভাঙা যে নেই তা নয়, কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলুম যে সেইসব ভাঙা মেরামত হচ্ছে। মেরামতের কাজ বোধহয় কখনও বন্ধ হয় না।

হঠাৎ অভিমন্যু বলে উঠল: এসব কিসের ছবি বাবা?

দেওয়াল ছবি দেখছিল সে। তার প্রশ্ন শুনে আমিও সেদিকে তাকালুম। ভয়াবহ সেই সব চিত্র। পাপীর নরক যন্ত্রণার নানা দৃশ্য দেওয়ালে টাঙানো আছে। মন্দিরের ভিতরে এই সব বীভৎস ছবি টাঙাবার অর্থ খুবই স্পষ্ট। ভয়ে মানুষ পাপ-বিমুখ হবে। হিন্দু মন্দিরের গায়ে অশ্লীল মূর্তির কথাও আমার মনে পড়ল। তার সপক্ষে নানা আলোচনা শুনেছি, কিন্তু সত্যিকার কোন যুক্তি খুঁজে পাই নি।

বিরূপাক্ষ যখন অভিমন্যুকে এই ছবির অর্থ বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন, তখনই বুঝতে পারা গেল যে আমরা অন্যায় ভাবে মন্দিরের ভিতরে অবস্থান করছি। অনেক আগেই আমাদের বেরিয়ে আসা উচিত ছিল। ভদ্র ভাবে একজন বললেন: কাল আসবেন, এসে উপর তলাটাও দেখে যাবেন।

দরজার কাছে এসে বিরূপাক্ষ বললেন: কী আছে উপর তলায়?

উত্তর পাওয়া গেল: তীর্থঙ্করদের তিনটি ব্রোঞ্জের মূর্তি। একই তীর্থঙ্করের মূর্তি, কিন্তু দুটি আয়নার মাঝে এমন করে রাখা হয়েছে যে মনে হবে মূর্তির শেষ নেই—অসংখ্য মূর্তি।

অভিমন্যু বলে উঠল: চল না দেখে আসি!

বিরূপাক্ষ তার হাত চেপে ধরে বললেন: পরে দেখব।

কিন্তু মিনতির যে এই উত্তর পছন্দ হল না, তা তাঁর মুখের দিকে চেয়েই আমি বুঝতে পারলুম। কিন্তু তিনি কোন কথা বললেন না।

বাহিরের রাস্তায় নেমে বিরূপাক্ষ বললেন: এ রকমের মন্দির আমরা কোথাও দেখি নি, তাই না?

বলে মিনতির দিকে তাকালেন।

মিনতি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: বৃন্দাবনে একটি কাচ মন্দিরে আছে না গোপালবাবু!

আছে। সে বোধহয় লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির। কিন্তু এমন জমকালো নয়।

আজমেরের একটি জৈন মন্দিরের কথাও আমার মনে পড়ল। সে মন্দির আবু পাহাড়ের দিলওয়ারা মন্দিরের মতো গম্ভীর নয়, রাজা বাদশাহর শীশমহলের মতো রঙিন স্বপ্নের। ইন্দোরের কাচ মন্দিরের সঙ্গে তার কিছু মিল থাকতে পারে।

বিরূপাক্ষ বললেন: উজ্জয়িনীতেও শুনেছি একটা কাচ মন্দির তৈরি হয়েছে। সে বোধহয় শ্বেতাম্বর জৈনদের কীর্তি। কিন্তু এমন ঐশ্বর্যশালী নয়।

এখানকার এই মন্দির যিনি নির্মাণ করিয়েছেন, সেই হুকুমচাঁদের কথা জানতে চাইলেন মিনতি। বিরূপাক্ষ আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি বললুম : কোন রাজা বাদশাহ নয়, একজন ধনী ব্যবসায়ী বলে শুনেছিলুম। বাঙলায়ও তাঁর নাম আছে।

কী রকম ?

বলে বিরূপাক্ষ আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম : নৈহাটির কাছাকাছি কোথাও হুকুমচাঁদ জুট মিলস আছে শুনেছি। মনে পড়ছে, কে একজন বলেছিল যে এই হুকুমচাঁদ ফট্‌কার বাজারে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে যান। শেষ জীবনে নাকি বৈরাগ্য নিয়েছিলেন। ছেলেদের হাতে ব্যবসা তুলে দিয়ে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন।

দেশ ইন্দোরে, না রাজস্থানে ?

বললুম : জানি নে। তবে এই সব ঘর বাড়ি দেখে এইটাই তাঁর দেশ বলে সন্দেহ হচ্ছে।

বিরূপাক্ষ বললেন : আমাদের মতো ভারতবর্ষেরই লোক তাঁরা। এর বেশি জানবার প্রয়োজন দেখি নে।

বলে টাঙ্গায় উঠে পড়লেন। আমরাও উঠলুম। ঠিক আগের মতো করে বসলুম সবাই।

একটু পরেই দেখতে পেলুম যে একটা বাজারের ভিতর দিয়ে আমরা চলেছি। দুধারে সোনা রূপোর দোকান। টাঙ্গাওয়ালা বলল, এরই নাম সরাফা বাজার। শুধু সোনা চাঁদি নয়, টাকা পয়সারও লেনদেন হয়। মারওয়াড়ীদের এই ব্যবসা।

এখানেও মারওয়াড়ী !

বলে বিরূপাক্ষ বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

আমি বললুম : কোথায় নেই তারা !

তারপরেই বললুম : এক সময় বাঙালীও তো ভারতের সর্বত্র বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ডাক্তার উকিল ব্যারিস্টার বড়

চাকুরে—কোন্ পদে ছিলেন না।

বিরূপাক্ষ বললেন : সেদিন আর ফিরে আসবে না।

কিন্তু এই সরাফা বাজারেই যে রসগোল্লা চমচম প্রভৃতি বাঙলার মিষ্টি পাওয়া যায় তা বিরূপাক্ষ স্টেশনে ফিরে শুনেছিলেন।

আর একটু এগিয়ে আমরা জুনা রাজোয়াড়ার সামনে এসে পৌঁছলুম। জুনা রাজোয়াড়া মানে পুরনো রাজবাড়ি। সৌরাষ্ট্রেও জুনাগড় মানে পুরনো গড়। রাজস্থানেও তাই। এখানেও পুরনো দুর্গকে জুনাগড় বলে। এই জুনা রাজোয়াড়া আর রাজোয়াড়া নয়, এই আটতলা প্রাসাদে এখন সরকারী দপ্তর বসেছে। যেমন বড় প্রাসাদ, তেমনি তার সিংহদ্বার।

অভিমন্যু জিজ্ঞাসা করল : রাজা এখন কোথায় থাকেন?

এ কথার উত্তর আমাদের জানা ছিল না। তবে শুনেছিলুম যে এই প্রাসাদের উত্তরেই নূতন রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়েছে। আরও দুটি প্রাসাদ আছে ইন্দোরে। শহরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে লালবাগ প্রাসাদ, আর মাণিকবাগ প্রাসাদে রাজ্যের বিশিষ্ট অতিথিদের আপ্যায়িত করা হয়।

এই রাজোয়াড়ার সামনেই আমরা একটা স্ট্যাচু দেখতে পেলুম। সারদা মায়ের মতো ঘোমটা দেওয়া পদ্মাসনা মূর্তি। কাউকে জিজ্ঞাসা না করেই বোঝা গেল যে ইনিই রাণী অহল্যাবাঈ, যিনি তিরিশ বছর ধরে ইন্দোর রাজ্য শাসন করেছেন মায়ের মতো।

ইন্দোরের রাজাদের সমাধি স্থান ছত্রিবাগে। সব চেয়ে বড় সমাধি সৌধ হল প্রথম রাজা মলহর রাওএর। ভিতরে অনেক সুন্দর ফ্রেস্কো আছে। অহল্যাবাঈএরও একটি ছোট সমাধি সৌধ আছে। অহল্যাবাঈএর পুত্র মালে রাওএর সমাধি ছত্রিবাগে।

সাধারণের ধারণা যে ইন্দোর শহরের প্রতিষ্ঠাতা হলেন রাণী অহল্যাবাঈ। কথাটা সত্য নয়, আবার অসত্যও নয়। রাণী অহল্যাবাঈ নিশ্চয়ই কোন ময়দানে এই শহর পত্তন করেন নি,

কাজেই ইন্দোরের একটা অতীত ছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। প্রাচীন শিলালিপিতে ইন্দ্রপুর নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এই ইন্দ্রপুরই যে বর্তমান ইন্দোর তার প্রমাণ সংগ্রহ করা শক্ত। ইন্দোরের লোক বিশ্বাস করে যে মারাঠা বীর শিবাজীই ইন্দোরের আবিষ্কর্তা। দিল্লীর বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি যখন দাক্ষিণাত্যে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি এইখানে কিছু সময় কাটিয়েছিলেন। এই জায়গাটি তখন একটি গ্রাম ছিল। কিন্তু ছত্রপতি শিবাজীর ভাল লেগেছিল গ্রামটি। ইন্দ্রেশ্বর দেবতার নামে গ্রামের নাম হয়েছিল ইন্দ্রেশ্বর। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কামাপলের ভূস্বামী এসে বসবাস শুরু করেন। ইন্দোর রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল মহেশ্বরে, পুরাণে তার নাম মাহিষ্মতী। ব্যবসায়ের গুরুত্ব দেখে অহল্যাবাঈ তাঁর শাসন কেন্দ্র স্থানান্তরিত করেছিলেন মহেশ্বর থেকে ইন্দোরে। হোলকার রাজ্যের রাজধানী কবে স্থানান্তরিত হয়, সে কথা আমার জানা নেই। কিন্তু সরস্বতী ও ঘাগ নদীর সঙ্গমে বর্তমানের ইন্দোর শহরটি যে রাণী অহল্যাবাঈ গড়ে তুলেছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

রাণীর দূরদর্শিতা সর্বজন স্বীকৃত হয়েছে। বর্তমান ভারতের প্রধান শহরগুলির অন্যতম হল ইন্দোর, মধ্যপ্রদেশের শ্রেষ্ঠ শহর। দিল্লী ও বম্বে থেকে এর দূরত্ব প্রায় সমান। বম্বে পাঁচ শো মাইলের কম, আর দিল্লী প্রায় সাড়ে পাঁচ শো মাইল। ইন্দোরের উপর দিয়ে গেছে ন্যাশনাল হাইওয়ে। বাস যাতায়াত করে দূর পাল্লার। ছোট ও বড় লাইনের ট্রেন আছে। ছোট লাইনের গাড়ি খাণ্ডোয়া থেকে আজমের যায় উজ্জয়িনী ও রাতলামের উপর দিয়ে। বড় লাইনের গাড়িও উজ্জয়িনীর উপর দিয়ে রাতলাম ও ভোপালে যায়। উড়োজাহাজও আছে।

ইন্দোরের প্রধান বাণিজ্য হল কাপড়। আমেদাবাদ

কইম্বাতুরের পর এর স্থান। কাপড়ের মিল আছে সাতটা, প্রায় শ তিনেক ফ্যাক্টরি, লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ। স্কুল কলেজের সংখ্যা শুনে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। সব শুদ্ধ তিন শো একচল্লিশটা। তার মধ্যে চব্বিশটা কলেজ ও চৌত্রিশটা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল। একটা বিশ্ববিদ্যালয়। গোটা সাতেক হাসপাতাল আছে। সরকারী পুস্তিকায় আমি এই সব খবর দেখেছিলুম।

এই পুস্তিকাটি বিরূপাক্ষ পেয়েছিলেন স্টেশনে ফিরবার পরে। একজন রেলের লোক তাঁকে দেখতে দিয়েছিলেন। ইন্দোর শহরের একটা নক্সাও ছিল তাতে। নেহরু রোড মহাত্মা গান্ধী রোড ও নেতাজী সুভাষ রোড এই শহরের তিনটি প্রধান পথ পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। স্টেশন থেকে বেরোবার পথ পূর্বে, কিন্তু শহরটা পশ্চিমে। নেহরু রোড দক্ষিণে, স্টেশনের অপর দিকে। আমরা উত্তরে গিয়ে পুলের উপর দিয়ে রেল লাইন পেরিয়ে শহরে গিয়েছিলুম। এই পথের নামই গান্ধী রোড, পশ্চিমে ধার হয়ে মাণ্ডু গেছে। শহরের শেষ প্রান্তে বড় গণপতি মন্দির এই পথের ধারেই।

বম্বে আগ্রা রোড শহরের পূর্ব দিকে। পিপালিয়া পালা নামে একটি সুন্দর সরোবরের নিকট দিয়ে এই পথ মৌ অভিমুখে গেছে। এ পথেও মাণ্ডু যাওয়া যায়, সংক্ষিপ্ত পথ, কিন্তু ধার এ পথে পড়ে না।

দেখবার মতো ঘর বাড়ি শহরে অনেক ছিল। যেমন মতি বাংলো, গান্ধী ভবন, সুখনিবাস মহল, শিববিলাস মহল, হাওয়া মহল, রাণা মণ্ডল, মলহর আশ্রম, অহল্যাশ্রম, রেসিডেন্সি, নওলাখা গার্ডেন্‌স্। কিন্তু বিরূপাক্ষ এ সব দেখতে চাইলেন না। রাজোয়াড়া থেকেই বাস স্ট্যাণ্ডে উপস্থিত হলেন মাণ্ডু যাবার ব্যবস্থা করতে।

খুব ভাল সময়েই আমরা এসেছিলুম। যোগাযোগ ভাল হল।

স্কুল কলেজের এক দল ছেলে মেয়ে মাণ্ডু দেখতে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে কয়েক জন অভিভাবক। তাঁরা এসেছিলেন একখানা পুরো বাস রিজার্ভ করতে। সেই বাসেই জায়গা পাওয়া গেল। তাতে লাভ হল দু রকমের। পথে লোকজন ওঠানামায় দেরি করবে না আর মাণ্ডুর সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবে। তার জন্যে যাতায়াতের ভাড়ার উপর কয়েক আনা বেশি পয়সা দিতে হবে। ভোর ছটায় আমাদের বাস স্ট্যাণ্ডে এসে হাজির হতে হবে স্থির হল।

বিরূপাক্ষই খুশী হলেন সব চেয়ে বেশি। বললেন: কেমন ব্যবস্থা হল বলুন তো!

স্টেশনে ফেরার জন্যে পা বাড়িয়ে আমি বললুম: চমৎকার।

৬

স্টেশনের নিকটেই বাস স্ট্যাণ্ড। হোটেল রেস্তোরাঁও আছে অনেকগুলি। তাই দেখে বিরূপাক্ষ বললেন: এখানে চা খেয়ে গেলে মন্দ হত না, কী বল?

বলে মিনতির দিকে তাকালেন।

মিনতি কোন উত্তর না দিয়ে হাসলেন। আর অভিমন্যু বলল: আমার কাছে একটা গল্প শুনে নেওয়া যাবে।

কাজেই স্টেশনে না এসে আমরা একটা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লুম।

অভিমন্যুকে কী খেতে দেওয়া যায়, মিনতি বোধহয় তাই দেখছিলেন। কিন্তু অভিমন্যু তখন গল্প শোনবার জন্যে আমার কাছে ঘনিয়ে বসেছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম: কী গল্প শুনবে বল তো?

অভিমন্যু তার মায়ের দূরত্বটা দেখে নিয়ে বলল: যে কোন গল্প।

মানে ভূতের গল্পও এখন বলা যেতে পারে। মা কাছে নেই বলে আপত্তি করবেন না।

আমার কিন্তু পুরাণের একটা গল্প মনে পড়ে গেল। বললুম: এই রাজ্যের রাণী অহল্যাবাঈএর গল্প তো বলেছি, কিন্তু পুরাকালে এই রাজ্যের রাজা কে ছিলেন জান?

অভিমন্যু মাথা নেড়ে বলল: জানি না।

রামায়ণের গল্প তুমি শুনেছ?

অভিমন্যু সগর্বে বলল: রামের গল্প তো! কাঠবেরালিরা সমুদ্রের ওপরে পুল তৈরি করেছিল, আর সেই পুল পেরিয়ে লঙ্কায় গিয়ে রাবণ রাজার দশটা মাথা কেটেছিল রাম।

আমি বললুম : এই তো, তোমার সব মনে আছে দেখছি।

মিনতি ফিরে এসে হাসিমুখে বললেন : মামা ভাগ্নেয় কী গল্প হচ্ছে?

অভিমন্যু উত্তর দিল : রামের গল্প।

আমি বললুম : রামের গল্প তো তোমার জানা। আমি তোমাকে রাবণের একটা গল্প বলব। রাবণ একবার এইখানে এসেছিলেন, আর যুদ্ধ করেছিলেন অর্জুনের সঙ্গে।

বিরূপাক্ষ হেসে বললেন : তৈরি করে গল্প বলছেন নাকি!

বললুম : না।

তবে ত্রেতা যুগে অর্জুনকে পেলেন কোথায়?

বললুম : এ অর্জুন পাণ্ডুপুত্র নয়, ইনি হলেন হৈহয়রাজ কৃতবীর্যের পুত্র। ত্রেতা যুগে কিংবা তারও আগে এই রাজ্যের নাম ছিল হৈহয় রাজ্য, তার রাজধানী ছিল মাহিষ্মতীতে। নর্মদার তীরে ছিল সেই নগর। এখন যেখানে মহেশ্বর, পুরাকালে সেইখানেই ছিল মাহিষ্মতী। মহেশ্বরের কথা মনে আছে তো? প্রথম জীবনে অহল্যাবাঈ সেখান থেকেই রাজ্য পরিচালনা করেছেন। প্রচুর উন্নতি করেছিলেন এই শহরের। নর্মদার ঘাট বাঁধিয়ে দিয়ে অনেক মন্দির তৈরি করে দিয়েছিলেন। তারপর সে সব ফেলে রেখে ইন্দোরে তুলে এনেছিলেন রাজ্যের রাজধানী।

অভিমন্যুর এ সব কথা ভাল লাগছিল না। বলল : রাবণের কী হল?

বললুম : রাবণের তখন ভারি অহংকার। বলতেন, ত্রিভুবনে তাঁর মতো বীর আর নেই। কিন্তু মুখে বললেই তো হবে না! কাজে সে কথা প্রমাণ করতে হবে। তাই তাঁকে দিগ্বিজয়ে বের হতে হল। দিগ্বিজয় মানে বোঝ তো? স্বর্গ মর্ত্য পাতালে যত রাজা আছে, সবাইকে যুদ্ধ করে হারাতে হবে।

তারপর ?

বলে অভিমন্যু আগ্রহের সঙ্গে তাকাল।

বললুম : রাবণ এসে নর্মদা নদীর তীরে শিবির ফেললেন। সঙ্গে তাঁর পাত্রমিত্র আছেন, বড় বড় সেনাপতি আর সেনাদল আছে। নদীতে স্নান করে রাবণ সন্ধ্যা আহ্নিক করতে বসলেন। নদীর তীরে বসেছিলেন বলে হঠাৎ এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলেন— নদীর জল উজানে বইছে। সমুদ্র তো কাছে নয় যে জোয়ারের জল আসবে ! আশ্চর্য হয়ে রাবণ তাঁর পাত্রমিত্রদের বললেন, খবর নাও, ব্যাপারটা কী। খবর নিয়ে তারা ফিরে এল। এ দেশের রাজা তাঁর রানীদের নিয়ে নদীতে স্নান করতে নেমেছেন। কিন্তু তাতে নদীর জল উজানে বইবে কেন ? রাবণকে তারা বলল যে রাজার নাকি এক হাজার হাত, সেই হাত দিয়ে তিনি নদীর জল আটকে রেখেছেন, জল তাই উজানে বইছে। রাবণ ভারি খুশী। বললেন, এই রাজার সঙ্গেই তাহলে যুদ্ধ করব।

অভিমন্যু আশ্চর্য হয়ে বলল : একটা মানুষের এক হাজার হাত !

বললুম : জন্মেই কি আর এক হাজার হাত ছিল! দত্তাত্রেয় মুনির বরে তাঁর এক হাজার হাত হয়েছিল। রাবণ দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন, তাই সাহস করে এগিয়ে গেলেন এই রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

খুব যুদ্ধ হল বুঝি ?

বলে অভিমন্যু আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললুম : উহুঁ, যুদ্ধ যেমন জোর হবে বলে সবাই আশা করেছিল, তেমন কিছুই হল না।

কেন ?

দু দেশের রাজা যুদ্ধ করবেন, মজা দেখবার [illegible] লোক জমা হয়ে গেল কাতারে কাতারে। দু পক্ষেরই লোক। রাবণ তাঁর

সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এগিয়েছিলেন। কিন্তু অর্জুন খপ্ করে তাঁকে ধরে ফেলে এক হাজার হাতে বুকের ভেতরে চেপে ধরলেন। রাবণ চেঁচাতে লাগলেন, কিন্তু সেই হাতের ভেতর থেকে বেরোবার পথ আর খুঁজে পেলেন না।

কী হল তারপর?

কী আর হবে! রাবণকে বন্দী করে অর্জুন বাড়ি চলে গেলেন। আর তাঁর পাত্রমিত্ররা দৌড়ল রাবণের ঠাকুর্দা পুলস্ত্য মুনির কাছে। বুড়ো মুনি আর কী করেন, হাজার হলেও নাতি তো! তাই অর্জুনের কাছে এসে বললেন, ছেড়ে দাও একে, তোমার সঙ্গে আর কোন দিন যুদ্ধ করতে চাইবে না।

ছেড়ে দিলেন?

বললুম: সোজাসুজি ছেড়ে দিলেন না। আগুন জ্বেলে বললেন, এই আগুনকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা কর, বন্ধুতা করলে আমার সঙ্গে, আর কখনও শত্রুতা করতে আসবে না। তাতেই রাজী হয়ে রাবণ রক্ষা পেলেন অর্জুনের কাছে।

মিনতি বললেন: গল্পটা সত্যি তো!

বললুম: খাঁটি সত্যি। এই অর্জুন পুরাণে কার্তবীর্যার্জুন নামে পরিচিত। এরই পাপে ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস হয়েছিল একুশবার। পরশুরাম তাঁর এক হাজার হাত কেটে বধ করেছিলেন এই অর্জুনকে। কিন্তু তাতেও তাঁর রাগ পড়েনি। পৃথিবীকে ক্ষত্রিয় শূন্য করবার জন্যে তিনি প্রতিজ্ঞা করে একুশ বার ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করেছিলেন।

মিনতি একটু ইতস্তত করে বললেন: কিন্তু অর্জুনের পাপটা কী?

বললুম: পাপ নয়, আবার পাপেরই মতো। লোভও তো পাপ।

বিনায়ক চা খেতে খেতে বললেন: ভণিতা করছেন কেন, গল্পটা বলেই ফেলুন।

বললুম : রাজা বেরিয়েছিলেন মৃগয়া করতে, বনের মধ্যে উপস্থিত হলেন জমদগ্নি ঋষির আশ্রমে। ঋষি তাঁদের শ্রান্ত ক্লান্ত দেখে বললেন, বিশ্রাম করে কিছু খেয়ে যাও। কিন্তু রাজারা তো মৃগয়ায় একা বেরোতেন না, তাঁদের সঙ্গে থাকত বিরাট সেনাবাহিনী। রাজাকে খাওয়ানো মানে তাঁর সেনাবাহিনীকেও খাওয়াতে হবে। অথচ বনবাসী মুনি ঋষিরা অত খাবার জিনিস কোথায় পাবেন!

অভিমন্যু বলল : দোকান থেকে কিনে আনবেন।

এ কথার উত্তর দিলেন মিনতি, বললেন : সেকালে কি এখনকার মতো দোকান ছিল, না টাকা পয়সা ছিল মুনি ঋষিদের! গরুর দুধ আর বনের ফলমূল খেয়ে তাঁরা থাকতেন।

ভাত খেতেন না?

কঠিন প্রশ্ন। মিনতি এবারে আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি বললুম : জুটলে খেতেন বৈকি। কিন্তু মুনি ঋষিরা তো চাষ বাস করতেন না। তাঁদের শিষ্যরা যদি কিছু করত, তাহলে ভাত তরকারীও খেতেন।

বিরূপাক্ষ বললেন : আপনি মশাই মৃগয়ার গল্পটা তাড়াতাড়ি শেষ করুন।

বললুম : এ গল্প ঠিক বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের গল্পের মতো। বশিষ্ঠের যেমন নন্দিনী নামে এক কামধেনু ছিল, জমদগ্নিরও তেমনি একটি কামধেনু ছিল। তার নাম কপিলা। কামধেনু জানো তো?

বলে আমি অভিমন্যুর দিকে তাকালুম।

অভিমন্যু বলল : না।

বললুম : কামধেনু শুধু দুধই দিত না, যা কিছু দরকার সবই দিতে পারত। খাবার দাবার থেকে আরম্ভ করে একেবারে সৈন্য সামন্ত পর্যন্ত। যাঁর কামধেনু, তিনি যা চাইবেন তাই তারা দিতে পারত।

অভিমন্যু বলল : ভারি মজার তো!

বললুম : দেবাসুরে যখন সমুদ্র মন্থন করেছিলেন, তখন সমুদ্রের নিচে থেকে উঠেছিল সুরভী নামে একটি কামধেনু। সেই সুরভী-ই হল পৃথিবীর কামধেনুদের মা। আর এই কামধেনু নিয়ে মুনি-ঋষিদের সঙ্গে লড়াই হত রাজাদের। বিশ্বামিত্র যখন রাজা ছিলেন, তখন লড়াই করেছিলেন বশিষ্ঠের সঙ্গে। আর কার্তবীর্যার্জুনও লড়াই করলেন জমদগ্নি মুনির সঙ্গে।

কেন ?

বললুম তো, কামধেনুর জন্যেই লড়াই। জমদগ্নি কামধেনুকে বললেন, হৈহয় দেশের রাজা তাঁর সৈন্য সামন্ত নিয়ে আমার আশ্রমে এসেছেন। সবাই খুব ক্লান্ত ক্ষুধার্ত। তুমি এদের সৎকারের ব্যবস্থা কর।

সৎকার মানে কী মামা ?

বলে অভিমন্যু আমার মুখের দিকে তাকাল।

বুঝতে পারলুম যে একটা অপ্রচলিত পৌরাণিক শব্দ ব্যবহার করে ফেলেছি। বাঙলায় এখন সৎকারের একটা বিশেষ মানে আছে। কিন্তু পুরাকালে সৎকারের অন্য মানে ছিল। তাই তাড়াতাড়ি বললুম : অতিথি সৎকার মানে জান তো! বাড়িতে লোকজন এলে ভালমন্দ খাওয়ানোকে বলে সৎকার।

তারপর ?

তার পরে আর কী, দেখতে দেখতেই কামধেনু নানা রকমের খাবার জিনিস তৈরি করে ফেলল। আর সে সব খেয়ে সবার কী আনন্দ! কিন্তু রাজা খুব ভাবনায় পড়ে গেলেন। একজন বনবাসী মুনি এত সব খাবার জিনিস কোথায় পেলেন! তারপরে যেই শুনলেন যে মুনির একটি কামধেনু আছে, অমনি রাজা বললেন, ঐ কামধেনুটি আমার চাই। কিন্তু জমদগ্নির কাছে এই কপিলা কামধেনু ছিল নিজের মেয়ের মতো। সেই মেয়েকে কী করে তিনি অন্যের হাতে দিয়ে দেন! বললেন, এ আমি পারব না। আর

এই কথা শুনে রাজা বললেন, কী! রাজা হয়ে আমি চাইছি, আর আপনি দেবেন না বলছেন! সৈন্যদের হুকুম দিলেন, কেড়ে নিয়ে চল। কিন্তু কামধেনুকে কেড়ে নিয়ে যায় কার সাধ্য! কামধেনু যেই রাগে গা ঝাড়া দিল, অমনি তার গা থেকে টুপটাপ করে সৈন্য পড়তে লাগল। অসংখ্য সৈন্য তৈরি হয়ে তারাই যুদ্ধ করল রাজার সৈন্যদের সঙ্গে। রাজার সৈন্যরা হেরে গিয়ে পালিয়ে গেল।

অভিমন্যু বলে উঠল: ভারি মজা তো!

বললুম: তার পরে শোন। অত বড় রাজা তো মুখ কালো করে রাজধানীতে ফিরে গেলেন। কিন্তু এই অপমানের কথা ভুলতে পারলেন না। কিছু দিন পরে তাঁর বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে জমদগ্নি মুনির আশ্রম আক্রমণ করলেন। কিন্তু জানো তো, সেকালের ব্রাহ্মণেরাও খুব ভাল যুদ্ধ করতে পারতেন।

মিনতি বললেন: তাই নাকি?

আমি বললুম: কয়েকজন ব্রাহ্মণের নাম বলছি। রামায়ণের রাবণ ছিলেন ব্রাহ্মণ, মহাভারতের দ্রোণাচার্য কৃপাচার্য অশ্বত্থামাও ছিলেন ব্রাহ্মণ, আর ব্রাহ্মণ পরশুরাম তো জমদগ্নিরই ছোট ছেলে। জমদগ্নির কাছেই যুদ্ধ শিখেছিলেন। কিন্তু কার্তবীর্যার্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে জমদগ্নি মারা গেলেন। পরশুরাম তখন বাড়িতে ছিলেন না। ফিরে এসে যখন শুনলেন যে রাজা সসৈন্যে তাঁদের আশ্রমে এসে তাঁর পিতাকে বধ করে গেছে, তখন কুঠার হাতে বেরোলেন দুর্ধর্ষ বীর পরশুরাম। যে অর্জুন তাঁর এক হাজার হাতে রাবণকে বন্দী করে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন, পরশুরাম তাঁর সমস্ত হাত কেটে তাঁকে বধ করলেন। শুধু তাঁকে নয়, সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতকে নির্মূল করবেন বলে একুশবার অভিযান চালিয়ে ছিলেন।

চা খাওয়া তখন আমাদের শেষ হয়ে গিয়েছিল। বিরূপাক্ষ পয়সাও মিটিয়ে দিয়ে ছিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: খুব ভাল করেছিলেন।

অভিমন্যু আমার পাশে চলতে চলতে বলল : জমদগ্নি মুনির আশ্রমটা কোথায় ছিল মামা ?

সকৌতুকে মিনতি বলল : বলুন এইবারে।

হেসে বললুম : নর্মদা নদীর তীরে।

নর্মদা নদী তো দেখতে পাই নি !

বললুম : মনে নেই ! ট্রেনে একটা বড় পুল পেরিয়ে এলুম !

কিন্তু অভিমন্যুর সে কথা মনে পড়ল না দেখে বললুম : জব্বলপুরে গেলে নর্মদা দেখা যেত। নর্মদার জলপ্রপাত আর মার্বল রক্‌স্।

বলে বিরূপাক্ষর দিকে তাকাতেই তিনি একটা ভ্রূকুটি করলেন। আর মিনতি তা লক্ষ্য করে বললেন : এ যাত্রায় আর তা হবে না।

কেন ?

মিনতিই উত্তর দিলেন : শোনেন নি, দরকার হলে ওঁদের ইঞ্জিনও আগে পেছনে চলে, কিন্তু পাসে বেড়াতে হলে তার উপায় নেই। এক দিকেই চলতে হবে।

বললুম : তাহলে আর-এক যাত্রায় দেখা যাবে, কী বলেন !

কিন্তু অভিমন্যু আমাকে সমর্থন করল না, বলল : তাহলে নর্মদা নদী আমরা দেখতে পাব না মামা ?

বিরূপাক্ষ এবারে সকৌতুকে বললেন : নর্মদার অনেক গল্প তো শুনিয়েছেন, এইবারে দেখান নর্মদা।

আমি প্রথমটায় ভাবনায় পড়েছিলুম। তার পরেই কথাটা মনে পড়ে গেল। মাণ্ডুতে বাজবাহাদুরের প্রণয়ী রূপমতী রোজ নর্মদা দর্শন করতেন। বললুম : ঠিক আছে। নর্মদা আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব।

কোথায় ?

বলে মিনতি আমার দিকে তাকালেন।

বললুম : এখন সে কথা কাউকে বলব না।

অভিমন্যু প্রশ্ন করল : আমাকেও বলবে না মামা ?

তোমাকে আমি কানে কানে বলব।

তবে বল।

বলে অভিমন্যু তার মাথাটা উঁচু করবার চেষ্টা করল, আর আমি আমার মুখ নামিয়ে বললুম: কাল মাণ্ডুতে পাহাড়ের ওপর থেকে দেখাব।

অভিমন্যু ভারি খুশী হল। এই খবর পাবার জন্যে যত, তার চেয়ে বেশি খুশী হল তার কানে কানে বলেছি বলে। সহর্ষে বলল: এখন আমিও কাউকে বলব না।

আমরা স্টেশনের দিকেই চলেছিলুম। খুব কাছেই স্টেশন। বাস স্ট্যাণ্ড আর স্টেশন যেন পাশাপাশি। আর বাস-স্ট্যাণ্ডের সামনেই এই সব হোটেল রেস্তোরাঁ। স্টেশনের ঠিক সামনেটা খুব ব্যস্ত সমস্ত নয়। সে দিকেও ছোট দোকান পাট আছে, ট্যাক্সি স্কুটারের স্ট্যাণ্ড আছে, বাস আর টেম্পো যাতায়াত করে। স্কুটার হল অটো রিক্সা, দুজন যাত্রার জন্যে। কিন্তু তিন চাকার টেম্পোয় অনেক যাত্রী বসতে পারে। বাসের মতো যাত্রী ওঠানামা করে। ভাড়া দিতে হয় বাসের মতো। এই টেম্পোগুলো নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে যাতায়াত করে।

এই সব দেখতে দেখতেই আমার একটা কথা মনে এল। মাণ্ডু যাতায়াতের ব্যবস্থাটা আমাদের ভাল করে জেনে নেওয়া হয় নি। যে এক্স্‌কার্সন বাসে আমাদের মাণ্ডু যাবার ব্যবস্থা হল, তা না পেলে আমরা কী করতুম সেটা জেনে নেওয়া উচিত ছিল। সবার ভাগ্যে তো এ রকম সুযোগ জোটে না। তারা একদিনে মাণ্ডু দেখে ফিরে আসতে পারে কি?

রাস্তার উপরেই আমি বোধহয় থেমে পড়েছিলুম। তাই দেখে বিরূপাক্ষ বললেন: দাঁড়ালেন কেন?

বললুম: বাস স্ট্যাণ্ডে একটা কথা জেনে নেওয়া হয় নি।

বিরূপাক্ষও এবারে দাঁড়ালেন, বললেন: কী কথা বলুন তো!

বললুম: যে বাসটা আমরা পেয়েছি তা না পেলে আমরা কী করতুম, তা জেনে নেওয়া উচিত ছিল।

মিনতি বললেন: কেন বলুন তো!

বললুম: দেশে ফেরার পরে বন্ধু বান্ধব জিজ্ঞেস করলে কী উত্তর দেব!

হা-হা করে হেসে উঠলেন বিরূপাক্ষ, বললেন: কষ্ট করে যারা এখানে আসবে, তারা নিজেরাও এ খবরটা নিতে পারবে। চলুন চলুন।

বলে আবার হাঁটতে শুরু করলেন।

আমিও তাঁর সঙ্গে এগোলুম, কিন্তু উত্তরটা আমার মনঃপূত হল না। বড়লোকের কাছে ভ্রমণ কোন সমস্যা নয়। পয়সা থাকলে কোন খবর না জানলেও চলে। স্টেশনের বাহিরে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে বলা যায়, চলো মাণ্ডু। সেই ট্যাক্সির ড্রাইভারই গাইডের কাজ করবে। যা কিছু দর্শনীয় আছে, সব দেখিয়ে দেবে যত্ন করে। আগে থেকে ভাড়া ঠিক না করে গেলে বেশি ভাড়া দিতে হবে। তা না হলে হয়তো ষাট-সত্তর টাকাতেই রফা করা সম্ভব। কিন্তু আমাদের মতো হিসেব করে যাদের চলতে হয়, তাদের জন্যে এ ব্যবস্থা নয়। তারা প্রতিটি পয়সা হিসেব করে খরচ করবে। সময়েরও হিসেব রাখবে। ভ্রমণ একটা বিলাসের ব্যাপার, তা জেনেও বার হবে ঘর থেকে। পথের টানেই বার হবে। তাই ঘর ছাড়বার আগে ভাল করে হিসেব করবে সময়ের, হিসেব করবে খরচের। যত কম সময়ে যত বেশি দেখা যায়, তারই হিসেব করবে অনেক দিন। অনেক পরামর্শ করবে। বই পড়বে। তারপর বেরোবে ঘর থেকে। এঁদের ভাবনা দুর্ভাবনা, আমি জানি, এঁদের আনন্দও আমি অনুভব করি। তাই বিরূপাক্ষের জবাবে আমি খুশী হতে পারলুম না।

বিরূপাক্ষও বোধহয় তা বুঝতে পেরেছিলেন। বললেন: বেশ তো, রেলের এন্‌কোয়ারিতেই না হয় খবর নিয়ে নেব।

তখন আমরা স্টেশনেই পৌঁছে গিয়েছিলুম। স্টেশনে ঢুকেই এন্‌কোয়ারি অফিস। ডান দিকের সিঁড়ি উঠেছে দোতলার উপরে। দোতলায় রিটায়ারিং রুম আর রিফ্রেশমেন্ট রুম। সে দিক আমাদের জন্য নয়। বিরূপাক্ষ এন্‌কোয়ারি অফিসে গিয়ে মাণ্ডুর বাসের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু কোন সদুত্তর পেলেন না। প্রথমে একটু কড়া জবাবই পেয়েছিলেন, এটা রেলের এন্‌কোয়ারি অফিস, বাসের নয়। কিন্তু বিরূপাক্ষ নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন, আমিও পাবলিক নই। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। রেলের লোক রেলের বাহিরের কোন খবর রাখেন না।

মিনতি আমাকে নিরাশ করতে চাইলেন না। বললেন: আমরা ওয়েটিং রুমে যাচ্ছি, আপনি বরং খবরটা নিয়েই আসুন।

বিরূপাক্ষ বললেন: কাল সকালেই নেওয়া যাবে।

মিনতি বললেন: সন্ধ্যা বেলায় ওয়েটিং রুমে বসেই বা করবেন কী! একটু ঘুরেই আসুন না।

কাজেই আমি ছুটি পেয়ে গেলুম। কিন্তু এ খবর সংগ্রহ করা যত সহজ মনে করেছিলুম, তত সহজ কাজ দেখলুম না। বাস স্ট্যাণ্ডেও এন্‌কোয়ারি অফিস আছে। কিন্তু সেখানে খবর পাওয়া আরও দুরূহ ব্যাপার। সকাল বেলায় যে সব বাস ছাড়ে, তা সরাসরি মাণ্ডু যায় না, ধারে কিংবা মৌএ বদলি করতে হয়। দুপুর বেলায় একখানা বাস সোজা মাণ্ডু যায়। কিন্তু সে বাসে গেলে মাণ্ডুতেই রাত্রিবাস করতে হয়। ফিরতে হয় পরের দিনের বাসে। শহরে দুটি বাস স্ট্যাণ্ড আছে। সরকারী ও বেসরকারী। দু জায়গাতেই প্রায় একই রকম ব্যবস্থা।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: কোনও টুরিস্ট বাসের ব্যবস্থা নেই?

সে টুরিস্ট অফিসে খোঁজ করুন।

বলে ভদ্রলোক মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

আমি তবু বেহায়ার মতো বললুম : এখানে টুরিস্ট অফিসটা কোথায় ?

বিরক্ত ভাবে ভদ্রলোক বললেন : জানি না।

যাত্রীদের মধ্যেই একজন আমার উপরে সদয় হয়ে বললেন : এক কাজ করুন।

আগ্রহ সহকারে আমি বললুম : বলুন।

ভদ্রলোক বললেন : জুনা রাজওয়াড়ায় বোধহয় একটা টুরিস্ট অফিস আছে, তা না হলে রেসিডেন্সীতে চলে যাবেন। দিন কয়েক আগে খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখেছিলুম যে প্রতি শনি রবিবারে একখানা টুরিস্ট বাস যাত্রীদের নিয়ে মাণ্ডু যাতায়াত করবে। ভাড়া বোধহয় মাথা পিছু বারো তেরো টাকা। সে বাস কোথা থেকে ছাড়ে, কোথায় টিকিট কাটতে হয়, সে সব খবর আপনি সেখানেই পাবেন।

আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাতেই তিনি বললেন : আজ তো সব বন্ধ হয়ে গেছে, কাল দশটার পরে যাবেন।

বললুম : ধন্যবাদ।

ফেরার পথে আমার দুঃখ হল এই ভেবে যে রাজ্য সরকারগুলি টুরিস্ট ট্রাফিক সম্বন্ধে আজও যথেষ্ট সচেতন হয়ে ওঠেন নি। সত্যিই যদি কোন টুরিস্ট বাসের ব্যবস্থা হয়ে থাকে তো একটা ছোট কাউন্টার রেলের এন্‌কোয়ারি অফিসের পাশেই খোলা যেতে পারত। কিংবা রেলের এন্‌কোয়ারি অফিসের পাশেই একটা পোস্টার লাগানো সম্ভব ছিল। বাস স্ট্যাণ্ডেও এই রকমের পোস্টার থাকলে যাত্রীদের হয়রান হতে হত না। অন্য রাজ্য থেকে যারা বেড়াতে আসছে, তারা তো ইন্দোরের কাগজ পড়বে না। আর প্রতি দিনের কাগজেও থাকবে না এই বিজ্ঞাপন।

মাণ্ডু একটি ঐতিহাসিক দুর্গ। রাজস্থানের চিতোরের মতো

পরিচিত না হলেও মধ্য ভারতের একটি বিখ্যাত দুর্গ ছিল মধ্য যুগে। ধার মাণ্ডু মহেশ্বর—সবই কাছাকাছি। নর্মদার তীরে ওঙ্কারেশ্বর নামে একটি তীর্থস্থানেরও নাম শুনলুম পরে। ভাল পিকনিকের জায়গাও আছে নিকটে—পিপলায়া পালা নামে একটি সরোবর আর পাতালপানি নামে একটি ঝর্ণা। বাঘ গুহাও এখান থেকে দূরে নয়। এ রাজ্যের টুরিস্ট বিভাগ ভাল ব্যবস্থা করলে যাত্রীরা কত আনন্দ করে এই সব জায়গা দেখতে পারে। সরকারের তো এতে ক্ষতি নেই, বরং লাভই আছে। অথচ তাঁদের প্রসন্ন দৃষ্টি এই বিভাগের উপর পড়ছে না। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে আমি স্টেশনে ফিরে এলুম।

হঠাৎ আমার ট্যাক্সি ড্রাইভারদের কথা মনে হল। তারা হয়তো কোন সংবাদ দিতে পারবে। ঠিকই মনে হয়েছিল। একজন ড্রাইভারের কাছেই খবর পেলুম যে প্রতি শনি রবিবারে একখানা মিনি বাস স্টেশনের বাহিরে এসে দাঁড়ায় সকাল আটটার পরে। আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে সেই বাস জুনা রাজওয়াড়ায় চলে যায়। সেখান থেকেও যাত্রী সংগ্রহ করে মাণ্ডু যায়। ফেরে সন্ধ্যা বেলায়। কাল বাস নেই, টুরিস্ট ট্যাক্সি পাওয়া যাবে।

তাকেও আমি ধন্যবাদ দিলুম।

রেল ভ্রমণে কুলি আমাদের বিশ্বস্ত গাইড। আর নতুন শহর দেখার জন্যে যানবাহনের চালক—রিক্সাওয়ালা, টাঙ্গাওয়ালা বা ট্যাক্সির ড্রাইভার। তাদের ওপরে ভরসা রাখলে টুরিস্ট অফিসের দরকার হয় না।

প্রত্যূষে আমাদের যাত্রা শুরু হল।

বাস স্ট্যাণ্ডে এসে আমরা বাস ধরলুম। মিনতি সামনের দিকে জায়গা পেলেন। ছেলেকে পাশে নিয়ে বসলেন। অভিমন্যুর ইচ্ছে ছিল অন্য রকম। আমার পাশে বসবার জন্য করুণ ভাবে তাকাচ্ছিল। কিন্তু আমার জায়গা নেই দেখে সে কথা বলবার সাহস পেল না। শেষ পর্যন্ত সবারই জায়গা হল। নিজে থেকে চেষ্টা করি নি বলে আমার জায়গা হল একজন লাজুক ছেলের পাশে। চোখে চশমা, হাতে বইখাতা নিয়ে সেও শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিল।

হেমন্তের আবহাওয়ায় একটা প্রসন্নতা আছে, আছে প্রত্যূষের বাতাসেও। বাস যখন ছাড়ল, তখন এই কথাই প্রথমে মনে হল। ইট-কাঠের শহর ছাড়িয়ে প্রকৃতিকে মনে হল জাদুকর। বাতাস বুলিয়ে বুঝি ঘুম পাড়িয়ে দেবে। কিন্তু এ ঘুম ক্লান্তির নয়, এ ঘুমে প্রাণ আছে। দেহ মন এক সঙ্গে সজীব হয়ে ওঠে।

পাশের ছেলেটিকে আমি ভাল করে দেখলুম। কলেজের ছেলে, কিন্তু দলের অন্য ছেলে মেয়েদের মতো হুল্লোড়ে নয়। নিতান্ত শান্ত স্বল্পবাক্ ছেলে। দলের কারও সঙ্গে সে কথা কইল না, খানিকক্ষণ বাহিরে চেয়ে থাকবার পরেই তার বইএর পাতায় মনোনিবেশ করল। বইএর নামটা আমি দেখে নিলুম—'ধারা অ্যাণ্ড মাণ্ডু'।

এই মুহূর্তে আমার আর একটি ছাত্রের কথা মনে পড়ল। এর চেয়েও তরুণ, হয়তো বা স্কুলেরই ছাত্র। আমেদাবাদ থেকে আমরা বম্বে আসছিলুম। মামা-মামীর গাড়িতে উঠেছিল সেই ছেলেটি। পরনে সিল্কের প্যাণ্ট আর জানোয়ারের ছবি আঁকা বুশ সার্ট। হাতে

সিগারেটের টিন, আর কণ্ঠে সিনেমার গান। মামা যে খুব অস্বস্তি বোধ করছিলেন তা দেখতে পেয়েছিলুম। তাই সরে গিয়েছিলুম সেখান থেকে। ছেলেটি কাগজ কিনল। খবরের কাগজ কিনে পড়ে জেনে ভাল লেগেছিল। পরে স্বাতির কাছে শুনেছিলুম, সে সিনেমার কাগজ। সারাটা পথ নাকি ছবি দেখেছে আর শিস দিয়েছে। সিগারেটের টিনটাও শেষ করেছে। মামা আমাকে বলেছিলেন, এরাই এ দেশের ভবিষ্যৎ গড়বে।

পাশের ছেলেটিকে আমি আর একবার দেখলুম। পায়জামার উপরে খদ্দরের সার্ট পরেছে। চোখে কালো শেলের চশমা, পুরু কাচ। নিবিষ্ট মনে পড়ে যাচ্ছে ভারতের অতীতের কথা, ধারা ও মাণ্ডুর ইতিহাস। দেশের ভবিষ্যৎ গড়বার ভার কি এই ছেলেটি পাবে না! মামাকে দেখাতে পারলুম না বলে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

ধারাকে এখন আর ধারা বলে না, বলে ধার। মাণ্ডুর বাস এখানে কয়েক মিনিটের জন্য দাঁড়ায়। ড্রাইভার আর কণ্ডাক্টর তখন চা খায়, বিড়ি খায়। যাত্রীরাও অনেকে খেতে নামে— পাপড়ি আর সমোসা, লাড্ডু কিংবা পকৌড়া। মাণ্ডু একটা পরিত্যক্ত দুর্গ, কিন্তু ধারার কথা লোকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে। সেই স্বর্ণযুগ মনে রাখবার মতো কোন স্মৃতিচিহ্ন আজ সেখানে আছে কিনা জানি না।

তা না থাক্, ভারতের ইতিহাস ও সাহিত্য ধারাকে বাঁচিয়ে রাখবে। কবি ঠিকই বলেছিলেন:

অদ্য ধারা নিরাধারা নিরালম্বা সরস্বতী
পণ্ডিতা খণ্ডিতা সর্বে ভোজরাজে দিবং গতে।

ভোজরাজ নেই বলেই তাঁর রাজধানী ধারার আজ এই দুরবস্থা। কিন্তু ইতিহাস আর সাহিত্য ভোজরাজকে কোন দিন ভুলবে না। ইনি কান্যকুব্জের পরাক্রান্ত রাজা ভোজরাজ নন, গুর্জরদেশের শ্রেষ্ঠ রাজা মিহির ভোজও নন। ইনি মালবের পরমার বংশীয় বিদ্যোৎসাহী

বীর রাজা ভোজরাজ। সুলতান মামুদ যখন সোমনাথ আক্রমণ করেন, তখন তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন মন্দির রক্ষায়। আবার শান্তির দিনে সভাপণ্ডিতদের উৎসাহ দিয়েছেন সাহিত্য সৃষ্টিতে। বল্লাল পণ্ডিতের ভোজ প্রবন্ধ, মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধ চিন্তামণি, কীর্তিকৌমুদী ও সুকৃত সংকীর্তনে এই ভোজরাজের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়।

এ দেশের অগণিত অশিক্ষিত মানুষের কাছেও ভোজরাজের নাম অমর হয়ে আছে। ভোজ বিদ্যার সমাদর যত দিন থাকবে, তত দিন কেউ তাঁকে ভুলতে পারবে না। ভোজ বিদ্যার প্রচলন করেছিলেন ভোজরাজা নিজে। এই বিরাট দেশের গ্রামে গ্রামান্তরে, হাটে-ঘাটে, মেলায় উৎসবে, ভানুমতীর খেলা দেখিয়ে বেড়াচ্ছে কত শত লোক। এই ভানুমতী ছিলেন ভোজরাজের কন্যা। ভোজবিদ্যার উৎকর্ষ হয়েছে তাঁরই হাতে।

ভোজরাজ জনগণের রাজা ছিলেন, জনগণের মনে তিনি স্থান পেয়েছেন। ইতিহাসের পাতা থেকে বেরিয়ে এসে জনতার খাতায় ঢুকেছেন অবলীলাক্রমে। ভোজরাজ ভারতের জীবন্ত রাজা। দেবতার বরে তিনি অমর নন, তিনি অমর তাঁর কীর্তির জন্য।

ভোজরাজের পিতার নাম সিন্ধুল বা সিন্ধুরাজ। তিনি মুঞ্জ-বাক্‌পতির অগ্রজ ছিলেন, না অনুজ, এ নিয়ে বিতর্ক আছে। দুই ভ্রাতাই রাজ্যশাসন করেছেন, কিন্তু কে আগে আর কে পরে, আজও তা অজ্ঞাত। ভোজ প্রবন্ধে মুঞ্জ সিন্ধুলের কনিষ্ঠ, কিন্তু নবসাহসাঙ্কচরিতে পদ্মগুপ্ত অন্য কথা বলেছেন। জ্যেষ্ঠ মুঞ্জ-বাক্‌পতির মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ সিন্ধুরাজ রাজ্যলাভ করেন। বল্লাল পণ্ডিত মেরুতুঙ্গ আচার্য মুনিসুন্দরশিষ্য শুভনীল বৎসরাজ বল্লভ রাজ-বল্লভ প্রভৃতি নানা পণ্ডিতে মিলে ভোজ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এ দিকে পদ্মগুপ্ত ছিলেন উভয় ভ্রাতার সভাতেই সম্মানিত রাজকবি। রাজার নাম নিয়েও গণ্ডগোল আছে। কেউ সিন্ধুল, কেউ সিন্ধুরাজ

বলেছেন! কোন্‌টা ঠিক, আর কাকে বিশ্বাস করা যাবে, এ কথা আজও স্থির হয় নি, স্থির হবেও না। কারণ এ নিয়ে ঐতিহাসিকের আর মাথা ব্যথা নেই। প্রাচীন ভারতের অনেক কথাই তাঁরা বিশ্বাস করেন না।

ভোজরাজের শৈশব সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তার মধ্যে একটি গল্প বড় রোমাঞ্চকর। এক দৈবজ্ঞ বলেছিলেন যে ভোজ বড় হয়ে মুঞ্জের রাজ্য গ্রাস করবেন। এই কথা জানা অবধি মুঞ্জের মনে শান্তি ছিল না। শেষ পর্যন্ত তিনি বৎসরাজকে আহ্বান করে নিজ রাজ্যে আনলেন। অন্তরঙ্গ ভাবে পরামর্শ করে স্থির করলেন যে মহামায়ার সামনে ভোজকে বলি দেওয়া হবে। ধারার রাজাকে খুশী করবার জন্য বৎসরাজ নিজে এ ভার গ্রহণ করলেন।

যেমন কথা তেমনই কাজ। বালক ভোজকে বৎসরাজ পাঠাগার থেকে মহামায়ার মন্দিরে ডেকে আনলেন। তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ভোজ একটু সময় চাইলেন। সেই সময়ে দুটি বটের পাতা সংগ্রহ করলেন, আর রক্ত বার করলেন ছুরি দিয়ে নিজের জঙ্ঘা কেটে। তারপর সেই বটের পাতায় রক্ত দিয়ে পত্র লিখলেন। বললেন, মহাভাগ, দয়া করে এই পত্রখানি আপনি রাজাকে দেবেন। তারপরেই বললেন, আমি এবারে প্রস্তুত।

কিন্তু ভোজের এই নির্বিকার আচরণ দেখে সানুজ বৎসরাজ বিস্মিত হলেন। ভোজ ভয় পান নি, বিচলিত হন নি, বরং তাঁর মুখে এক অনির্বচনীয় জ্যোতি ফুটে উঠেছিল। বৎসরাজের অনুজ বললেন, দাদা, একটা কথা তোমাকে বলি। মৃত্যুর পর কিছুই আমাদের সঙ্গে যাবে না, স্ত্রী পুত্র রাজ্য সুখ সবই পড়ে থাকবে, সঙ্গে শুধু ধর্ম যাবে। মৃত্যু যখন পার্থিব সব কিছুই কেড়ে নেবে, তখন ধর্মকে কেন পরিত্যাগ করি! বৎসরাজ ভাবলেন; সত্যিই তো! তাঁর উদ্যত খাঁড়া আর ভোজের গলায় পড়ল খসে। ভোজকে তিনি সমাদরে নিজের গৃহে নিয়ে গেলেন।

এ দিকে মুঞ্জের কাছে তাঁর কর্তব্য আছে। শিল্পীকে দিয়ে তিনি একটি নরমুণ্ড তৈরি করালেন। সেটি রক্তরঞ্জিত করে মুঞ্জের কাছে নিয়ে গেলেন। কিন্তু মুঞ্জ খুশী না হয়ে বেদনায় বিহ্বল হলেন। বললেন, আচ্ছা বৎসরাজ, ভোজ কি কিছু বলে নি, বাধা দেয় নি, প্রাণ ভিক্ষা করে নি তোমার কাছে? বৎসরাজ মাথা নেড়ে বললেন, না। শুধু একটি পত্র লিখেছেন আপনাকে।

পত্র! কোথায় সেই পত্র!

প্রদীপের আলোয় মুঞ্জ সেই পত্র পাঠ করলেন :—

মান্ধাতেতি স মহীপতিঃ কৃতযুগেঽলঙ্কারভূতো গতঃ
সেতুর্যেন মহোদধৌ বিরচিতঃ ক্বাসৌ দশাস্যান্তকঃ।
অন্যে চাপি যুধিষ্ঠির প্রভৃতয়ো যাবদ্ভবান্ ভূপতে।
নৈকেনাপি সমং গতা বসুমতী মন্যে ত্বয়া যাস্যতি॥

সত্য কথা। ভোজ খুব সত্য কথা বলেছে। মুঞ্জ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। মূর্ছাভঙ্গের পরেও তাঁর শোকের শেষ নেই। ছি ছি, এ আমি কী করলাম! নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করলাম পার্থিব স্বার্থের মোহে! ধিক্ এ জীবনে। মুঞ্জ প্রাণ ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হলেন। প্রকাশ্য রাজসভায় তিনি জীবন বিসর্জন করবেন।

হঠাৎ সেই সভায় এক তান্ত্রিক এসে উপস্থিত। বললেন, মহারাজ, তুমি আর বিলাপ কোরো না, আমি তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বাঁচিয়ে আনছি। শ্মশানে সাধন ভজন করে তান্ত্রিক ভোজকে রাজসভায় নিয়ে এলেন। মুঞ্জ বললেন, আর দেরি নয়, আজই ভোজ সিংহাসনে বসবে। ভোজকে রাজ্যভার দিয়ে মুঞ্জ বানপ্রস্থে গেলেন।

এই হল ভোজ প্রবন্ধের গল্প।

বিক্রমাদিত্যের পর ভোজরাজ। বিক্রমাদিত্যের যেমন নবরত্নের সভা, ভোজরাজের সভাও তেমনই পণ্ডিতে অলঙ্কৃত। কালিদাস বররুচি বরাহমিহিরের মতো রত্ন না থাক্, কাব্য দর্শন জ্যোতিষ অলঙ্কার ও ধর্মশাস্ত্রের আলোচনায় রাজসভা মুখর থাকত। এই সব

পণ্ডিত নানা গ্রন্থ রচনা করেছেন, ভোজরাজের নামেও নানা গ্রন্থ প্রচলিত হয়েছে। শাস্ত্রকাররা তাঁদের গ্রন্থে ভোজরাজের শ্লোক উদ্ধৃত করে তাঁর মতেরও প্রচার করেছেন। ১০১০ থেকে ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দ ভোজরাজের রাজত্বকাল। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এ একটা বিশিষ্ট যুগ। এর তুলনা শুধু বিক্রমাদিত্যের যুগের সঙ্গেই হয়।

উদেপুর প্রশস্তিতে একটি নূতন কথা আছে। ভোজরাজ নাকি কেদার রামেশ্বর ও সোমনাথ প্রভৃতি তীর্থে মন্দির নির্মাণ করেন। কর্ণাটলাট গুর্জর ও তুরস্কদের পরাজিত করেন। কিন্তু নিজে পরাজিত হন বিক্রমার্কের পিতা সোমেশ্বরের কাছে। ভোজকন্যা ভানুমতীর বিবাহ হয় বিক্রমার্কের সঙ্গে। মহাকবি বিল্‌হণ তাঁর ঐতিহাসিক কাব্য বিক্রমাঙ্কদেব চরিতে লিখেছেন এই কথা।

ধারা নগরী ধ্বংস হয় চেদিরাজ কর্ণ ও গুর্জরপতি চৌলুক্যভীমের সমবেত আক্রমণে। অদ্য ধারা নিরাধারা।

এই ধারায় যখন আমাদের বাস এসে দাঁড়াল, তখন ভোজরাজের কথা কারও মনে পড়ল না। ধারা নগরীর কথাও নয়। ধার এখন মাণ্ডুর প্রাচীন দুর্গ দেখতে যাবার পথে একটা বাসের স্টেশন। স্থানীয় লোক কিছু ওঠে নামে। যাত্রীরা যারা কিছু না খেয়ে বেরিয়েছে তারা খাবারের অন্বেষণ করে। বিলম্বের জন্য কেউ কেউ বিরক্ত হয়, তাড়া দেয় বাসের ড্রাইভারকে। তারপর আবার চলা।

আমি আশা করেছিলুম যে এত সব কলেজের ছেলে মেয়ের মধ্যে কেউ না কেউ ধারার প্রসঙ্গ উত্থাপন করবে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলুম যে তারা চা খাবার জন্যই শুধু হুড়োহুড়ি করল। দু-চারজন একটু আড়ালে গিয়ে সিগারেট টেনে এল। আমার পাশের ছেলেটিকে শুধু দেখতে পাই নি। তাকে চা খেতেও দেখি নি, সিগারেট খেতেও না।

অভিমন্যু আমাকে বলল: এই বাসটা ভয়ানক গোঁ গোঁ করে।

এ কথার উত্তর আমাকে দিতে হয় নি। বাসের গোঙানি শুনেই অভিমন্যু তার মায়ের কাছে পালিয়ে গিয়েছিল।

আমার পাশের ছেলেটির মধ্যে খানিকটা অস্থিরতা দেখছিলুম। ইন্দোর থেকে ধার পর্যন্ত সে স্থাণুর মতো স্থির হয়ে এসেছে। এখন এই অস্থিরতা দেখে আমি কিছু বিস্মিত হলুম। কয়েকবার আমি তার দিকে তাকালুম।

আমার এই কৌতূহলে সে বুঝি সাহস পেল। ধীরে ধীরে ইংরেজীতে বলল: এখানে একটা জনশ্রুতি শুনলাম।

জনশ্রুতি!

হ্যাঁ, মহাকবি কালিদাস নাকি এইখানে জন্মেছিলেন। মাইল দেড়েক দূরে তাঁর সাধনার কালীস্থান। এ বিষয়ে আপনি কিছু শুনেছেন?

পরম কৌতূহলে ছেলেটি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম: কালিদাসের জন্মস্থান নিয়ে নানা প্রবাদ আছে। এও একটা প্রবাদ। অত বড় কবিকে নিজের স্বজাতি বলে সবাই ভাবতে চায়।

কিন্তু তার পিছনে একটা যুক্তি তো থাকবে!

এখানেও আছে বইকি। ধারা নগরে যে ভোজরাজ ছিলেন, তিনিও ছিলেন বিক্রমাদিত্য। সে যুগে বড় বড় রাজারা সবাই এই উপাধি নিতেন। আর তাঁদের সভায় থাকত নবরত্ন। ভোজরাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সভা ছিল, কালিদাস ছিলেন তাঁর সভাসদ। ভোজরাজ ও কালিদাস নিয়ে অনেক গল্প আছে, কিন্তু এ কোন্ কালিদাস তার প্রমাণ নেই। অনেকে এও বলেন যে উজ্জয়িনীতে যখন বিক্রমাদিত্য, ধারায় তখন ভোজরাজ। কালিদাস ছিলেন ভোজরাজের সভায়, রাজার সঙ্গে বিবাদের ফলে ধারা ছেড়ে উজ্জয়িনীতে যান।

ছেলেটি খুশী হল আমার উত্তর শুনে। বই মুড়ে রেখে গল্প শুরু

করল। বলল: এরা সবাই পিকনিক করতে যাচ্ছে। আর কোন শখ এদের নেই।

বললুম: কিছু দেখতে পেলেই কৌতূহল জাগবে।

এ কথার উত্তর না দিয়ে ছেলেটি বলল: আপনি কি—

বললুম: বম্বে থেকে বাঙলায় ফিরছি।

ঠিক এই মুহূর্তেই আমার স্বাতির কথা মনে পড়ে গেল। আর মনে পড়ল জো রায়ের কথাও। জো বোধ হয় ছুটি নিয়ে এখন সারাক্ষণ স্বাতির সঙ্গে আছেন। ভদ্রলোক যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেছেন।

জো রায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল দ্বারকা থেকে ওখা যাবার পথে। স্বাতিকে যে তাঁর ভাল লেগেছিল, তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তাঁর ব্যবহারে। মামীও খুশী হয়েছিলেন, কিন্তু স্বাতি তাঁকে প্রশ্রয় দেয় নি। আমাদের সঙ্গেই জো রায় হয়তো সোমনাথে আসতেন, সোমনাথ থেকে বম্বে। কিন্তু স্বাতি তাঁকে হতাশ করেছিল। কঠিন মন্তব্য করেছিল তাঁর কর্তব্যে অবহেলার জন্য। জো রায়কে গাড়ি থেকে নেমে যেতে হয়েছিল।

আমরা যে সোমনাথ থেকে বম্বে যাব, সে কথাও তাঁকে বলা হয় নি। মালাবার হিলে দেখা হয়ে গিয়েছিল আকস্মিক ভাবে। তারপরেও স্বাতি পালিয়ে গিয়েছিল। পুনা থেকে গোয়ায়। কিন্তু মামীর আগ্রহে শেষ পর্যন্ত তাকে ধরা দিতে হয়েছে। জো রায় এখন তাঁদের বম্বে দেখাবার ভার নিয়েছেন।

এবারে তাঁরা কলকাতায় ফিরবেন না, ফিরবেন দিল্লীতে। হাতে সময় আছে, পকেটে পয়সাও আছে। বাজার করা হয় নি বলে মামীর খানিকটা আপশোস ছিল। পরিচিত বাজারে নাকি জিনিস কিনে সুখ নেই। একই জিনিস, একই ধরনের জিনিস। বিদেশের বাজার তাই তাঁর ভাল লাগে। বিদেশে কেনা জিনিস দেখলেই চেনা যায়। ভ্রমণের স্মৃতিও থাকে চোখের সামনে।

জো রায়কে সঙ্গে নিয়ে মামী বাজার করবেন। স্বাতির বিয়ের জন্যেও কিছু হয়তো কিনবেন। রাণার সঙ্গে সম্বন্ধটা পাকা হল না, জো রায়ের সঙ্গে হতে পারে। সে অন্য জাতের ছেলে। বাপের ভয়ে বিয়ে করতে সে পিছিয়ে যাবে না।

কিন্তু স্বাতি! স্বাতির কথা মামী কেন ভাবছেন না!

৮

একটা ঝাঁকানি খেয়ে আমি সোজা হয়ে বসলুম। কোন দুর্ঘটনা নয়, সামনে একটা ছাগল পথ ছেড়ে দেয় নি। তাকে বাঁচাতে গিয়েই একটু ঝাঁকানি লেগেছে। আমার মনে হল যে আমি ঘুম ভেঙে জেগে উঠলুম। পাশের ছেলেটির দিকে তাকাতেই সে মুচকি হাসল। কিন্তু কিছু বলল না। স্বল্পভাষী ছেলে বলেই বোধহয় চুপ করে রইল।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আমিই কৈফিয়ৎ দিলুম: রাত জেগে জেগে ঘুমের ঋণ পাহাড় প্রমাণ হয়েছে। সারারাত ঘুমিয়েও তা শোধ হচ্ছে না।

আমি যে ঘুমিয়ে পড়ি নি, তা আমার মনে পড়ে গেছে। একটুখানি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। আর সেই জন্যেই বোধহয় মিথ্যা কথা মুখে এসে গিয়েছিল। কিন্তু তার দরকার ছিল না। তবু কেন মিথ্যা বললুম, সেই কথা ভেবে লজ্জা হল।

ছেলেটি বলল: এখনও তো অনেকটা পথ আছে, আপনি আর একটু ঘুমিয়ে নিন।

কিন্তু ঘুমোবার প্রয়োজন আমার ছিল না। ভয় ছিল আবার অন্যমনস্ক হবার। তাই তার সঙ্গেই গল্প শুরু করে দিলুম। বললুম: চোখ মেলে পথ চলতেই আমি ভালবাসি, লজ্জা পাই ঘুমিয়ে পড়লে।

আমার এ কথাটি তার ভাল লাগল। বলল: আপনিও তাই বলছেন!

অন্য কথা কেন বলব! সে তো সত্যি হবে না!

অত্যন্ত মৃদু স্বরে ছেলেটি বলল: ওরা তা স্বীকার করে না।

বসে গাড়ির ছেলে মেয়েদের কথা বুঝিয়ে দিয়ে বলল : ওরা নিজেদের সমাজ-সংস্কার সঙ্গে নিয়ে চলে। সেই গল্প, সেই জল্পনা কল্পনা। মাণ্ডু পৌঁছে ওদের জাগিয়ে দিতে হবে। পিকনিক পিপলায়া পালায় হল, না পাতালপানিতে হল, না ওঙ্কারজীর পাহাড়ে হল, তাতে কিছুই যায় আসে না। আনন্দের পরিমাণ তাতে তাদের কম বেশি হবে না।

এ কথা হয় তো সবার ক্ষেত্রেই সত্য। এক সঙ্গে সময় কাটানো আর সবাই মিলে খাবার নামই চড়ুই ভাতি। এর মধ্যে আর কোন অর্থের অন্বেষণ করেই বা লাভ কী! কিন্তু আমি সোজা হয়ে বসলুম অন্য কারণে। এই ছেলেটি এমন কয়েকটি জায়গার নাম করেছে যে আমি তা জানি না। এর আগে এ সব নাম আমি শুনি নি।

আমার কৌতূহল লক্ষ্য করে ছেলেটি খুশী হল, আর আমি খুশী হলুম তার পরিচয় পেয়ে। নাম তার শুক্লা, ইন্দোরের এক কলেজের ছাত্র, বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছে। দু-একজন ছেলে মেয়ে যে শুক্লার দিকে ফিরে ফিরে তাকিয়েছে, তাও আমি লক্ষ্য করেছিলুম। কেউ কেউ হেসেওছে। কিন্তু শুক্লা তাদের দেখেও দেখে নি।

আমাকে জিজ্ঞাসা করল : এ দিকে বুঝি আপনি প্রথম এলেন?

বললুম : হ্যাঁ।

এদিকের পথঘাট তাহলে সবই আপনার অচেনা!

বললুম : সবই নতুন।

শুক্লা বলল : মাণ্ডু যাবার দুটো পথ আছে। একটা ধার হয়ে, আর একটা মৌ হয়ে। আপনারা যদি বাসে না গিয়ে ট্যাক্সিতে যেতেন, তাহলে আপনাদের মৌ হয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু মৌ শহরটিও দেখতে পেতেন না।

কেন?

পথ সংক্ষেপ করবার জন্যে শহরের মধ্য দিয়ে না গিয়ে আপনাদের ক্যান্টনমেন্ট এলাকার ভিতর দিয়ে নিয়ে যেত। জানেন বোধহয় যে মৌ-এ আমাদের সেনাবাহিনীর একটা বড় শিক্ষা কেন্দ্র আছে।

আমি জানতাম না এ কথা। তাই বললুম : তা হবে।

শুক্লা বলল : এই পথটা কিন্তু খুব সুন্দর। বম্বে-আগ্রা রোড। এই রাস্তা ধরে আপনি দিল্লী থেকে বম্বে চলে যেতে পারবেন। ইন্দোরের প্রায় মাঝ পথে। মধ্যপ্রদেশের সবচেয়ে বড় শহর হল ইন্দোর, কিন্তু রাজধানী এখানে নয়, রাজধানী ভোপালে। ইন্দোরে রাজধানী স্থাপন করলে একে আপনি স্বচ্ছন্দে মধ্য নগর বলতে পারতেন।

বলে সে হাসল। ভারি সরল হাসি। ভারি ভাল লাগল এই হাসি দেখে। বললুম : তবে ইন্দোরকে রাজধানী করল না কেন?

শুক্লা বলল : বোধহয় রাজনৈতিক কারণে। ভোপাল ছিল নবাবের শহর। পাহাড়ী শহর। ইন্দোরও সমতল ভূমিতে নয়, মালভূমিতে অবস্থিত বলে একে সমতলের শহর বলে মনে হয়। কিন্তু ভোপালে শুনেছি পাহাড় আছে, লেক আছে। উচ্চতায় এক রকম হলেও ভোপালকে পাহাড়ী শহর বলে।

তারপরেই বলল : আপনারা তো ঐ পথেই কলকাতায় ফিরবেন। দেখে যাবেন শহরটা। ভোপালকে মধ্যপ্রদেশের রাজধানী করবার আর কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা, তা বুঝতে পারবেন।

আমাদের আলোচনা থেকে আমরা দূরে চলে যাচ্ছিলুম বলে আমি বললুম : আমরা মৌ হয়ে মাণ্ডু যাচ্ছি না কেন?

শুক্লা বলল : ঠিক বলতে পারি না। বাস বোধহয় ছাউনির মধ্য দিয়ে যেতে দেয় না। মৌ শহরের ভিতর দিয়ে যায়। তাতে

পথের খুব বেশি সংক্ষেপ হয় না। তবে মনে হচ্ছে আমরা ঐ পথেই ফিরব। সেই রকমই শুনেছিলাম। এক পথে যাওয়া, আর এক পথে ফেরা।

বললুম : তাহলে তো ভালই হবে। দুটো পথই আমাদের দেখা হবে।

শুক্লা বলল : ভাববেন না যে দুটো একেবারে আলাদা পথ। মাণ্ডু পৌঁছবার অনেক আগেই এই দুটো পথ এক জায়গায় মিলে যাবে।

বলে সে তার বইখানা খুলে পিছনের একখানা মানচিত্র বার করে বলল : এইটে দেখলে কিছুটা অনুমান করতে পারবেন। বাস স্ট্যাণ্ড থেকে বেরিয়ে আমরা উত্তরে গান্ধী রোড ধরেছি। শহরের এইটেই হল প্রধান রাস্তা—শহরের পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। আমরা পশ্চিমে বেঁকে জুনা রাজওয়াড়া কাচ মন্দির দেখতে পারতাম। কিন্তু তা না দেখে বড় গণপতির মন্দিরের সামনে দিয়ে শহর ছেড়ে চলে এসেছি। সোজা পশ্চিমমুখো এসেছি ধার পর্যন্ত, তারপরে দক্ষিণের দিকে চলেছি। একটু পরেই বোধহয় অন্য পথটা পাওয়া যাবে। কোন শহর বা গ্রাম নেই। হঠাৎ দেখবেন দক্ষিণ থেকে একটা পথ এসে এই পথের সঙ্গে মিলে গেল।

আমি বললুম : মাণ্ডু যাবার জন্যে দুটো পথ তৈরি হল কেন ?

শুক্লা হেসে বলল : দুটো পথ তৈরি হয় নি। মাণ্ডুর পথ একটাই বলতে পারেন।

আমি বললুম : সে কি, পথ তো দুটোই দেখতে পাচ্ছি।

শুক্লা বলল : ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। যারা আগ্রা-বম্বে রোড ধরে বম্বে যাচ্ছে, তারা গুজরি নামের একটা ছোট জায়গায় পৌঁছে উত্তর দিকের পথ ধরবে। ঐ তো, দেখতে পাচ্ছেন না, ঐ পথটাই আসছে মানপুর-গুজরি থেকে। এইবারে এই দুটো পথ মিলে মাণ্ডুর দিকে যাবে।

সত্যিই আমি আর একটি পথ দেখলুম দক্ষিণ থেকে এসে আমাদের পথের সঙ্গে মিলে গেল।

কোন গ্রাম নেই, শহর নেই। অথচ দুটো পথ দু দিক থেকে এসে মাণ্ডুর দিকে অগ্রসর হল।

এই মানচিত্রে আমি আরও দু-তিনটি নাম দেখলুম। মহেশ্বর ওঙ্কারজী ও বাঘ। মহেশ্বরের অবস্থানটা অনুমান করে নিতে পারলুম। বম্বে যাবার পথে মাণ্ডুর দিকে না ফিরে সোজা এগিয়ে যেতে হবে খানিকটা পথ, তারপরে দক্ষিণে একটুখানি এগোলেই নর্মদা নদীর তীরে মহেশ্বর—ইন্দোর রাজ্যের পুরনো রাজধানী, আর পুরাকালের মাহিষ্মতী নগর।

ওঙ্কারজীও নর্মদার তীরে। কিন্তু সে অন্য দিকে। খাণ্ডোয়া থেকে রেলগাড়িতে ইন্দোর আসার পথে লক্ষ্য করি নি। ওঙ্কারেশ্বর রোড নামে একটি স্টেশন আছে। সেখান থেকে পূর্ব মুখে খানিকটা গেলেই নর্মদার তীরে এই তীর্থস্থান।

বাঘ গুহার নামও আমি শুনেছিলুম। কিন্তু সে যে এই অঞ্চলে তা জানতুম না। ধার থেকেই যেতে হয়। মানচিত্র দেখে দূরত্বের অনুমান করা যাচ্ছে না।

আমার মনে পড়ল, শুক্লা পিপলায়া পালা ও পাতালপানি নামে দুটি পিকনিকের জায়গার নাম করেছিল। পরে ভুলে যাব বলে এই দুটি জায়গার কথা তাকে জিজ্ঞাসা করলুম।

শুক্লা হেসে বলল: আপনি বেশ মনে রেখেছেন দেখছি। কিন্তু আপনাদের কাছে সে সব এমন কোন দর্শনীয় স্থান নয়।

তবু শুনি।

বলে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

শুক্লা বলল: আগ্রা-বম্বে রোডের ধারেই হল পিপলায়া পালা। ইন্দোর শহরের খুব কাছেই একটি পুকুর। পরিবেশটি সুন্দর বলেই বহু লোকে পিকনিক করতে যায়। পুকুরের ঘাটে

ছোট মন্দির আছে, আর বড় বড় গাছপালা। আপনাদের মতো দূর দেশের যাত্রীদের এ সব দেখে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। যদি এখানে কয়েক দিন থাকতে আসতেন, তাহলে এক দিন দেখে যেতে বলতাম।

আর পাতালপানি?

শুক্লা বেশ লজ্জিত ভাবে বলল: আমি দেখি নি। খাণ্ডোয়ার দিকে মৌ-এর পরের স্টেশন হল পাতালপানি। কাছেই নাকি একটি জলপ্রপাত আছে, মানে ঝর্ণা। সে কোন্ নদীর, তা আমি আপনাকে বলতে পারব না।

আমি ভেবেছিলুম যে এইবারে ওঙ্কারজীর কথা জানতে চাইব। কিন্তু তার আগেই দৃশ্যের পরিবর্তন আমার চোখে পড়ল। অদূর দিগন্তে দুর্গম বিন্ধ্য পর্বতের রেখা স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে এক আধটা ভাঙা ঘর বাড়ি চোখে পড়ছে। পুরাকালেরই চিহ্ন। বয়সের ভারেই ভেঙে পড়েছে। যা ভেঙে পড়ে নি, তাও পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে।

শুক্লা হঠাৎ একটা দুঃখ প্রকাশ করল, বলল: এমন তাড়াহুড়ো করে আমরা এলাম যে ধারের মতো পুরনো ঐতিহাসিক শহরের কিছুই আমরা দেখতে পেলাম না।

আশ্চর্য হয়ে আমি বললুম: আজও সেখানে কিছু দেখবার আছে না কি?

আছে বৈকি। অনেক কিছুই আছে।

বলে শুক্লা কিছু মনে করবার চেষ্টা করল।

আমি কোন কথা না বলে তাকে ভাববার অবকাশ দিলুম।

শুক্লা হঠাৎ প্রসন্ন কণ্ঠে বলল: কিছু দেখতে না পেলেও একটা সুন্দর প্রবচন শুনে এলাম।

শুনি।

বলে আমি তার দিকে তাকালুম।

শুক্লা বলল : মূল্যবান না হলেও আপনার হয়তো ভাল লাগবে।—

ধাঁহা পুআর তাঁহা ধার
ঔর ধার তাঁহা পুআর।
ধার বিনা পুআর নেহি,
ঔর নেহি পুআর বিনা ধার।

তারপরেই আমাকে বুঝিয়ে বলল যে পুআর শব্দটি এসেছে পরমার থেকে। পরমার রাজাদের গৌরবের রাজধানী ছিল ধার।

শুক্লা বোধহয় আমার মুখ দেখে বুঝতে পারল যে এই প্রসঙ্গটি আমার ভাল লেগেছে। তাই বলল : আমি ইতিহাসের ছাত্র নই, জানি না কিছুই। কিন্তু ইতিহাস আমার ভাল লাগে বলে জানবার চেষ্টা করি।

হাতের বইটা দেখিয়ে বলল : এই বই থেকেই অনেক কিছু জেনে ফেলেছি।

বললুম : ধার সম্বন্ধে আমার কিছু জানা নেই। তবে শুনেছিলুম যে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মারাঠা পেশোয়া বাজীরাও মালব অধিকার করে অনন্তরাও পুআরকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি ধার থেকে রাজ্য শাসন করতেন।

শুক্লা এইবার আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। বোধহয় বোঝবার চেষ্টা করল যে আমি তার কথা শোনবার জন্য কতটা আগ্রহী। তারপরে বলল : ইন্দোর থেকে চল্লিশ মাইল দূরে, এই ধার শহর ইন্দোরের চেয়ে অনেক পুরনো। মাণ্ডুর চেয়েও পুরনো। মাণ্ডু পরিত্যক্ত হয়েছে, কিন্তু ধার এখনও ছোটখাট একটি শহর। যাত্রীদের থাকবার জন্যে হোটেল রেস্ট হাউস এমন কি ধর্মশালাও আছে। আপনি যা বললেন, তাই ঠিক বলে ধারের গৌরব এখনও নষ্ট হয় নি।

একটু থেমে বলল : এ কত দিনের পুরনো শহর, আমি তা

জানি না। এই বইটাতে লিখেছে যে পরমার বংশের রাজা বীরসেন দশম শতাব্দীর গোড়ার দিকে যুদ্ধ করে এই শহরটি জয় করে নিজের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। ইতিহাস বিখ্যাত রাজা ভোজ তাঁর আগে ছিলেন না পরে, তা আমি আপনাকে বলতে পারব না। তবে এটুকু জানি যে উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের মতো ধারার ভোজরাজও এ দেশে এখনও সমাদৃত।

বললুম: শুধু ভোজরাজ নয়, তাঁর কন্যা ভানুমতীও অমর হয়ে আছেন।

খুশী হয়ে শুক্লা বলল: ধারে কয়েক ঘণ্টা কাটাবার জন্যে আমার খুব ইচ্ছা হয়েছিল। এঁদের সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যেত।

আমি তাকে খুশী করবার জন্যে বললুম: দূর তো বেশি নয়, কোন ছুটির দিনে এসে দেখে যেও।

শুক্লা বলল: তাই করব।

তারপরেই বলল: অনেক কিছু দেখবার জায়গাও আছে। ভোজশালা লাট মসজিদ কালীর মন্দির দুর্গ হ্রদ আরও অনেক কিছু। শহরের আশেপাশেও নাকি অনেক ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থান আছে। আর সব চেয়ে আশ্চর্য হল এই যে শুধু হিন্দু কীর্তি নয়, পাঠান ও মোগলদের কীর্তিও আছে। কিন্তু সে সব যে পরবর্তী কালের তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমরা তখন পাহড়ের প্রায় পাদদেশে পৌঁছে গেছি। মাণ্ডুর দুর্গ এই পাহাড়ের উপরে। মোটরের পথ এঁকেবেঁকে এই পাহাড়ের উপরে উঠেছে। শ্যামল গাছপালায় পরম রমণীয় দেখাচ্ছে এই পাহাড়টি।

শুক্লা বলল: এই বইএ একটা নতুন কথা পড়লাম জানেন? মাণ্ডুতে নাকি একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। সেটি ১২৬১ খ্রীষ্টাব্দে লেখা জয়বর্মদেবের তাম্রশাসন।

বললুম: ইতিহাসে এ নাম আমি পড়ি নি।

শুক্লা বলল : এই তাম্রশাসনে মাণ্ডুর দুর্গকে পরমার রাজাদের শেষ দুর্গ বলা হয়েছে। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে মাণ্ডু হিন্দুদেরই দুর্গ, হিন্দু রাজারাই এই দুর্গ নির্মাণ করেন। তখন তার নাম ছিল মাণ্ডব গড়। সেখানে যে সব হিন্দু নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার কাল হল দশম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী।

শুক্লা হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করে বসল : আপনি এর ইতিহাস জানেন না ?

জানি না, এ কথা বলতে পারলুম না। বললুম : সামান্যই জানি।

শুক্লা আমার কাছে আরও কিছু শোনবার জন্য তাকিয়ে আছে দেখে বললুম : ছেলেবেলায় ইতিহাসে পড়েছিলুম যে এই অঞ্চলে ভোজ নামে দুজন রাজা ছিলেন।

পরম বিস্ময়ে শুক্লা আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : একজন প্রতীহার রাজা ভোজ, আর একজন ভোজ পরমার রাজা। দুজনেই কিন্তু মালবে রাজত্ব করেছেন।

তৎপর ভাবে শুক্লা বলে উঠল : সত্যি নাকি !

বললুম : আমি স্কুলে পড়া ইতিহাসের কথা বলছি। সপ্তম শতাব্দীর আগেই গুর্জর-প্রতীহাররা মালব ও রাজপুতানায় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। এঁদের মধ্যে প্রধান হলেন বৎসরাজ ও নাগভট। আর সব চেয়ে পরাক্রান্ত ছিলেন ভোজরাজ। তাঁর কাল হল নবম শতাব্দী। তাঁর পুত্র মহেন্দ্রপালের আমলে এঁদের রাজত্ব বাঙলা থেকে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। কান্যকুব্জে তাঁরা তাঁদের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। তারপর থেকেই এই বংশের পতন শুরু হয়। এবং বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্লরা প্রবল হয়ে উঠতেই প্রতীহার সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। নবম শতাব্দীতেই মালবে প্রতিষ্ঠা হয় পরমার বংশের।

শুক্লা এতক্ষণ নিঃশব্দে শুনছিল। এইবারে বলল : আপনি আমাকে ভারি মুস্কিলে ফেললেন।

বললুম : কেন বল তো ?

শুক্লা বলল : একজন ভোজ রাজকেই আমি সামলাতে পারছিলাম না, আপনি আবার আর একজনকে আমদানি করলেন।

বললুম : এখনও তো আমদানি করি নি, এইবারে করব। পরমার রাজারা আবার ধারাতেই তাঁদের রাজধানী স্থাপন করলেন। তুমি বলেছিলে বীরসেন এই ধারা অধিকার করেন দশম শতাব্দীর গোড়ার দিকে। রাজা ভোজ তাহলে এই বংশেরই পরবর্তী রাজা। কেননা তিনি একাদশ শতাব্দীতে এই ধারায় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন বলে পড়েছি। ইনিই এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। এঁরই সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। তিনি যে এ দেশের আদর্শ রাজা ছিলেন, সে প্রবাদও আছে। তিনি নিজে সুলেখক ছিলেন এবং তাঁর রাজসভায় বিদ্বানদের খুবই সমাদর করতেন। তিনি সরস্বতীর এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেই মন্দিরের প্রাঙ্গণে এক বিশাল বিদ্যায়তন স্থাপন করেন। সেখানে কাব্য জ্যোতিষ স্থাপত্য প্রভৃতি নানা বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

শুক্লা আশ্চর্য হয়ে বলল : তারপর ?

বললুম : জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর গৌরব রক্ষা করতে পারেন নি।

কেন ?

বললুম : প্রতীহার সাম্রাজ্যের পতনে এই দেশটা অনেক ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। মালবে যেমন পরমার বংশের অভ্যুদয় হয়েছিল, মধ্যভারতে তেমনি চন্দেল্ল ও কলচুরি বংশ। চন্দেল্লরা বুন্দেলখণ্ডে ও কলচুরিরা জব্বলপুরের নিকটে রাজ্য স্থাপন করেন। গুজরাটে প্রবল হয়ে ওঠে চৌলুক্য বংশ, তাদের রাজধানী হয় অনহিলবাড়ায়। আর আজমেরের চৌহান বংশের পৃথ্বিরাজের নাম তো জানোই। গজ্‌নির সুলতান মামুদ তখন বারে বারে ভারত

আক্রমণ করছিল, কিন্তু ভারতে মুসলমান রাজত্ব তখনও কায়েম হয় নি।

আমাদের বাস তখন পাহাড়ের উপর উঠতে শুরু করেছে। শুক্লা তাই ভোজরাজের গল্পের শেষটুকু শোনবার জন্যেই আগ্রহ প্রকাশ করল।

বললুম: মালবের ভোজরাজকে আক্রমণ করলেন কলচুরিরাজ কর্ণদেব। আর তাঁকে সাহায্য করতে এসেছিলেন গুজরাটের চৌলুক্যরাজ। ভোজরাজ এই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন, আর এতেই এই বংশের গৌরব নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মালব এর পরেও অনেক দিন স্বাধীন ছিল।

তার পরের ইতিহাসও আমার মনে ছিল। কর্ণদেবকে পরাজিত করেছিলেন চন্দেল্লরাজ কীর্তিবর্মন। আর এঁরা সবাই পরাজিত হয়েছিলেন কুতুবউদ্দিনের কাছে। কাশ্মীর গুজরাট মালব ও বাঙলা অধিকার করতে মুসলমানদের আরও অনেক সময় লেগেছিল।

৯

আমাদের বাস তখন গোঁ-গোঁ করে পাহাড়ের উপরে উঠছে। এই পাহাড় প্রায় দু হাজার ফুট উঁচু। এই অঞ্চলটাই এই রকম। মৌ ইন্দোরও সমতল ভূমিতে নয়। এদের উচ্চতাও প্রায় এই রকমই। তাই আবহাওয়া খুব ভাল। বিহারের রাঁচি বা হাজারিবাগের মতো।

আমি হঠাৎ অভিমন্যুকে দেখতে পেলুম। সে পিছন ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বাসের এই শব্দ শুনে যে তার ভয় করে, আমার সে কথা মনে পড়ে গেল। চোখের ইসারায় আমি তাকে সাহস দিলুম।

এ পাহাড়ের পথ যে পাহাড়ী শহরের মতো নয়, তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না। ঘুরপাক খেয়ে বাস উঠছে না, এক সঙ্গে অনেকটা পথ এগিয়ে যাচ্ছে।

আমার হঠাৎ চিতোর গড়ের কথা মনে পড়ল। চিতোর গড়ও পাহাড়ের উপরে। সমতল ভূমির উপরে একটি টিলার মতো পাহাড়। সে পাহাড়ের উপরে উঠবার পথও আছে। এই সব পথ আগেও ছিল, না এখন তৈরি হয়েছে জানি না। আগেও নিশ্চয়ই কোন পথ ছিল। কিন্তু সে পথে মোটর চলত না, মোটর ছিল না সে যুগে। মানুষ হেঁটে উঠত, কিংবা ঘোড়ায় চড়ে। হাতি উঠবার পথও ছিল কোন কোন দুর্গে। এখানেও বোধহয় ছিল। হাতি না থাকলে নবাব বাদশাহদের অসুবিধা হত। বেগমরা পাল্কি আর হাতিতেই চড়তেন। ঘোড়ায় টানা গাড়িও বোধহয় সে যুগে ছিল। মহাভারতের যুগে যখন রথ ছিল, তখন ঐতিহাসিক যুগে

ছিল না বলে ভাবা যায় না। এই পথে হয়তো সে রকম কোন গাড়িও উঠত।

কিন্তু এ সব কথা ভাববার আমার অবকাশ ছিল না। পথের দুধারের সুন্দর দৃশ্যে আমার দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ হয়েছে। শুনেছিলুম যে ভগ্নদশায় অনেক দ্রষ্টব্য আছে পথের পাশে। সে সবের কিছু দেখতে পাবার আগেই আমাদের বাস একটা গেট অতিক্রম করল।

মাণ্ডু দুর্গের এইটিই প্রথম দরজা। কৌতূহল নিয়ে শুক্লার দিকে তাকাতেই সে বলল: এর নাম দিল্লী গেট।

তারপরেই বলল: এই রকমের গেট এখানে আরও পাঁচটি আছে। উত্তরে ভাঙ্গিগেট আলমগীর গেট আর রামপোল গেট, সোনগড়ের দক্ষিণে তারাপুর গেট, আর ভগবানিয়া গেট রূপমতীর প্যাভিলিয়নের কাছে।

আমি বললুম: আমরা কোন্ দিক থেকে দুর্গে ঢুকছি, তা না বললে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারব না।

শুক্লা বলল: আমরা উত্তর দিক থেকে ঢুকছি। তারাপুর গেট দক্ষিণ পশ্চিমে, আর ভগবানিয়া গেট দক্ষিণেই বলতে পারেন।

দেখতে না দেখতেই আমরা আরও কয়েকটি গেট পেরিয়ে গেলুম। কিন্তু সে সবের নাম জেনে নেবার আর সময় পেলুম না। মনে হল যে মাণ্ডু দুর্গের ভিতর আমরা ঢুকে পড়েছি।

শুক্লা একটু দুঃখিত ভাবে বলল: আমি বোধহয় আপনাদের সঙ্গে ঘুরতে পারব না।

কেন?

বলে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

কিন্তু শুক্লা কোন উত্তর না দিয়ে তার বন্ধু বান্ধবদের দিকে তাকাল। তার আপত্তির কারণ আমি বুঝতে পারলুম। সারাটা পথ সে আমার সঙ্গেই গল্প করেছে, গাড়ি থেকে নেমেও যদি সে আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, তাহলে হয়তো বন্ধু বান্ধবের কাছে তাকে

উপহাসের পাত্র হতে হবে। আমি তাই আর তাকে কোন প্রশ্ন করলুম না।

কিন্তু শুক্লা নিজেই বলল : এখানকার দর্শনীয় স্থানগুলো দেখবার একটা হদিস আমি দিয়ে দিই। হয় তো আপনাদের দেখবার সুবিধে হবে।

বললুম : বল।

শুক্লা বলল : এই দুর্গের আয়তন বেশ বড়। পূর্ব পশ্চিমে চার পাঁচ মাইলের মতো, আর উত্তর দক্ষিণে তিন চার মাইল। সমতল হলেও পায়ে হেঁটে সব জিনিস দেখা সম্ভব নয়। তবে সুবিধে এই যে সমস্ত দর্শনীয় স্থানগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

হঠাৎ এক জায়গায় দেখলুম যে পথটা দু ভাগে ভাগ হয়ে গেল। আমাদের বাস বাঁ হাতের পথ না ধরে ধরল ডান হাতের পথ। শুক্লা বলল : এ ভালই হল।

কেন?

আমরা এবারে রয়াল এনক্লেভে পৌঁছব। সেখানকার সব কিছু দেখে এগিয়ে গেলেই পৌঁছব ভিলেজ গ্রুপে। এ দুটোই কাছাকাছি। রেবাকুণ্ড গ্রুপ অনেক দূরে।

কিন্তু এই ডান দিকের পথ ধরতেই কয়েকটি ছেলে মেয়ে চেঁচা-মেচি করে উঠেছিল। তারা বোধ হয় ভিলেজ গ্রুপের দিকেই যেতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের থামিয়ে দিল অন্য ছেলে মেয়েরা। কিছু বুঝতে না পেরে আমি শুক্লার দিকেই তাকালুম।

শুক্লা খুব মৃদুস্বরে বলল : খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার নিয়েই গোলমাল।

আমি বললুম : পিকনিকের জায়গা বুঝি ঠিক করা হয় নি!

শুক্লা আশ্চর্য হয়ে বলল : পিকনিক! আপনি কি ভাবছেন, এরা নিজেরা রেঁধে বেড়ে খাবে!

বললুম : তাকেই তো পিকনিক বলে।

শুক্লা হেসে বলল : পরিশ্রম করতে কেউ রাজি নয়। দেখতে পান নি, সঙ্গে কোন জিনিসপত্র আনে নি।

তাই তো, বাসনপত্র খাবার জিনিস কিছুই আনে নি এরা। সঙ্গে কোন খাবারও আনে নি। এরা তবে কোথায় খাবে ?

শুক্লা বলল : এই নিয়েই বিবাদ হচ্ছে। কেউ বলছে তাবেলি মহলের রেস্তোরাঁয় খাবে, কেউ বলছে মাণ্ডুর রেস্ট হাউসেই ব্যবস্থা ভাল হবে। আগে খাবার অর্ডার দাও, তারপরে বেড়াও। তা না হলে একসঙ্গে এত জনের খাবার কোথাও পাওয়া যাবে না।

অনাহারে থাকবার ভয় আমাদের নেই। মাণ্ডু একটা পরিত্যক্ত দুর্গ শুনেই আমরা ধরে নিয়েছিলুম যে সেখানে খাবার কিছুই পাওয়া যাবে না। একটু চা পাওয়া গেলেই গলা ভিজিয়ে আমরা কৃতার্থ হতে পারব। তাই মিনতি একটা বাস্কেটে খাবার এনেছেন সঙ্গে। পাঁউরুটি মাখন আর কলা। একটুখানি মিষ্টি আনবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু স্টেশনের মিষ্টি তাঁর পছন্দ হয় নি। বাঙলা মিষ্টি ইন্দোরে পাওয়া যায়, কিন্তু তার জন্যে দূরের বাজারে যেতে হত। বিরূপাক্ষ তাতে রাজী হন নি।

কিন্তু আমার মনে হয়েছিল যে খাবার সঙ্গে না নিলেও চলবে। মাণ্ডুতে যখন এত বাস যাতায়াত করে, তখন খাবার ব্যবস্থাও হয়তো আছে। কিন্তু সঠিক জানি না বলেই জোর করি নি। বিশেষ করে অভিমন্যু সঙ্গে আছে। তাকে উপবাসী রাখা চলতেই পারে না।

শুক্লা আমার দিকে চেয়ে বলল : গাড়ি যেখানে থামবে, আপনারা সেখানেই নেমে যাবেন। যদিও সব জায়গার পরিচিতি লেখা আছে, তবু একটা গাইড ধরে নেবেন। এরা সরকারী গাইড নয়। স্থানীয় লোকেরাই গাইডের কাজ করে। সামান্য কিছু পয়সা দিলেই সব কিছু যত্ন করে দেখিয়ে দেবে।

শুক্লার কথা শেষ হবার আগেই বাসখানা পথের ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। আমি উঠে দাঁড়ালুম। বিরূপাক্ষ যে আমার দিকে নজর রেখেছিলেন, তা বুঝতে পারলুম তাঁর প্রশ্ন শুনে। জিজ্ঞাসা করলেন : এইখানেই নামতে হবে নাকি ?

বললুম : নেমে পড়াই ভাল।

আরও অনেকে উঠে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু সবাই নামল না। দু একজনের চিৎকারও শুনতে পেলুম : এখানে নয়, এখানে নয়। তাবেলি মহল। প্রথমে চা, তারপরে অন্য কাজ।

আমরা নেমে পড়লুম। আমাদের সঙ্গে আরও কয়েকজন ছেলে মেয়ে নেমে পড়ল দেখে শুক্লাও নামল। আর বাসখানা এগিয়ে গিয়ে খানিকটা দূরে দাঁড়াল।

শুক্লা আমার কাছেই ছিল। জিজ্ঞাসা করলুম : এ আমরা কোথায় নামলুম ?

শুক্লা বলল : এই জায়গার নামই রয়াল এন্‌ক্লেভ। রাজবাড়ি ছিল এইখানে।

ওরা কোথায় গেল ?

বাস যেখানে দাঁড়িয়েছিল, তার বাঁ দিকে রাস্তার ধারে একটি দোতলা বাড়ি দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। শুক্লা বলল : ঐটেই বোধ হয় তাবেলি মহল।

বললুম : ও বাড়ি তো বন্ধ মনে হচ্ছে !

শুক্লাও বোধহয় আশ্চর্য হয়েছিল। বলল : ঐ বাড়িতে মাণ্ডুর রেস্ট হাউস বলে গাইড বইএ পড়েছি, সঙ্গে রেস্তোরাঁও আছে। কিন্তু—

দূর থেকে মনে হচ্ছে, সব দরজা জানালা বন্ধ। কোন লোকজনও দেখা যাচ্ছে না বাড়িতে। যে দু তিন জন ছেলে নেমেছিল, তারা বাড়ির চার ধার ঘুরে ফিরে এল। হৈ-চৈ শুনতে পেলুম খানিকটা। তারপরে বাস আবার এগিয়ে গেল।

মিনতি বললেন : বাস আমাদের ফেলে চলে যাবে না তো ?

প্রশ্নটা বাঙলাতেই করেছিলেন। কিন্তু আমার কাছে উত্তর নিশ্চয়ই চান নি। তিনি জানেন যে আমার বিদ্যের দৌড় তাঁর চেয়ে বেশি নয়। তাই শুক্লাকে আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করলুম। শুক্লা আশ্বাস দিয়ে বলল : মাণ্ডুতে লোকে এমনি করেই দেখে। বাস এগিয়ে গিয়ে গ্রামে দাঁড়াবে।

গ্রামে ?

হ্যাঁ। কিছু দোকান পাট সেখানে আছে। আর সেই জায়গার দর্শনীয় স্থানকেই বলে ভিলেজ গ্রুপ। সেখানেও আমাদের অনেক সময় লাগবে। কাজেই কোন চিন্তার কারণ নেই।

তার অভিজ্ঞতার কথা শুনে আমি বললুম : তুমি বোধহয় এর আগেও এখানে এসেছিলে ?

শুক্লা হেসে বলল : না।

তবে এত সব জানলে কোথায় ?

শুক্লা স্বীকার করল যে গাইড বই পড়েই সে এসব জেনেছে।

শুক্লার বন্ধু বান্ধব যারা বাস থেকে হুড়মুড় করে নেমে পড়েছিল, তারা দেখলুম একটা বড় গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়েছে। ধোঁয়ায় অন্ধকার করে প্রবল কণ্ঠে কথাবার্তা বলছে। একজনের আপসোসও শুনতে পেলুম, বলল : উঃ, মাস্টারদের সঙ্গে বেরোনো একটা শাস্তির ব্যাপার।

কেন ?

বলে আর একজন তাকে প্রশ্ন করল।

সে বলল : পৃথিবীটা বদলে গেল, কিন্তু এই মাস্টারদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাল না। নিজেরা সিগারেট খায়, অথচ আমরা যাতে খেতে না পারি, তার জন্যে নিজেরাও সিগারেট বার করল না।

একটি মেয়ে বলে উঠল : বেড়াল তপস্বীর মতো ইন্দোরের

সিনেমা হাউসেও দেখতে পাবে না। সিনেমা দেখবে দেওয়াশে আর উজ্জয়িনে।

যত সব ভণ্ডামি!

বলে আর একটি ছেলে মন্তব্য করল।

শুক্লা কিন্তু এদের কাছে এগোলো না। আমাদের দিকে চেয়ে বলল: আসুন এই দিকে।

বলে সেই গাছটাকে বাঁ দিকে রেখে একটা বড় এলাকার দিকে এগিয়ে চলল।

বিরূপাক্ষ আমাকে বললেন: এ দিকের ইতিহাসটা একটু জানা দরকার। তা না হলে ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাবে না।

শুক্লা বোধ হয় ইতিহাস কথাটা শুনতে পেয়েছিল। একটু পিছিয়ে এসে বলল: হিন্দু রাজাদের সময় এই দুর্গের নাম ছিল মাণ্ডব গড়। এখানে এখনও অনেক হিন্দু নাম আছে।

কী রকম?

বলে আমি তার দিকে তাকালুম।

শুক্লা বলল: জাহাজ মহলের দুধারে দুই সরোবরের নাম মুঞ্জতালাও ও কপূরতালাও। ধারায় মুঞ্জ নামে একজন রাজার নামও শোনা যায়।

তারপর?

মাণ্ডুর দক্ষিণ দিকে আছে রেবাকুণ্ড। নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দিরও আছে। এ সব তো পুরনো কালেরই নাম। কাজেই মেনে নিতে হয় যে এই দুর্গটি হিন্দুদেরই ছিল। পরে মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে।

আমি বললুম: মাণ্ডুর খ্যাতি বোধহয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে।

শুক্লা তখনই বলল: দিল্লীতে তখন মুসলমান অধিকারের শুরু। মুহম্মদ ঘোরীর পর তাঁর ক্রীতদাস কুতুবউদ্দীন দিল্লীর সুলতান হয়েছেন। তাঁর জামাই ইলতুৎমিস এসে উজ্জয়িনী জয়

করলেন। উজ্জয়িনীতে তখন মালবের রাজধানী। কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তা বললেন যে, না, এ কথা ঠিক নয়। তাঁর মতে ঘিয়াসউদ্দীন বলবন আরও পরবর্তী কালে মালব জয় করেন। দিলাওয়ার খান যখন মালবের শাসনকর্তা, তৈমুরের আক্রমণে দিল্লী তখন বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। দিলাওয়ার খান এই সুযোগে নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন।

সামনের একটি অদ্ভুত আকারের বাড়ির দিকে আমরা এগোচ্ছিলুম। আর শুক্লা ইতিহাসের গল্প শোনাচ্ছিল আমাদের। বলল: দিলাওয়ার খানের সময়েও ধারে ছিল মালবের রাজধানী। কিন্তু এই মাণ্ডুকে তিনি ভালবাসতেন, ঘনঘন এখানে আসতেন, আর থাকতেনও দীর্ঘ দিন। কিন্তু তবু এখানে তাঁর নিজের কীর্তি বোধহয় কিছুই নেই। সত্যি কথা বলতে গেলে তাঁর বীর পুত্র হোসঙ্গ শাহই মাণ্ডু প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি, তাঁর পুত্র মামুদ খিলজী ও ঘিয়াসউদ্দীন এই তিনজনেই মাণ্ডুর বর্তমান রূপ দিয়ে গেছেন।

একজন স্থানীয় লোক যে আমাদের অনুসরণ করছিল, আমরা তা বুঝতে পারি নি। শুক্লা থামতেই সে হিন্দীতে প্রশ্ন করল: এখানে আসবার সময়ে গেটের পাশে একটা মসজিদ দেখেছেন?

আমরা চমকে উঠেছিলুম। বিরূপাক্ষ বোধহয় একটু রেগেই গিয়েছিলেন গাইড মনে করে। পাণ্ডা আর গাইডদের আমরা একটু ভয় বা ঘৃণার চোখেই দেখি। এই জন্যই পছন্দ করি না যে একটুখানি ঘুরিয়েই অনেক পারিশ্রমিক দাবী করে। সামান্য কিছু দিয়েও যে তাদের বিদায় করা যায়, তা আমাদের মনে হয় না। অথচ অনেক পয়সা খরচ করে এই সব দূর দূর জায়গায় এসে সামান্য খরচের ভয়েই আমরা তাদের সাহায্য নিই না। কিন্তু শুক্লাকে অন্য রকম দেখলুম। সে তৎপর ভাবে জিজ্ঞাসা করল: কোন্ মসজিদ বল তো!

লোকটি বলল: মাণ্ডুর সব চেয়ে পুরনো মসজিদ। তৈরি হয়েছিল হিন্দু মন্দিরের ইট কাঠ দিয়ে। এখন সব ভেঙে পড়েছে। কিন্তু আপনারা হিন্দু স্থাপত্যের নমুনা দেখতে পাবেন।

আমি বললুম: ফেরার পথে দেখে যাওয়া যাবে, কী বল?

কিন্তু শুক্লার কাছে কোন সমর্থন পেলুম না। সে বলল: এ সব দেখার উৎসাহ কারও নেই।

আমাদের সেই লোকটি বলল: তবে এক কাজ করবেন।

কী কাজ?

জামি মসজিদও দেখবেন ভাল করে। সেখানেও অনেক কিছু আছে। আর হোসঙ্গ শাহর সমাধির নক্সাও দেখবেন।

বলতে বলতেই সে আমাদের নিয়ে এগোল।

বিরূপাক্ষ কঠিন ভাবে তাকালেন আমার দিকে। তাঁর দৃষ্টির অর্থ আমি বুঝতে পারলুম। অকারণে জোটালেন তো একজন! কিন্তু না জোটালেই বা চলবে কেন! কে আমাদের এই সব দেখাবে! শুক্লার হাতে গাইড বই আছে। কিন্তু বই পড়ে সে আর কতটুকু দেখাবে আমাদের! তার চেয়ে একজন গাইডই ভাল। নিজের চোখে যা দেখতে পাব না, সে সবও দেখাবে আমাদের গাইড।

মিনতি একটা প্লাস্টিকের বাস্কেট হাতে করে নেমেছিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললুম: ওটা আমার হাতে দিন।

মিনতি বললেন: আমার হাতেই থাক না ভাই।

কিন্তু বিরূপাক্ষ তা দেখতে পেয়েই সেটা ছিনিয়ে নিলেন। বললেন: ওটা তোমার হাতে থাকলে আমাদের অসম্মান হয়।

আমি হাসলুম তাঁর কথা শুনে।

আর অভিমন্যু এসে আমার হাত ধরল।

১০

খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে গাইড এবারে তার কাজ আরম্ভ করল। বলল : সামনেই দেখুন হিন্দোলা মহল। এইখানে দাঁড়িয়েই দেখতে পাবেন। হিন্দোলা নাম কেন হয়েছে তাও বুঝতে পারবেন।

কথাটা মিথ্যা নয়। হিন্দোলা মহলের বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে বাহির থেকেই। ইংরেজী 'টি' অক্ষরের মতো একটা মহল। গঠনের রীতি এমন কৌশলের যে তাকালেই মনে হবে যে মহলটা বুঝি হাওয়ায় দুলছে। সার্থক হয়েছে তার হিন্দোলা নাম।

শুক্লা বলল : হিন্দোলা মহলের নাম যে বাহিরেই একটা ফলকে লেখা ছিল, তা দেখতে পেয়েছেন কী ?

বললুম : খেয়াল করি নি।

গাইড বলল : হিন্দোলা মহলকে কেন এমন দেখায়, তা সহজেই বুঝতে পারবেন।

বলে এর নির্মাণের কৌশল আমাদের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করল। একটুখানি চেষ্টা করে অভিমন্যুও তা বুঝতে পারল। দেওয়ালের নিচের অংশ উপরের চেয়ে অনেক প্রশস্ত। নিচের অংশ যদি চল্লিশ ফুট হয় তো উপরের অংশ বিশ ফুটের বেশি হবে না। তাই উপরের দিকই হেলে আছে মনে হবে। অভিমন্যু বলে উঠল : দেওয়ালটাকে কেউ ধাক্কা দিয়ে কাত করে দিয়েছে, না মামা ?

বললুম : মানুষের অত শক্তি নেই, বোধহয় কয়েক শো হাতিকে এই কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল।

বিরূপাক্ষ বললেন : কী আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন।

বিরূপাক্ষ কী দেখতে বললেন তা বুঝতে না পেরে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম। তিনি বললেন: দেওয়ালের কোন জায়গায় কোন কারুকার্য নেই।

বললুম: তাইতেই এমন গম্ভীর ভাব হয়েছে। বেশ একটা আভিজাত্য আছে বলে মনে হচ্ছে।

গাইডের পিছনে ভিতরে প্রবেশ করে আবার আমরা আশ্চর্য হলুম। এ ধারের দেওয়াল একেবারেই ঢালু নয়। সাধারণ দেওয়ালের মতো সোজা ও সরল। বাহিরটা যে ঢালু, তা ভিতর দেখে বোঝবারও উপায় নেই।

'টি' অক্ষরের দাঁড়িটা হল বিরাট একটা ঘর। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া, উঁচুও খুব। ঘরের মাপ জোখ আমাদের গাইডের জানা ছিল। বলল: আটাশি ফুট লম্বা, আর চওড়া ষাট ফুট। উপরের দিকে যে সারি সারি খিলান আছে তা ছত্রিশ ফুট উঁচু।

বিরূপাক্ষ বললেন: এত বড় একটা ঘর কোন্ কাজে লাগত?

প্রশ্নটা আমাকেই করেছিলেন। কিন্তু আমি তার উত্তর জানি না বলে হিন্দীতে প্রশ্নটা করলুম। কাজেই গাইডের কাছে উত্তর পাওয়া গেল। সে বলল: সুলতান বোধহয় এইখানে দরবারে বসতেন।

'টি'-এর উপরের অংশটা বোধহয় অন্য কাজে ব্যবহৃত হত। কিংবা এটা পরে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সব কিছু খুঁটিয়ে দেখবার আগেই বিরূপাক্ষ তাড়া দিয়ে বললেন: এক জায়গাতেই এত সময় দেবেন না মশাই, শেষ পর্যন্ত আর সব জায়গা দেখা হবে না।

তারপরেই জিজ্ঞাসা করলেন: দেখবার জায়গা এখানে কত আছে?

শুক্লা তাঁর প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছিল। বলল: পঁচাত্তর।

সর্বনাশ!

বলেই বেরিয়ে পড়লেন। একটা ব্যস্ততা লক্ষ্য করা গেল তাঁর মধ্যে। যেন এই পঁচাত্তরটি দ্রষ্টব্য স্থানই আমাদের দেখতে হবে।

কিন্তু বাইরে বেরিয়েই মিনতি আমাকে বললেন: এই বাড়ির জানালাগুলো দেখেছেন?

তাঁর কথা শুনে আমি উপরের দিকে তাকালুম। বেশ একটু অদ্ভুত ধরনের জানালা। তার উপরের ছাদ দেখে হিন্দু মন্দিরের শিখর বলে মনে হবে। বললুম: ভারি সুন্দর তো!

কিন্তু বিরূপাক্ষ এ সব দেখবার জন্যে অপেক্ষা করলেন না। খোলা জায়গা দিয়ে এগিয়ে চললেন হনহন করে।

সামনে একটি পুরাতন রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। প্রায় সব কিছুই ভেঙে পড়েছে। গাইড না বললে আমরা বুঝতেই পারতুম না যে এখানে কোন কালে রাজপ্রাসাদ ছিল। এই রাজপ্রাসাদটি কে তৈরি করেছিলেন, শুক্লাকে আমি সেই কথা জিজ্ঞাসা করলুম। কিন্তু শুক্লা এর উত্তর দিতে পারল না। বলল: আমার গাইড বইএ এই রাজবাড়ির কোন উল্লেখই নেই। তবে কাছেই নাকি দিলাওয়ার খাঁর একটি মসজিদ আছে। সেটিই এই মাণ্ডুর প্রথম মুসলমান কীর্তি। পঞ্চদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় এটি তৈরি হয়েছিল। হিন্দোলা মহল তৈরি হয়েছে এর অনেক পরে।

আমি বললুম: এই রাজপ্রাসাদ তাহলে কোন হিন্দু রাজার তৈরি। আরও অনেক পুরনো বলেই ভেঙে পড়েছে।

শুক্লা বলল: অসম্ভব নয়।

কিন্তু আমাদের গাইড তখন একটি শূন্য স্থানে দাঁড়িয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বলল: এর নাম হল চম্পা বাউলি। চম্পা বাউরিও বলে অনেকে।

যত দূর জানি, বাউলি মানে কুয়ো। কিন্তু ধারে কাছে কিছুই দেখতে পেলুম না।

অভিমন্যু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, ঐ দেখ মামা, ওরা নিচে নেমে যাচ্ছে।

খানিকটা দূরেই দুটি ছেলেকে দেখলুম নিচে নেমে যেতে। মনে হল, মাটির নিচে নামবার সিঁড়ি আছে। আর অন্ধকারের জন্যে তারা টর্চ জ্বেলে নিচে নামছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেই দেখতে পেলুম যে তারা আবার উপরে উঠে এল। গাইডকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম : এ আবার কী ব্যাপার ?

গাইড বলল : মাটির নিচে দিয়ে জাহাজ মহলে যাবার একটা পথ আছে।

বিরূপাক্ষ বললেন : জাহাজ মহল আবার কোথায় ?

গাইড উত্তর দিল : এইতো কাছেই। এখান থেকে আমরা জাহাজ মহলেই যাব।

তারপরে চম্পা বাউলির কথা বলল : চম্পা বাউলি হল একটি সুগন্ধি জলের কুয়ো। সুলতানদের আমলে এর জলে চাঁপা ফুলের গন্ধ ছিল। নিচে নামবেন ?

বলে আমাদের দিকে তাকাল।

জিজ্ঞাসা করলুম : নিচে আবার কী আছে ?

গাইড বলল : নিচু নিচু ঘর আছে এক সারি। ভারি শীতল ঘর। মুঞ্জতালাওএর বাতাস আসে সেখানে, আর চম্পা বাউলির সৌরভ।

বিরূপাক্ষ বললেন : না না, সব জায়গায় নিচে নামা ঠিক হবে না।

তারপরে যুক্তি দিয়ে বললেন : কোথায় কী অবস্থায় আছে— পোকা মাকড়—তার ওপর সময়েরও একটা প্রশ্ন আছে।

কিন্তু আমি গাইডকে জিজ্ঞাসা করলুম : মুঞ্জতালাওটা কোথায় ?

গাইড বলল : আসুন আমার সঙ্গে।

বলে গাইড আমাদের পথ দেখিয়ে কিছু ভাঙা ঘর বাড়ির ভিতর দিয়ে এক জায়গায় নিয়ে এল। আমাদের সামনেই একটি ভাঙা দরজা। কিন্তু বাহিরে যাবার পথ নেই। দরজা নয়, একে একটা বড় জানালা বলা উচিত। এই দরজার মতো জানালা দিয়ে আমরা একটি অপরূপ দৃশ্য দেখতে পেলুম।

চোখের সামনে নীল আকাশ। কিন্তু তারই নিচে একটি বিরাট জলাশয়, অযত্নে আগাছায় ভরে আছে তার চারি ধার। জলের নিচে থেকেও ঘাস গজিয়ে উঠেছে। জল কত গভীর, উপর থেকে তা বোঝবার উপায় নেই। গাইড সংক্ষেপে বলল: এই হল মুঞ্জতালাও।

অভিমন্যু এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মিনতি তার হাত টেনে ধরলেন। এই দরজা পেরিয়ে গেলে হয়তো মুঞ্জতালাওএর জলেই পড়তে হবে।

এইবার আমি মুঞ্জতালাওএর চারি ধারে চেয়ে দেখলুম। আমরা এই সরোবরের উত্তর তীরে একটি ভাঙা বাড়ির উপরে দাঁড়িয়ে আছি। সামনে সোজা দক্ষিণে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি নীল দিগন্ত। কিন্তু ডান দিকে আর একটি ভাঙা মহল দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে, কিছু লোকজনও সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাইডের দিকে চেয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: ওরা কারা?

গাইড বলল: ওরাও আপনাদের মতো মাণ্ডু দেখতে এসেছে।

বলে কোথা দিয়ে ঐ মহলে যেতে হবে, সেই পথটি দেখিয়ে দিল। মানে, আমাদের এই মহল থেকে নিচে নামলেই ওই মহলে যাবার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে।

তারপরে আমি বাঁ দিকে তাকালুম। এ দিকে একটি বিরাট অট্টালিকা উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত। কিন্তু এটি এখনও সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। এর কোন অংশ ভেঙে পড়েছে বলে

মনে হল না। গাইডের দিকে তাকাতেই সে বলল: জাহাজ মহল হল এইটি।

শুক্লা তখনই জিজ্ঞাসা করল: কপূরতালাও তাহলে কোনটা?

গাইড বলল: জাহাজ মহলের ওধারে। এ ধার থেকে দেখা যাবে না।

শুক্লা আমার দিকে চেয়ে বলল: জাহাজ মহলের আসল রূপ দেখতে আমাদের অন্যত্র যেতে হবে।

কেন?

জাহাজ মহল নাম হয়েছে কেন জানেন তো?

বললুম: বাড়িটা জাহাজের মতো দেখতে, তাই না?

শুক্লা বলল: না। মুঞ্জতালাও আর কপূরতালাওএর মাঝে এমন ভাবে তৈরি হয়েছে যে মনে হবে এই মহলটি যেন জাহাজের মতো জলের উপরে ভাসছে, আর জলের তরঙ্গের উপরে ছায়া দেখে মনে হবে যেন দুলছে এই জাহাজ।

আমি দেখলুম যে এ ধারের জলে সত্যিই ছায়া পড়েছে জাহাজ মহলের। আর জলের উপর সেই ছায়া দুলছেও অল্প অল্প।

শুক্লার দৃষ্টিতে আমি খানিকটা ভাবালুতা লক্ষ্য করেছিলুম। কিন্তু বিরূপাক্ষ তার কথার একটা বিরূপ মন্তব্য করলেন। কিন্তু হিন্দীতে না বলে তিনি বাঙলায় বললেন কথাটা: আমি তো অন্য রকম দেখছি।

কি রকম?

বলে মিনতি তাঁর দিকে তাকালেন।

বিরূপাক্ষ বললেন: দুই তালাওএর মাঝে একখানা জাহাজ তো দেখছি না, দেখছি একটা তালাওএর দুধারে দুখানা জাহাজ।

কিন্তু শুক্লার কথা শুনে মনে হল যে সে এই মন্তব্য বুঝতে পেরেছে। বলল: আসুন না, কোন উঁচু জায়গায় উঠে দেখবার চেষ্টা করি।

বিরূপাক্ষ ভয় পেয়ে বললেন : উঁচু জায়গায় আবার কোথায় উঠবেন।

গাইড বলল : এ বাড়িতে তো উপরে উঠবার কোন জায়গা নেই। তবে ওধারের ঐ মহলে গিয়ে উঠতে পারেন।

বিরূপাক্ষ প্রবল ভাবে আপত্তি করলেন, বললেন : না না, এ সব রিস্ক্ নিয়ে কোন কাজ নেই। যা দেখতে পাচ্ছি, তাই যথেষ্ট।

গাইড বলল : জাহাজ মহলের উপরে উঠবার চমৎকার সিঁড়ি আছে।

বিরূপাক্ষ বললেন : জলে সাঁতার কেটে যেতে হবে নাকি ?

গাইড বলল : না না, আমরা সদর রাস্তা দিয়েই যাব। যেখান থেকে এসেছি, সেই দিকেই যেতে হবে। একটুখানি এগোলেই জাহাজ মহল। বলতে গেলে এ ধার দিয়ে ঢুকলে হিন্দোলা মহল, আর অন্য ধারে জাহাজ মহলের ছোট দরজা।

কিন্তু জাহাজ মহলে যাবার আগে আমরা রাজবাড়ির হামাম দেখলুম। হামাম মানে হল গরম জলের স্নানাগার। গাইডের কাছেই এই কথাটি জানতে পারলুম। যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলুম, সেখান থেকে খানিকটা পিছিয়ে এসে ছোট ছোট ঘর দেখতে পেলুম গোটা কয়েক। তার ভিতরে জল গরম করবার ব্যবস্থা গাইড আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করল। কোথা দিয়ে ঠাণ্ডা জল এসে গরম হত, আর কী ভাবে সেই গরম জল যেত স্নানের ঘরে, আর প্রয়োজনীয় ঠাণ্ডা জল কোথা থেকে কী ভাবে আসত, এ সব বোঝাবার সে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিরূপাক্ষ বলে উঠলেন : সব বুঝে ফেলেছি।

বলে বেরিয়ে এলেন সেখান থেকে। তাঁকে অনুসরণ করে আমরাও বেরিয়ে এলুম।

চলতে চলতেই শুক্লা আমাকে বলল : আপনার কথাই ঠিক মনে হচ্ছে।

আমি একটু আশ্চর্য হয়ে বললুম : কোন্ কথা বল তো ?

শুক্লা বলল : আপনি যে বললেন এই প্রাসাদ হিন্দু রাজাদের ছিল, আমারও তাই মনে হচ্ছে। মুঞ্জতালাও কর্পূরতালাও তো হিন্দু নাম। তারই ধারে হিন্দু রাজা ভোজ কিংবা মুঞ্জ এই প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। তারপর দিলাওয়ার খান যখন এই দুর্গের অধিকার পান, তখন নিশ্চয়ই এই প্রাসাদে এসেই থাকতেন। এই হামাম হয়তো তাঁরই তৈরি। আর নিজেদের উপাসনার জন্যে শুধু একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন নিকটে।

আমি বললুম : অসম্ভব নয়।

কিন্তু শুক্লা বলল : আমি মনে করছি যে এইটেই খুব বিশ্বাসযোগ্য কথা। হিন্দু রাজারাও তো এখানে এসে বসবাস করতেন। রেবাকুণ্ড আছে, নীলকণ্ঠ মহাদেব আছে, আর রাজাদের বসবাসের কোন রাজবাড়ি নেই, এমন হতেই পারে না। আর এই প্রাসাদটিই সব চেয়ে প্রাচীন বলে এমন ভাবে ভেঙে পড়েছে যে আজ এর চিহ্ন শুধু ভাঙা দেওয়াল। হামাম পরবর্তী কালে তৈরি বলেই এখনও অক্ষত আছে।

চলতে চলতেই আমি বললুম : মুঞ্জতালাওএর পূর্ব দিকে যে মহলটি দেখলুম, সেটিও হিন্দু রাজাদের হতে পারে। সেটিও তো ভেঙে পড়েছে। তবে তার অবশিষ্টও আছে অনেক কিছু।

তখন আমরা বাহিরের রাস্তায় এসে পৌঁছে গেছি। যে ছেলেরা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল তারা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে দেখতে পেলুম না। বোধহয় তাদেরই দুজনকে দেখেছিলুম সুড়ঙ্গ পথে নিচে নামতে। অন্য সবাই বোধহয় মুঞ্জতালাওএর ওপাশের মহলে চলে গেছে। কিংবা জাহাজ মহলের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে।

ঠিক এই সময়ে হিন্দোলা মহলের সামনে একখানা মোটর

গাড়ি এসে দাঁড়াল। জন কয়েক মেয়ে পুরুষ গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। গাড়িটা গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল।

আমরা জাহাজ মহলের দিকে এগিয়ে গেলুম। প্রশস্ত রাজপথের ধারেই জাহাজ মহল। অনেক দূরে এই জাহাজ মহলের উপরে উঠবার সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। রাস্তার ধার থেকেই বাড়ির উপরে উঠেছে। কিন্তু আমাদের গাইড এ ধারেরই একটা ছোট গেট দিয়ে ভিতরে নিয়ে গেল। বলল: এ ধার থেকে দেখতে দেখতে আমরা ও ধারের ঐ সিঁড়ির ধার দিয়ে বেরোব।

কিন্তু জাহাজ মহলের ভিতরে ঢোকবার আগে শুক্লা একবার দাঁড়িয়ে পড়ল। আশ্চর্য হয়ে আমি বললুম: দাঁড়ালে কেন?

শুক্লা বলল: হিন্দোলা মহলে একটা জিনিস আমাদের দেখা হল না।

কী?

হাতি চড়াও।

সে আবার কী?

বলে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম কৌতূহল নিয়ে।

শুক্লা বলল: হিন্দোলা মহলের দোতলায় ছোট ছোট ঘর দেখেছিলেন?

বললুম: খেয়াল করি নি।

শুক্লা বলল: ঐ সব ঘরে উঠবার জন্যে কোন সিঁড়ি দেখতে পাই নি। অথচ ঘরগুলো নিশ্চয়ই ব্যবহার হত।

বললুম: তা না হলে তৈরি হল কেন!

শুক্লা উৎসাহিত হয়ে বলল: শুনেছিলুম যে ঐ সব ঘরে পৌঁছবার জন্যে সিঁড়ি নেই বটে, কিন্তু সমতলের পথ ক্রমশ উঁচু হয়ে দোতলায় পৌঁছেছে। সেখানে পাল্কি উঠবে, হাতিও উঠবে।

হাতি?

শুক্লা বলল: আশ্চর্য হচ্ছেন কেন! সেকালের অন্তঃপুরিকারা

তো পায়ে হেঁটে বেড়াতেন না। হয় পাল্কিতে উঠতেন, নয় হাতির পিঠে। সে সব এমনভাবে ঢাকা থাকত যে পুরুষেরা তাঁদের দেখতে পেত না। বেগমদের এই জন্মে পাল্কি বা হাতির পিঠ থেকে নামতে হত না। সোজা গিয়ে দোতলায় উঠতেন। যে পথে হাতি উঠত, সেই পথেরই নাম হাতি চড়াও।

আমার মনে হল যে এ রকম ব্যবস্থা বোধহয় আমি অন্যত্রও দেখেছি। কিন্তু কোথায় দেখেছি, তা সহসা মনে করতে পারলুম না।

অভিমন্যু আমার পাশে দাঁড়িয়ে গল্প শুনছিল। বলল: ঘরের ভিতরে হাতি ঢুকত মামা?

বললুম: ঘরের ভেতরে ঢুকত না, দোতলার ঘর পর্যন্ত উঠত হাতি।

বলে তাকে বুঝিয়ে দিলুম ব্যাপারটা।

শুক্লা বলল: চম্পা বাউলির নিচে যে ঘরগুলি দেখলেন, সেগুলিও বেগমদের আরামের জন্মে। মধ্যযুগে প্রায় সর্বত্রই মাটির নিচে মহল তৈরি হত। তা না করে উপায় ছিল না। সে যুগে তো গ্রীষ্মকালে পাহাড়ে যাবার রেওয়াজ ছিল না। রেওয়াজ হবেই বা কী করে! যাতায়াত তো একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল।

বললুম: বৈদ্যুতিক পাখা ছিল না, ছিল না এয়ার কণ্ডিসনার। কিন্তু গরম দুঃসহ ছিল সেকালেও।

শুক্লা বলল: আমরা ভাবি সেকালের লোক এই প্রাকৃতিক নিয়ম বুঝি মেনে নিয়েছিল। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে তা তারা মেনে নেয় নি। কোথাও হাওয়া মহল তৈরি হয়েছে, কোথাও তৈরি হয়েছে হ্রদের জলে প্রাসাদ। আবার কোথাও মাটির নিচে অন্ধকার মহল তৈরি হয়েছে।

শুক্লা ঠিকই বলেছে। জয়পুরে আমরা হাওয়া মহল দেখেছি। হ্রদের মধ্যে প্রাসাদ দেখেছি উদয়পুরে। আর এখানে চম্পা বাউলির

কাছে মাটির নিচে মহল দেখলুম। মাটির উপর থেকে যতটুকু আলো যায়, ততটুকুই আলো। বাকিটা অন্ধকার। বিজলি তো নেই যে বিজলির আলো জ্বলবে। কিন্তু পাখার বদলে প্রাকৃতিক বাতাস আছে। মুগুতালাওএর শীতল বাতাস, চম্পা বাউলির চাঁপার সৌরভের সঙ্গে মিলে আকর্ষণীয় করেছে সেই পরিবেশ।

এরই নাম বাদশাহী বিলাস। সুলতানরাও এই বিলাস ভোগ করতেন বাদশাহী আমলে। কিন্তু বিরূপাক্ষ আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দিলেন না, বললেন: দেরি করছেন কেন, চলে আসুন। এখনও অনেক কিছু দেখতে বাকি আছে।

আমরা আর দেরি করলুম না। তৎপর ভাবে এগিয়ে গেলুম তাঁর পিছনে।

১১

জাহাজ মহলের গড়ন কিন্তু জাহাজের মতো মোটেই নয়। কোন দিক থেকেই একে জাহাজ বলে মনে হবে না। অবশ্য এ রকম আকারের জাহাজ আছে কিনা, তা জোর করে বলা যায় না। শুক্লার কথাই ঠিক মনে হয়। জলের উপরে এই বাড়ির ছায়া যখন কাঁপে তখন একে হয়তো জাহাজ বলে মনে হয়।

প্রথমটা আমি এই বিরাট বাড়িটাকে বাহির থেকে বোঝবার চেষ্টা করলুম। শুক্লাও আমার সঙ্গে ছিল। তারও ইচ্ছা ছিল যে এই বাড়িটাকে জাহাজ মহল বলা হত কেন, সেই কথাটাই আবিষ্কার করা যাক সকলের আগে। কাজেই আমরা জাহাজ মহলের ভিতরে না ঢুকে বাহিরেই আবার বেরিয়ে এলুম।

নিচে থেকে দেখে একটা ব্যারাকের মতো লম্বা বাড়ি বলে মনে হচ্ছে। কিছু দূরে দূরে এক একটা দরজা। কিন্তু সে সমস্ত খোলা। বন্ধ করবার কোন ব্যবস্থা নেই। ভিতের উপরে এক তলাই দেখা যাচ্ছে, আর দোতলার উপরে স্থানে স্থানে আছে ছোট ছোট গম্বুজ-ওয়ালা ঘর। দু পাশের ঘর দুটি বড়, মাঝের ঘরগুলি ছোট। শুক্লা বলল: মাটির নিচেও একটি তলা আছে, সেখানে ছিল বেগমদের স্নানের জন্যে হামাম।

কিন্তু এ পাশে কোন জলাশয় না দেখে সে বেশ আশ্চর্য হল। বলল: কী আশ্চর্য দেখুন, গাইড বই পড়ে ব্যাপারটা আমি অন্য রকম ভেবেছিলাম।

কী রকম?

বলে আমি তার দিকে তাকালুম।

তার হাতের বইখানা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল: আপনি পড়ে দেখুন তো, আপনার কী মনে হয়।

সরকারী গাইড বইএর যে জায়গাটা সে আমাকে পড়তে বলল, তা এক নজরে আমি পড়ে ফেললুম। তা পড়লে সত্যিই এই ধারণা হয় যে কপূরতালাও ও মুঞ্জতালাওএর মাঝখানে এক ফালি সরু জমির উপরে এই জাহাজ মহল। কপূর মানে কর্পুর, কিন্তু মুঞ্জর মানে লেখা নেই। জাহাজ মহলের মানে লেখা আছে শিপ প্যালেস। তার কারণ এটি দেখতে ঠিক জাহাজের মতো। লম্বায় এই মহল তিন শো ষাট ফুট, আর চওড়ায় আটচল্লিশ ফুট। উচ্চতায় মাত্র একত্রিশ ফুট।

আরও কিছু লেখা ছিল। কিন্তু তা পড়বার আগেই শুক্লা বলল: ওধারে মুঞ্জতালাও আছে ঠিকই। কিন্তু এ ধারে কোন্ তালাও আছে বলুন!

সত্যিই নেই। বাঁধানো রাস্তা আর এই মহলের মাঝখানে ঘাস এমনভাবে বেড়ে উঠেছে যে তার মধ্যে দিয়ে হাঁটাচলা এক রকম অসম্ভব। রাস্তার ওধারেও কোন তালাও দেখা যাচ্ছে না।

তবু তাকে আশ্বাস দেবার জন্যে আমি বললুম: খানিকটা দূরে হয়তো আছে। এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না।

শুক্লা হতাশ হয়েছিল খুব, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করল না।

আমি বললুম: আর একটা অনুমান করা যেতে পারে।

কী?

বলে শুক্লা আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম: কপূরতালাও হয়তো বুজে এসেছিল। তাই তার উপর দিয়েই এই রাস্তা হয়েছে।

শুক্লা এ কথারও কোন উত্তর দিল না। কিন্তু তাকে আমি ভারি বিমর্ষ দেখলুম। তাই বললুম: চল, এবারে ভেতরটা দেখে আসি।

কিন্তু ভিতরে ঢুকবার আগে শুক্লা বলল: কপুরতালাওএর ধারে একটা গোলাব বাগ ছিল বলে শুনেছিলাম। তাও তো দেখতে পাচ্ছি না।

রাস্তার ওধারে খানিকটা দূরে একটা দোতলা বাড়ি দেখতে পাচ্ছিলুম। আমাদের বাস সেখানে খানিকক্ষণের জন্যে দাঁড়িয়েছিল। শুক্লা বলল: ঐ বাড়িটার নামই বোধহয় তাবেলি মহল। যদি আমার অনুমান ঠিক হয় তো সুলতানদের সময়ে ওটা একটা আস্তাবল ছিল।

আশ্চর্য হয়ে বললুম: দোতলা আস্তাবল!

শুক্লা বলল: অসম্ভব নয়। দোতলায় হয়তো আস্তাবলের লোকজন থাকত, আর ঘোড়া থাকত নিচে। কিন্তু এর চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে গাইড বইএ লিখেছে, তাবেলি মহলে এখন মাণ্ডুর রেস্ট হাউস। একটা রেস্তোরাঁও আছে শুনে এসেছিলাম।

আমি বললুম: এ বোধহয় পুরনো খবর। রাজ্যের সরকার কি আর বেশি দিন একটা আস্তাবলে রেস্ট হাউস খুলে রাখবেন! খোঁজ নিলেই জানা যাবে যে নতুন রেস্ট হাউস বা টুরিস্ট বাংলো তৈরি হয়েছে কোন ভাল জায়গায়। এটা তারা ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

কথাটা যে আমি ঠিকই বলেছিলুম তা জেনে ছিলুম পরে। তাবেলি মহলে এখন একটা সরকারী অফিস হয়েছে। সেটা বন্ধ ছিল কোন কারণে, কিংবা অফিস খোলবার সময় হয় নি তখনও। আর নতুন রেস্ট হাউস নাকি অন্য দিকে তৈরি হয়েছে। দিল্লী গেট দিয়ে দুর্গে ঢোকবার পরে যে পথটা বেঁকে এসেছে ভিলেজ গ্রুপের দিকে, সেই পথের ধারেই নাকি নতুন রেস্ট হাউস হয়েছে। অন্য পথে এসেছি বলে আমরা তা দেখতে পাই নি।

জাহাজ মহলের ভিতরে ঢুকে দেখলুম যে আমাদের গাইড

এখন বিরূপাক্ষকে সব কিছু বুঝিয়ে দেখাচ্ছে। আমাদের দেখতে পেয়েই বিরূপাক্ষ বলে উঠলেন : কোথায় ছিলেন এতক্ষণ ?

বললুম : বাইরেটা দেখছিলুম।

মিনতি বললেন : নিচে নামবেন নাকি ?

কী আছে নিচে ?

তেমন কিছু নেই।

কিন্তু বিরূপাক্ষ বললেন : না দেখলে আপসোস থেকে যাবে মনে হলে নেমে দেখে আসতে পারেন।

মিনতি বললেন : বারান্দা দিয়ে জোড়া তিনটে বড় বড় ঘর। বেগমরা নাকি স্নান করত সেখানে।

বিরূপাক্ষ সকৌতুকে প্রশ্ন করলেন : কত বেগম স্নান করত জানেন ?

তা কয়েক শো হবে।

কয়েক শো নয় মশায়, কয়েক হাজার বলুন। গাইড বলছে পনের হাজার।

আমি বললুম : এ আর এমন বেশী কি !

পরম বিস্ময়ে মিনতি আমার মুখের দিকে তাকালেন। আর আমি হেসে বললুম : আমাদের কৃষ্ণের তো ষোল হাজার রাণী ছিল।

বলেন কি !

বলে বিরূপাক্ষ থমকে দাঁড়ালেন। বললুম : এঁরা আবার কৃষ্ণের নিজের বিবাহিতা রাণী নন। প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা নরকাসুরকে বধ করে তাঁর অন্তঃপুরের ষোল হাজার রাণীকে দ্বারকায় এনেছিলেন। নিজের বিবাহিত রাণী ছিলেন আরও কয়েকজন।

অভিমন্যু যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আমাদের কথা শুনছিল, তা বুঝতে পারি নি। তাই তাড়াতাড়ি বললুম : এ সব তৈরি গল্প। বঙ্কিম-

চন্দ্র তাঁর কৃষ্ণচরিতে প্রমাণ করেছেন যে এ সবই মিথ্যে। কৃষ্ণ শুধু রুক্মিণীকেই বিয়ে করেছিলেন। রাধাও একটি কল্পিত চরিত্র।

বলে আমি এগিয়ে গেলুম মুঞ্জতালাওএর দিকে। এই দিকটা সত্যিই সুন্দর। মহলের পাশেই এই জলাশয়। এখন আগাছায় ভরে থাকলেও পুরাকালে নিশ্চয়ই এ রকম ছিল না। তখন এই জলাশয়ের জল সারাক্ষণ টল টল করত, আর তার উপরে ছায়া পড়ত জাহাজ মহলের। জল কাঁপত আর সেই ছায়াও দুলত। শুক্লাও খুশী হয়ে উঠল এই ছায়া দেখে। আমার দিকে চেয়ে বলল : আমার একটা গল্প মনে পড়ছে।

বললুম : বেশ তো, বল না গল্পটা।

শুক্লা বলল : তার আগে এই জাহাজ মহলের ইতিহাসই আপনার জানা দরকার!

জাহাজ মহল থেকে ধীরে ধীরে হেঁটে বেরোবার পথে এই মহল তৈরির ইতিহাস শুনলুম শুক্লার মুখে। বলল : দিলাওয়ার খানের কথা আমি আপনাকে আগেই বলেছি। এখানে তাঁর নামে একটি ভাঙা মসজিদ আছে যে ধার থেকে আমরা এসেছি সেই ধারে। তিনি আর কিছুই বোধহয় করেন নি। কিন্তু এই মাণ্ডুকে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করেছিলেন তাঁর বীর পুত্র হোসঙ্গ শাহ। তিনি রাজত্ব করেছিলেন মাত্র সাতাশ বছর, কিন্তু এই অল্প সময়ে অনেক কিছুই করে গিয়েছিলেন। আমার মনে হয় যে হিন্দু রাজারা আগে এই পাহাড়ে বেড়াতে আসতেন অবকাশ যাপনে। হোসঙ্গ শাহর বাবাও তাই করেছেন। কিন্তু হোসঙ্গ শাহ বুঝতে পেরেছিলেন যে ধারের সমতল ভূমিতে রাজধানী না রেখে এই পাহাড়ের দুর্গে আশ্রয় নিলে রাজ্য রক্ষার সুবিধা হবে। এই পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে গভীর বন, তার নিচে নিমরের সমতলভূমি।

তারপরেই শুক্লা আমাকে প্রশ্ন করল : উপরে উঠবার সময়ে দুর্গের দেওয়াল দেখতে পেয়েছেন তো?

বললুম : দেখেছি।

শুক্লা বলল : মাণ্ডুতে হোসঙ্গ শাহর এইটি প্রথম কাজ। পাহাড়ের যে সব অংশ দুর্ভেদ্য ছিল না, সেখানে তিনি মজবুত দেওয়াল তুললেন। অনেক অধ্যবসায় ও অর্থ ব্যয় করে মাণ্ডুকে একটি সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করলেন। তারপরে শুরু করলেন রাজ্য জয়ের অভিযান। উত্তরে কাল্পি থেকে দক্ষিণে খেরলা পর্যন্ত জয় করলেন। গুজরাতের রাজাদের সঙ্গেও অবিরত যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু কতটা সুবিধে করতে পেরেছিলেন তা বলতে পারব না।

বিরূপাক্ষও আমাদের পাশে পাশে হাঁটছিলেন। বললেন : মাণ্ডুতে তাঁর আর কোন কীর্তি নেই?

আছে বৈকি। বিখ্যাত জামা মসজিদ আর নিজের সমাধি এ দুটোই তিনি তৈরি করেছেন। একটু পরেই আমরা সে সব দেখতে পাব।

আমি বললুম : জাহাজ মহলের কথাটা আগে শেষ করে ফেল।

শুক্লা বলল : জাহাজ মহলের প্রতিষ্ঠাতা ঘিয়াসউদ্দীনের কথা বলতে হলে তাঁর বাপ মামুদ খিলজীর কথা আগে বলতে হয়। হোসঙ্গ শাহর পরে তাঁর এই পুত্র একেবারে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছিলেন। সারা জীবন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করেছেন। শুধু গুজরাতের রাজার সঙ্গে নয়, দিল্লী জৌনপুর ও দাক্ষিণাত্যের রাজাদের সঙ্গেও যুদ্ধ লাগিয়ে রাখতেন। তাঁর বিক্রম দেখে বাগদাদের ক্যালিফ ও মধ্য এশিয়ার স্বাধীন রাজারাও তাঁর দরবারে দূত পাঠাতেন।

আর এই বাপের ছেলে হয়ে ঘিয়াসউদ্দীন হলেন একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। যুদ্ধ বিগ্রহ দেখে দেখে তাঁর ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। সুলতান হয়েই প্রতিজ্ঞা করলেন যে তাঁর নিজের জীবনে কোন দিন যুদ্ধ করবেন না। করলেনও তাই। প্রচুর খরচ করে এই জাহাজ মহল তৈরি করলেন তাঁর বেগমদের জন্যে। সত্যি সত্যিই পনের হাজার বেগম নাকি এই জাহাজ মহলে থাকত। আর

এই সব বেগম শুধু ভারতীয় কন্যা নয়, তুর্কী ও হাব্সি কন্যাও ছিল পাঁচ পাঁচ হাজার।

বিরূপাক্ষ বললেন : গাইডের কাছে শুনেছি এই গল্প।

শুনেছেন তো?

বলে শুক্লা আমার মুখের দিকে তাকাতেই বিরূপাক্ষ বললেন : উৎসবের দিনে সুলতান যখন সিংহাসনে বসতেন, তখন পাঁচশো ফর্সা তুর্কী মেয়ে পুরুষের পোশাকে তরোয়াল হাতে দাঁড়াত সুলতানের ডান দিকে, আর বাঁ দিকে তেমনি করেই দাঁড়াত পাঁচশো কালো হাব্সি মেয়ে।

বললুম : ভারি চমৎকার আইডিয়া। একে মেয়েদের সাজানো হয়েছে পুরুষ সেনা, তার ওপর এক দিকে সাদা ও অন্য দিকে কালো। সুলতানের মেজাজ ছিল বাদশাহের মতো।

শুক্লা বলল : কিন্তু শুনে আশ্চর্য হবেন যে এই ঘিয়াসউদ্দীন খুবই ধার্মিক ছিলেন। প্রহরে প্রহরে নমাজ পড়তেন, আর সুরা নাকি কোন দিন স্পর্শ করেন নি।

আমি অত্যন্ত মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম : তবে এত বেগম রেখেছিলেন কেন?

শুক্লা একটু লজ্জিত হল। কিন্তু উত্তর দিল সংযত ভাবে, বলল : এই একটিই তাঁর দুর্বলতা ছিল। আশি বছর বয়সেও তিনি নবীন যুবার মতো ভোগে ও বিলাসে ডুবে ছিলেন।

তারপরেই শুক্লার দৃষ্টিতে অকরুণ ঘৃণা উঠল ফুটে। আমি ভয় পেলুম সেই দৃষ্টি দেখে। কিন্তু কোন প্রশ্ন করবার আগেই দেখলুম যে আমরা জাহাজ মহলের বাহিরের রাস্তায় পৌঁছে গেছি। যে চওড়া সিঁড়িটা ধাপে ধাপে ছাদের উপরে পৌঁছে গেছে, তার পাশ দিয়ে আমরা বেরিয়ে এসেছি। গাইড জিজ্ঞাসা করল : উপরে যাবেন না?

বিরূপাক্ষ বললেন : না।

আমার মনে হল যে শুক্লাও বোধহয় কপূরতালাও দেখবার কথা ভুলে গেছে। পকেট থেকে একটা আধুলি বার করে আমি গাইডের হাতে দিয়ে বললুম: আমাদের আর গাইডের দরকার নেই।

সে বোধহয় নিজেও বুঝতে পেরেছিল যে শুক্লা থাকতে তার আর কোন প্রয়োজন নেই। তাই নিঃশব্দেই বিদায় নিল।

তাবেলি মহলকে বাঁ হাতে রেখে আমরা গ্রামের দিকে এগোলুম। সকালের রৌদ্র এখন বেশ প্রখর হয়েছে। কিন্তু এ রৌদ্রে পথ চলার কষ্ট নেই। শুক্লাও কথা কইছিল না দেখে আমি বললুম: কোন নিষ্ঠুর গল্প বোধহয় তোমার মনে পড়েছে।

শুক্লা চমকে উঠে বলল: কী করে বুঝলেন?

বললুম: তোমার দৃষ্টি দেখে।

শুক্লা মেনে নিল আমার কথা, বলল: ঠিকই ধরেছেন। সত্যিই আমার একটি নিষ্ঠুর গল্পের কথা মনে পড়েছে। সে গল্প আপনাদের ভাল লাগবে না।

বললুম: ইতিহাসের গল্প তো, ভাল না লাগলেও শুনতে হবে।

শুক্লা একটু ইতস্তত করে বলল: বিলাসের সঙ্গে নিষ্ঠুরতা থাকে পাশাপাশি। প্রেমের সঙ্গে যেমন ক্ষমা ও ভক্তির সঙ্গে ত্যাগ, তেমনি ভোগবিলাসের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ও হত্যার ইতিহাস।

বলে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আমি বললুম: তোমার গল্পটা এইবারে বল।

শুক্লা বলল: ধার্মিক গিয়াসউদ্দীনের পুত্র নাসিরউদ্দীনের গল্প। বুড়ো বয়সেও বাপকে ভোগ বিলাসে ডুবে থাকতে দেখে তার ঈর্ষার অন্ত নেই। পরপর দুবার বিষ দিয়ে বিফল হয়েছিলেন, কৃতকার্য হলেন তৃতীয় বারে। কিন্তু সেকালের সমাজ তাকে ধিক্কার দিল। উত্তর কালে শের খাঁর মতো নিষ্ঠুর মানুষ এসে নাসিরের কবরের

উপরে পদাঘাত করেছিলেন। জাহাঙ্গীর বাদশাহও বোধহয় তাই করেছিলেন। বাদশাহ তাঁর ঘৃণার কথা নিজের আত্মজীবনীতে বড় তীব্র ভাষায় লিখে রেখে গেছেন।

শুক্লা একটু থেমে বলল: নাসিরের মৃত্যুটাও স্বাভাবিক নয়। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল অপঘাতে।

কী রকম?

বলে আমি তার দিকে তাকালুম।

শুক্লা বলল: মত্ত অবস্থায় এক দিন তিনি জাহাজ মহলের হামামে পড়ে গিয়েছিলেন। যে মেয়েরা তাঁকে জল থেকে তুলে বাঁচিয়ে ছিল, তিনি তাদের হত্যা করেছিলেন।

কেন?

কে জানে!

ভারি আশ্চর্য কথা তো!

আশ্চর্যের কথা বলেই বোধহয় সবাই জেনে গিয়েছিল এই কথা। তাই দ্বিতীয় বারে যখন উজ্জয়িনীর কালিয়াদহ প্রাসাদে এই রকমের ঘটনা ঘটেছিল, তখন আর কেউ তাঁকে বাঁচাবার জন্যে এগিয়ে যায় নি। কেউ টেনেও তোলে নি তাঁকে। অপঘাতেই মৃত্যু হয়েছিল পিতৃহন্তা নাসিরউদ্দীনের!

ইতিহাসে এ রকম দৃষ্টান্তের অভাব বোধহয় নেই। শুধু রাজা কেন, সাধারণ মানুষের সমাজেও এ রকম ঘটনা ঘটেছে। খবরের কাগজেও যে সব খবর ছাপা হচ্ছে। মানুষের ঘরে যে শিশু জন্মায় সে পুরোপুরি মানুষ হয়ে জন্মায় কিনা সে বিষয়ে সংশয় জেগেছে। মানুষের শিশুর মানুষ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই শিশু বড় হলে ব্যতিক্রমও দেখা যাচ্ছে। সে মানুষ করার দোষেও হতে পারে। দায়িত্বটা বোধহয় পিতামাতারই বেশি। নিজেরা মানুষ না হলে সন্তানের মানুষ হবার আশা কম। ব্যক্তির উপরে সমাজের প্রভাব আরও বেশি। পশুকে মানুষ করা যায় না সত্যি, কিন্তু মানুষকে

পণ্ড করতে কিছুমাত্র সময় লাগে না। এই সমাজকে গড়বার চেষ্টা কি কেউ করেছেন!

আমরা তখন হোসঙ্গ শাহর সমাধির দিকে চলেছি। পথের ডান দিকেই এই সমাধি। তারপরেই জামা মসজিদ। জামা মসজিদের প্রধান প্রবেশ পথ অন্য রাস্তার উপর। আমাদের বাস বোধহয় সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে। তিন মাথার রাস্তা সেটা। দিল্লী গেট থেকে তুটো পথ এসে এইখানেই মিলেছে। আর একটা পথ চলে গেছে রেবাকুণ্ডের দিকে। দূর থেকেই আমরা তা বুঝতে পারছিলুম।

চলতে চলতেই আমি শুক্লাকে বললুম: ইতিহাসের গল্পের পরে তুমি আর একটা কী গল্প শোনাবে বলেছিলে!

শুক্লার বোধহয় মনে পড়ে গেল সেই কথা। দৃষ্টি সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল: জাহাজ মহলে আপনি পাথরের জাফরি দেওয়া বারান্দা দেখেছেন?

বললুম: লক্ষ্য করি নি।

শুক্লা বলল: মুঞ্জতালাওএর ধারে খুব সুন্দর এই অলিন্দটি।

তারপরেই প্রশ্ন করল: জাহাঙ্গীর বাদশাহর কথা আপনার মনে আছে! ভারি শৌখীন ছিলেন তিনি, তাঁর বেগম নূরজাহান ছিলেন আরও বেশি শৌখীন। তাঁরা মাণ্ডুতে এসে অনেক দিন ছিলেন এই জাহাজ মহলে।

সত্যি নাকি!

শুক্লা বলল: মাণ্ডুর শেষ সুলতান হলেন বাজবাহাতুর। তাঁর পরে গুজরাতের বাহাতুর শাহ এই তুর্গ অধিকার করেন। সে বোধহয় ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। আর দিল্লীর বাদশাহ আকবর এই তুর্গ অধিকার করেন ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। আকবর বোধহয় নিজে এখানে আসেন নি, পাঠিয়েছিলেন জাহাঙ্গীরকে। বিজয় ঘোষণা করতে জলুস বেরিয়েছিল পাঁচশো হাতির। এরই মধ্যে ছিলেন

ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌সের অ্যাম্বাসাডার সার টমাস রো। তিনি লিখেছেন যে মাণ্ডুতে তখন সিংহ ছিল। সাহেবের জিনিসপত্র যে সব ঘোড়ার উপরে আসছিল, তার একটিকে সিংহ খেয়ে ফেলেছিল।

আশ্চর্য হয়ে মিনতি বললেন: তাহলে মানুষ বাস করত কী করে?

শুক্লা বলল: সে বোধহয় পাহাড়ে উঠবার সময়ে।

আমি বললুম: অনেক দিন পরিত্যক্ত থাকার জন্যেও বোধহয় এমন হয়ে থাকবে। কিছু দিন আগেও তো শুনেছি বাঘের উপদ্রব ছিল মাণ্ডুতে।

শুক্লা বলল: এখনও বোধহয় আছে।

এ কথা শুনেই অভিমন্যু মায়ের কাছে ঘেঁষে চলতে লাগল। তার পরে আমার দিকে ফিরে বলল: দিনের বেলায় বাঘ বেরোয় মামা?

বললুম: দিনের বেলা বেরোবে কি! আমাদের সঙ্গে অভিমন্যু আছে না, অভিমন্যুর নাম শুনলেই ভয়ে পালিয়ে যাবে।

কিন্তু এ কথায় সে সাহস পেল না।

আমি যত দূর জানি, এই পাহাড়ে ও বনে বাঘ এখনও আছে। অন্ধকার হবার আগেই গ্রামবাসীরা নিজেদের আস্তানায় ফিরে যায়। পরিত্যক্ত দুর্গ তো! কোথায় কী আছে কে জানে!

শুক্লাকে আমি আবার তার গল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দিলুম। বললুম: তুমি জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের কথা বলছিলে।

শুক্লা লজ্জিত হয়ে বলল: হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

কিন্তু বাধা দিয়ে আমি বললুম: একটা কথা ভুল হচ্ছে বলে মনে হয়। আকবর বাদশাহ যখন দুর্গ জয় করেছিলেন, তখন হয় তো জাহাঙ্গীর এসেছিলেন, কিন্তু নূরজাহান সঙ্গে ছিলেন না। ইতিহাস আমার যত দূর মনে পড়ে, জাহাঙ্গীর নূরজাহানকে বিয়ে করেছিলেন বাদশাহ হবার পরে।

শুক্লা বলল : তা হবে। তাহলে এ ঘটনা পরেই ঘটেছিল। মানে জাহাঙ্গীর যখন নূরজাহানকে নিয়ে মুঞ্জতালাওএর দিকে একটা অলিন্দে বসেছিলেন, তখন দেখলেন যে আকাশের চাঁদ আর তারার আলোয় মুঞ্জতালাওএর এক অপরূপ রূপ হয়েছে। নূরজাহানের শখ হল, এক দিন দেওয়ালির মতো আলো জ্বালা হোক এই জাহাজ মহল ও আশে পাশের সব মহলে। মুঞ্জতালাওএ তার ছায়া কেমন দেখা যায় তাই দেখবেন তিনি।

বাদশাহী শখ। আলো জ্বলল চারি দিকে। কপূরতালাও ও মুঞ্জতালাওএর চারি দিকে যত মহল ছিল সর্বত্র বাতি জ্বলল। মাণ্ডুর সকল লোক আশ্চর্য হয়ে দেখল, কোন্‌টা আকাশ আর কোন্‌টা তালাও তা আর বোঝা যাচ্ছে না।

শুক্লার দৃষ্টি আমি আচ্ছন্ন দেখলুম। এক বিস্মৃত সন্ধ্যার বাদশাহী মহ্‌ফিলের স্বপ্ন দেখছে রৌদ্রতপ্ত পথ চলতে চলতে।

হোসঙ্গ শাহর সমাধির কাছে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলুম।

শুক্লা বলল : এই মাণ্ডুকে জাহাঙ্গীর বাদশাহ বলেছিলেন, সিটি অব জয়, আনন্দের শহর। বলেছিলেন, বর্ষাকালে এমন সুন্দর শহর আমি আর দেখি নি। তখন এর যেমন আরামের আবহাওয়া, তেমনি সুন্দর দৃশ্য। সাত মাস এখানে থেকে তিনি এই দুর্গের অনেক উন্নতি করে গিয়েছিলেন।

কিন্তু এখন তো বর্ষা নয়, এখন সব শুষ্ক ও রুক্ষ দেখছি। আবহাওয়াও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিরূপাক্ষ তাই তাড়া দিয়ে বললেন : একটু তাড়াতাড়ি হাঁটুন, আরও অনেক কিছু দেখবার আছে।

মিনতির চোখেও আমি এই আবেদন দেখলুম। তিনি বোধ-হয় অভিমন্যুর জন্যেই ব্যস্ত হয়েছেন। আমি তাই শুক্লাকে তাড়া দিয়ে বললুম : এইবারে আমাদের একটু পা চালিয়ে দেখতে হবে।

নিঃশব্দে শুক্লা আমাকে সমর্থন করল।

১২

উত্তর থেকে আমরা দক্ষিণে এগোচ্ছিলুম। পথের পশ্চিম দিকেই হোসঙ্গ শাহর সমাধি। এই ধারেই ভিতরে যাবার গেট, কিন্তু সমাধির প্রবেশ পথ এ ধারে নয়। সে পথ পূর্ব দিকে। তার মানে, সমাধি সৌধটি ঘুরে অন্য ধারে যেতে হবে।

বিরূপাক্ষ কোন কথা না বলে এগিয়ে গিয়েছিলেন। মিনতিও অভিমন্যুকে নিয়ে ভিতরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পথের উপরে এই সমাধির পরিচয় ফলক দেখে আমি দাঁড়িয়ে গেলুম। কালো ফলকের উপরে সাদা অক্ষরে আরও অনেক কিছু লেখা আছে দেখেই আমি থেমে পড়লুম।

শুক্লা আমার পাশেই ছিল। বলল: হঠাৎ থেমে পড়লেন যে!

তার আশ্চর্য হবারই কথা। একটু আগেই আমি তাকে তাড়া দিয়ে বলেছিলুম যে আমাদের পা চালিয়ে সব দেখে নিতে হবে। কিন্তু এখন আমি নিজেই দাঁড়িয়ে পড়েছি। তাই একটু সঙ্কুচিত ভাবে জবাব দিলুম: এই ফলকটায় কী লেখা আছে, তাই দেখে নিচ্ছি। তুমি বরং ভিতরটা তাড়াতাড়ি দেখে নাও।

শুক্লা বলল: এক সঙ্গেই দেখব।

ততক্ষণে আমার সেই ফলকটা পড়া হয়ে গেছে। বললুম: কী আশ্চর্য কথা দেখ।

শুক্লারও বিস্ময়ের সীমা রইল না। ফলকের উপরে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে: The architect of Shajahan such as Ustad Hamid associated with the Tajmahal came to pay homage at the Tomb of Hoshang Shah in 1659 A.D.

আমাদের কাছে এ একেবারে নতুন কথা। দুজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অভিমন্যু আমাদের কাছে ছুটে এল। বলল: এখানে কী দেখছ মামা?

আমি আর দেরি করলুম না। তার হাত ধরে এগিয়ে বললুম: একটা মজার কথা লেখা আছে দেখলুম।

কী কথা?

বলে সে আমার মুখের দিকে তাকাল।

মিনতি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর কাছে পৌঁছে বললুম: এই হোসঙ্গ শাহের সমাধিটা ভাল করে দেখবেন।

মিনতি বোধহয় একটু আশ্চর্য হলেন এই কথা শুনে, বললেন: কেন বলুন তো!

বললুম: তাজমহলের সঙ্গে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে।

মিনতি এবারে আরও আশ্চর্য হলেন।

হোসঙ্গ শাহের সমাধির এই প্রাঙ্গণটি বেশ অযত্নেই পড়ে আছে, বড় বড় ঘাস গজিয়েছে চারি ধারে। শুধু রাস্তাটি পরিষ্কার আছে। আমরা সেই পথেই ঘুরে সামনের দিকে যাচ্ছিলুম। বললুম: তাজমহল তৈরির আগে শাহজাহান বাদশাহ তাঁর ইঞ্জিনিয়ারদের এই সমাধিটি দেখতে পাঠিয়েছিলেন।

সত্যি!

বললুম: সামনে এই কথাই লেখা আছে। ওস্তাদ হামিদ প্রভৃতি যে শিল্পীরা তাজমহল তৈরি করেছিলেন, ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা এই সমাধিতে প্রণাম জানাতে এসেছিলেন। এর থেকেই প্রমাণ হচ্ছে না কি যে হোসঙ্গ শাহর সমাধি সে যুগে এমন একটি বস্তু ছিল যা দেখবার জন্যে তাজমহলের শিল্পীদেরও এখানে আসতে হয়েছিল!

মিনতিকে আমি এই কথা বাঙলাতেই বলছিলুম, কিন্তু শুক্লা

উত্তর দিল : খুব খাঁটি কথা। তার পরেই বলল : কিন্তু এই গাইড বইএর কোথাও এ কথা লেখা নেই।

আমি বললুম : সরকারী গাইড বইএ কি সব কথা লেখা থাকে! সরকারী সব কাজই এই রকম।

বিরূপাক্ষ তখন সমাধির সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ব্যস্ত ভাবে বললেন : একটু তাড়াতাড়ি করুন মশাই। বেলা যে ভাবে বাড়ছে, তাতে আর বেশি দূর এগোনো যাবে না।

বলেই তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন।

এই সমাধিটি আমি বাহির থেকেই দেখলুম আগে। মস্ত একটি প্রাঙ্গণের ভিতরে খুব উঁচু ভিত, তার উপরে শ্বেত মর্মরের সমাধি সৌধ গম্ভীর এক ভাবের উদ্রেক করছে। প্রবেশের দ্বারটি খুব প্রশস্ত না হলেও এক সঙ্গে অনেক মানুষ পাশাপাশি উপরে উঠবার উপযোগী সিঁড়ি এই দরজা পর্যন্ত উঠেছে। এই দরজার দু পাশে আরও দুটি দ্বার আছে। কিন্তু তাতে পাথরের জালি। মানুষ ঢুকতে পারবে না, ঢুকবে শুধু আলো আর বাতাস। এত বড় সৌধের ভিতরে আলো বাতাস যাবার মতো আর কোন দরজা জানলা আমার চোখে পড়ল না।

এই চতুষ্কোণ সমাধির উপরে একটি বিরাট গম্বুজ। কিন্তু তার উচ্চতার চেয়ে ব্যাস অনেক বেশি। আর এই গম্বুজের চারি ধারে বেঁটে বেঁটে চারটি মিনার, তার উপরেও ছোট ছোট গম্বুজ। কিন্তু এই গম্বুজগুলি মূল গম্বুজটিকে ছাড়িয়ে উপরে ওঠে নি। এই সব গম্বুজের মাথায় হিন্দু মন্দিরের মতো ছোট ছোট চূড়া আছে এক একটি, কিন্তু ত্রিশূল বা পতাকা নেই কোন।

গম্বুজগুলির নিচে চারি ধার ঘিরে কিছু কারুকার্য আছে। অর্ধস্ফুট পদ্ম বলেই মনে হল। পদ্ম হিন্দু স্থাপত্যের প্রতীক। পাঠান যুগের নৃপতিরা হিন্দু স্থাপত্যকে একেবারে বর্জন করতে পারে নি। কোথাও বা তারা মন্দিরের কারুকার্যময় পাথর এনেই

নিজেদের মসজিদ বা প্রাসাদে ব্যবহার করেছে। এখানে তা মনে হল না, এখানে এরা হিন্দু অলঙ্করণকেই হয়তো কিছুটা অনুকরণ করেছে।

তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে আমরা ভিতরটাও এক নজরে দেখে নিলুম। গম্বুজের গঠনরীতিটিও লক্ষ্য করবার মতো। নিচে চতুষ্কোণ, তার উপরে আট ও সব শেষে ষোল কোণ।

বাহিরে বেরিয়ে বিরূপাক্ষ প্রশ্ন করলেন: একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন?

কী বলুন তো?

বিরূপাক্ষ গম্ভীর ভাবে বললেন: এত বড় একটা সমাধি, অথচ অলঙ্কারের কোন বাহুল্য এখানে দর্শকের পীড়া উৎপাদন করছে না।

মিনতি একটু হাসলেন। আর এই হাসি দেখে চটে উঠলেন বিরূপাক্ষ। বললেন: হাসির কথা কী বললাম?

মিনতি আমার দিকে চেয়ে বললেন: ওঁর ভাষা শুনলেন তো! মাঝে মাঝে এমনি বইএর ভাষায় উনি কথা বলেন।

বিরূপাক্ষ হা হা করে হেসে উঠলেন। বললেন: তাই বল। বাঙলা ভাষা এক সময় ভালই শিখেছিলুম। ভেবো না যে সারা দিন আপ আর ডাউন করে নিজের মাতৃভাষা একেবারে ভুলে গেছি।

শুক্লা এই রহস্যের কিছুই বুঝতে পারে নি। সে বোধহয় হোসঙ্গ শাহর কথাই ভাবছিল। বলল: এই মাণ্ডু দুর্গের জন্য সবটুকু কৃতিত্বই এই হোসঙ্গ শাহরই প্রাপ্য।

বিরূপাক্ষ নিজের খুশিতে একটা সিগারেট ধরাচ্ছিলেন। সেটা ধরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: কী রকম?

হোসঙ্গ শাহর কথা শুক্লা আমাকে আগেই বলেছিল, কিন্তু বিরূপাক্ষ সে কথা শোনেন নি। তাই বলল: মালবের প্রথম সুলতান দিলাওয়ার খানের পুত্র এই হোসঙ্গ শাহ সুলতান হয়ে নাম নিয়েছিলেন হোসঙ্গ শাহ ঘোরি। ১৪০৫ থেকে ১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সগৌরবে রাজত্ব করেছিলেন; কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব যুদ্ধ ক্ষেত্রেই

সীমাবদ্ধ ছিল না। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তা বিস্তৃত হয়েছিল। স্বাধীন সুলতানকে সমতল ভূমির রাজধানী ধারায় সারাক্ষণ শঙ্কিত থাকতে হত বলে এই পর্বত দুর্গে নিয়ে এলেন রাজধানী। এই সমাধি সুলতান হোসঙ্গ শাহরই শিল্প প্রীতির পরিচয় দিচ্ছে।

কথা বলতে বলতেই আমরা বেরিয়ে আসছিলুম। অভিমন্যু হঠাৎ বলে উঠল: এই বাড়িটা বুঝি হোসঙ্গ শাহের তৈরি?

মিনতি বললেন: তা কী করে হবে! এটা তো তাঁর সমাধি, হোসঙ্গ শাহকে এইখানে কবর দেওয়া হয়েছিল।

শুক্লা কী বুঝল সেই জানে, বলল: হোসঙ্গ শাহই তাঁর সমাধি নির্মাণ শুরু করেন, আর শেষ হয় তাঁর পুত্র মুহম্মদ শাহ ঘোরির আমলে।

মুসলমান ইতিহাসে এই রীতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক বাদশাহ ও সুলতান তাঁদের নিজেদের সমাধির ব্যবস্থা নিজেরাই করে গিয়েছিলেন। আরও প্রাচীন কালে সভ্যতার প্রথম যুগেও মিশরে এই রীতির আদর ছিল। নিজেদের সমাধির জন্য রাজারা পিরামিড নির্মাণ করতেন, ঐশ্বর্য আর বিলাসের সামগ্রীতে পরিপূর্ণ করে দিতেন ভিতরের প্রকোষ্ঠগুলি। তাঁদের আদর্শে ছিল না আত্মার মুক্তি।

হোসঙ্গ শাহর কবর থেকে বেরিয়ে আমরা জামি মসজিদের দিকে এগিয়ে চললুম। পাশেই একটি পথ দিয়ে এই মসজিদে প্রবেশ করা যায়। দু একজনকে আমরা এই পথে প্রবেশ করতেও দেখলুম। কিন্তু বিরূপাক্ষ এই পথে ভিতরে ঢুকতে রাজী হলেন না, বললেন: আমরা সামনে দিয়েই ঢুকব।

এই পথের ধারে মসজিদের কোন ভাল প্রবেশ পথ নেই। কিন্তু মসজিদটা যে বৃহৎ তা পাশ দিয়ে যেতে যেতেই বোঝা যাচ্ছে। মোড়ের কাছ পৌঁছতে আমাদের বেশি সময় লাগল না। এখানেই পথের ধারে কয়েকটা দোকান দেখতে পেলুম। হোটেল আছে

বলেও মনে হল। ডান ধারে তাকিয়ে দেখতে পেলুম যে আমাদের বাসটি মসজিদ সংলগ্ন ছায়ায় অপেক্ষা করছে। সেখানে আরও কয়েকটি বাস আছে। লোকজনও ঘোরা ফেরা করছে। হোটেলেও অনেককে নানা রকমের কাজে ব্যস্ত দেখছি।

মিনতি এইখানে দাঁড়িয়ে বললেন : এইবারে ক্ষান্ত দাও। খোকার কষ্ট হচ্ছে।

অভিমন্যু মহা আপত্তি জানিয়ে বলল : একটুও কষ্ট হচ্ছে না।

বলে আমার কাছে চলে এল।

আমি থমকে দাঁড়ালুম।

মিনতি বললেন : নতুন জিনিস দেখবার নামে ক্ষিধে তেষ্টার কথা ও ভুলে যায়।

আমি বললুম : আমরাও যাই।

বিরূপাক্ষ বললেন : মেয়েরা ভোলে না। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কষ্টের কথা মেয়েদেরই আগে মনে পড়ে।

সে তোমাদের জন্যেই।

বলে মিনতি হাসলেন।

বিরূপাক্ষও হেসে বললেন : থাক, তাহলে তর্ক করে লাভ নেই।

শুক্লার হাতে ঘড়ি ছিল না। আমাকে জিজ্ঞাসা করল : বেলা এখন কত হয়েছে ?

বললুম : বারোটা বাজে নি।

শুক্লা বলল : তাহলে এক কাজ করা যাক।

বল।

সামনের এই হোটেলে খাবার অর্ডার দিয়ে জামা মসজিদ আর আসরফি মহলটা দেখে নেওয়া যাক। তারপর খেয়ে দেয়ে আমরা বসে বিশ্রাম করব।

বিরূপাক্ষ বললেন : আসরফি মহল আবার কোথায় ?

শুক্লা বলল : জামা মসজিদের সামনেই। একটু এগিয়ে গেলেই

দেখতে পাবেন। এই এলাকায় আর কোন দ্রষ্টব্য জায়গা নেই।

মিনতি বললেন : সেই ভাল। খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করতেই ভাল লাগবে। বাসে বসেই আমরা যাব।

বললুম : গরম ভাত যদি পাওয়া যায় তো শুকনো পাঁউরুটি খাই কেন! একটু অপেক্ষা করুন না, দেখে আসি হোটেলের ভেতরটা।

বলে শুক্লার সঙ্গে আমি হোটেলে ঢুকে গেলুম। হোটেল বললে ভুল হবে। একটা চালা ঘরের নিচে কয়েকটা টেবল ও বেঞ্চ আছে। আর ভাত ডাল তরকারীর ব্যবস্থাও আছে। দইও পাওয়া যায়। দাম এমন কিছু বেশি নয়। শুক্লা রুটি খায় শুনে বলল, তাও দিতে পারব। অর্ধেক ভাত আর অর্ধেক রুটি। দইএর দাম আলাদা।

বিরূপাক্ষ এ কথা শুনে বললেন : তবে আমাদের পাঁউরুটি রাতের জন্যেই তোলা থাক। কিংবা বিকেলে যদি খেতে ইচ্ছে করে—

মিনতি বললেন : বিকেলেই খেয়ে নিও।

কাজেই হোটেলে আমরা খাবার অর্ডার দিয়ে জামি মসজিদ দেখতে এগোলুম। দীর্ঘ দিন ধরে এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। সুলতান হোসঙ্গ শাহ বোধহয় দামাস্কাসের বিখ্যাত মসজিদের কথা শুনেছিলেন। সেই আদর্শে এর নির্মাণ শুরু হয়েছিল তাঁরই আমলে। তাঁর পুত্রের আমলেও শেষ হয় নি। শেষ হয়েছিল ১৪৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ শাহ খিলজীর আমলে। বিরাট মসজিদ। কিন্তু এক ধারটা তার ভেঙে পড়েছে। রাস্তা থেকে গোটা ত্রিশেক সিঁড়ি ভেঙে মসজিদের সামনে পৌঁছনো গেল। সামনে কোন অলঙ্কারের আড়ম্বর নেই। মর্মরের জালি আর রঙ্গীন টালির কাজ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রার্থনার কক্ষ থেকে প্রাঙ্গণের দিকে তাকালে আশ্চর্য হতে হয়। একটা খিলানের শ্রেণী সুদূর প্রসারিত, আর অগণিত স্তম্ভ।

ছাদের উপরে গম্বুজ দেখলুম অনেকগুলো। তিনটি বড়। অভিমন্যু ছোট গম্বুজগুলি গুনছিল। গোনা শেষ করে বলল: আটান্নটি ছোট।

এই মসজিদের সামনেই আসরফি মহল। আসরফি মানে সোনার মোহর। একটা স্কুল ছিল, নির্মাণ করেছিলেন মুহম্মদ খিলজী। পরে তাঁরই সমাধিতে পরিণত হয়েছিল।

এই মহলের সামনেই সুলতান সাততলা জয়স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন দেড়শো ফুট উঁচু। দেশের লোক জেনেছিল যে সুলতান মেবারের রাণা কুম্ভকে জয় করে ফিরেছেন। এ কথা রাষ্ট্র করার সুযোগ রাণা কুম্ভই তাঁকে দিয়েছিলেন। চিতোরে যখন রাণা কুম্ভ রাজপুত শক্তি সুসংহত করছেন, তখন গুজরাত ও মাণ্ডুর সুলতান সম্মিলিত ভাবে তাঁকে আক্রমণ করলেন। যুদ্ধ হল মালবের উপত্যকায়। বীর রাণা বিজয়ী হলেন, কিন্তু সুলতানদের প্রাণ বধ করলেন না। তাঁদের মুক্তি দিয়ে যে উদারতা দেখিয়েছিলেন, মুহম্মদ শাহ তারই সুযোগ নিলেন। চিতোরের জয়স্তম্ভের মতো মাণ্ডুতেও জয়স্তম্ভ উঠল। চিতোরের জয়স্তম্ভ আজও সগৌরবে তাঁর বিজয় ঘোষণা করছে, মাণ্ডুর জয়স্তম্ভ হয়েছে ধূলিসাৎ। মিথ্যার এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যুগে যুগে এই সত্যকে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করছে।

আসরফি মহল আমরা নিচে দাঁড়িয়েই দেখলুম। সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে দেখবার মতো ইচ্ছে আর ছিল না। কিইবা আছে দেখবার! সবই তো ভেঙে পড়েছে। এই মহলের দেওয়ালগুলি নাকি সাদা হলদে আর কালো মার্বল পাথরে তৈরি ছিল। কিন্তু অযোগ্য স্থপতিরা এমন তাড়াহুড়ো করে এই মহল আর জয়স্তম্ভ নির্মাণ করেছিল যে সুলতানের মৃত্যুর অল্প দিন পরেই তা ভেঙে পড়েছিল।

মিনতি বিরূপাক্ষকে বললেন: দাঁড়িয়ে আর দেখবে কী! এবারে খেতে চল।

সত্যিই ক্ষিধে পেয়ে গিয়েছিল। পথের দূরত্ব বেশি না হলেও অনেকক্ষণ ধরে হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে। হেঁটেই এখানে সব কিছু দেখতে হয়। অন্য কোন যানবাহন নেই। বাস এসে দাঁড়ায় এই দোকানগুলির সামনে, এখান থেকেই ছেড়ে চলে যায়। যারা ইন্দোর থেকে সরাসরি এখানে আসে, তাদের রাত্রিবাস করতেই হয়। রাত্রিবাসের জন্য সরকারী রেস্ট হাউসই একমাত্র জায়গা। তারপর সকাল থেকে পায়ে হেঁটে সমস্ত দর্শনীয় স্থান দেখে দুপুরের বাসে ফিরতে হয় ইন্দোরে। রয়াল এনক্লেভ্ আর এই ভিলেজ গ্রুপ দেখবার জন্যে যানবাহনের দরকার নেই। কিন্তু রেবাকুণ্ডের দূরত্ব মাইল দুয়ের কম নয়। নীলকণ্ঠ মহাদেবও দূরে। পথে দেখা যাবে হাতি মহল দরিয়া খানের কবর চিস্তি খানের প্রাসাদ গদা শাহের প্রাসাদ ও আরও অনেক দর্শনীয় স্থান।

গদা শাহর গল্প আমি শুক্লার মুখেই শুনলুম। মেদিনী রায় নামে একজন রাজপুত বিশিষ্ট সভাসদ ছিলেন দ্বিতীয় মুহম্মদ শাহ খিলজীর। তাঁকেই লোকে উপহাস করে গদা শাহ বলত। দিনে দিনে তিনি এমন ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলেন যে সুলতান আত্মরক্ষার জন্যে গুজরাতের সুলতানের শরণ নিয়েছিলেন। এবং তাঁরই সাহায্যে দমন করেছিলেন মেদিনী রায়কে। এই গদা শাহের একটি দর্শনীয় প্রাসাদ ছিল। এখন তা ভেঙে পড়েছে।

হোটেলে এসে আর আমরা দেরি করলুম না। হাত ধুয়েই খেতে বসে গেলুম। শুধু বিরূপাক্ষ একটু বিরক্ত ভাবে বললেন: শুধু শুধু আমাকে এই বোঝা বইতে হল।

বলে হাতের বাস্কেটটি টেবিলের উপরেই রাখলেন।

মিনতি বললেন: এবারে আমি বইব।

বিরূপাক্ষ বললেন: তার দরকার নেই। যাবার আগেই ওটাকে খালি করে ফেলতে হবে।

শুক্লাও আমাদের সঙ্গে খেতে বসেছিল। আমি বললুম: তোমার বন্ধু বান্ধবেরা রাগ করবে না তো!

শুক্লা বলল: রাগ করলে কী করব বলুন!

জিজ্ঞাসা করলুম: ওরা খাচ্ছে কোথায়?

শুক্লা বলল: নিরামিষ আহার ওদের পছন্দ নয়। ওরা নিশ্চয়ই ওদের পছন্দ মতো জায়গা খুঁজে বার করেছে।

হোটেলের একটি ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করেই খবর পাওয়া গেল যে ওধারে কোন একটা জায়গায় অনেক মুরগি কাটা হয়েছে। সকালে এসেই তারা অর্ডার দিয়েছিল।

শুক্লা নিশ্চিন্ত হল এই কথা শুনে, বলল: আমার কথা কেউ তাহলে ভাবছে না।

কেউ না?

আমি না, মিনতি এই প্রশ্ন করলেন শুক্লাকে।

শুক্লা কিছু লজ্জা পেয়ে বলল: আমি ওদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারি না।

তারপরেই বলল: দোষ আমারই। কেন জানি না, আমি ওদের এড়িয়ে চলতে ভালবাসি।

খেতে খেতে আমি শুক্লার কথাই ভাবছিলুম। অত্যন্ত সাদা-সিধে সরল ছেলে এই শুক্লা। অন্য ছেলেদের মতো নানা রঙের প্যান্টের উপর ঝকঝকে বুশশার্ট পরে নি। পরেছে খদ্দরের পাজামার উপরে খদ্দরের সার্ট। পায়ে চটি জুতো। এই দলে কয়েকটি মেয়েও ছিল। তাদের দিকে সে চোখ তুলেও তাকাতে পারে নি। এ একেবারে অন্য জাতের ছেলে, অন্য যুগের বলে মনে হয়।

আমি যে তার সম্বন্ধে কিছু ভাবছি, শুক্লা বোধহয় তা সন্দেহ করেছিল। বলল: আমি গ্রামের ছেলে। গ্রামের স্কুলেই পাস করে শহরের কলেজে এসেছি। থাকবার জায়গা নেই বলেই আছি

হস্টেলে। তাইতেই আমাকে ওদের সঙ্গে বেরোতে হয়, কিন্তু সমানে চলতে পারি না।

একটু থেমে বলল : কিন্তু তার জন্য আমার কোন ক্ষোভ নেই। ওরা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে বলেও আমি দুঃখ পাই না। ওদের চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ নিয়ে আমি ফিরি।

বললুম : সত্যিই তো, আমাদের চলার পথেই আনন্দ ছড়ানো আছে। যে চোখ মেলে চলে, সেই পায় আনন্দের আস্বাদ।

মাণ্ডুর পথে অনেক আনন্দ আমরা সংগ্রহ করেছি। আরও অনেক কিছু সংগ্রহ করতে বাকি আছে। খেয়ে দেয়ে সবাই ফিরে এলে আমরা বাসে বসে যাব রেবাকুণ্ডে, তারপরে নীলকণ্ঠ মহাদেব দেখে ইন্দোরে ফিরব।

১৩

বাসে আমাদের অনেকটা সময় বসে থাকতে হল। অল্প কয়েকটি ছেলে এসেছিল। বাকি দলটি আসছিল না। মাণ্ডু দেখার চেয়ে ফিস্টের উৎসাহই তাদের বেশি। কিন্তু শুক্লা মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিল। এক সময় আমাকে বলল: এখনও অনেক কিছু দেখবার আছে। অনেক সময় লাগবে দেখতে।

আমি বললুম: যা কিছু দেখবার আছে অন্ধকার হবার আগেই তা দেখে নিতে হবে।

শুক্লা হোটেলে বসে আরও খবর সংগ্রহ করেছিল। বলল: অন্ধকার হবার পরে এ জায়গা এখনও নিরাপদ নয়। চিতে বাঘ ও বাঘ আছে, হায়নাও বেরোয়। শেয়ালের সঙ্গে নাকি বাঘের ডাকও শোনা যায়।

তার পরে বলল: তবে একটা আনন্দের খবর পেলাম। মাণ্ডুতে নাকি একখানা টেম্পো এসেছে। ভাড়া পাওয়া যায়। যাত্রীরা বাসে এসেই এই টেম্পো ভাড়া করে রেবাকুণ্ডে চলে যায়। পাহাড়ের উপর রূপমতীর প্যাভিলিয়ন পর্যন্ত তো বাস ওঠে না, টেম্পোও ওঠে না। পাহাড়ের নিচে দাঁড়ায়, আর যাত্রীদের হেঁটে উঠতে হয় পাহাড়ে।

গম্ভীর ভাবে বলল: সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

সামনে থেকে বিরূপাক্ষ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন: পঁচাত্তরটা জায়গার মধ্যে কতগুলো জায়গা আমরা দেখেছি?

বললুম: তার হিসেব দেওয়া কঠিন ব্যাপার।

কেন?

বললুম: কোন্ গ্রুপে কতগুলো দ্রষ্টব্য স্থান আছে, গাইড বইএ তার হিসেব নেই।

তারপর শুক্লাকে বললুম: তোমার বইখানা একবার খুলে দেখবে? নক্সাটা দেখলে হয়তো কিছু বোঝা যাবে।

শুক্লা তার বই বার করতে একটুও দেরি করল না। কিন্তু নক্সাটি বার করে হতাশ হল। বলল: এতে তো কিছুই নেই দেখছি।

আমি দেখলুম, কথাটা মিথ্যা নয়। মাণ্ডুর যে নক্সা দেওয়া হয়েছে, তার উপরের কোণায় ভারতের মানচিত্র, তাতে মাণ্ডুর অবস্থান দেখানো আছে। মাঝখানে মধ্যপ্রদেশের মানচিত্র। উজ্জয়িনী ইন্দোর মাউ ধার আর মাণ্ডু দেখানো আছে তাতে। আর ডান দিকের একটি কোণায় স্বল্প পরিসরের মধ্যে মাণ্ডু দুর্গের নক্সা। উত্তরে জাহাজ মহল থেকে দক্ষিণে রূপমতীর প্যাভেলিয়ন পর্যন্ত পথ দেখানো আছে। এই পথের এক পাশে হোসঙ্গ শাহর কবর আর দক্ষিণে বাজবাহাদুরের প্রাসাদ। তা ছাড়া আর কোন দ্রষ্টব্য স্থানের নাম নেই। এই হল সরকারী গাইড বইএর নক্সা।

আমার একখানি অ্যামেরিকান গাইড বইএর কথা মনে পড়ল। ভারতবর্ষের গাইড বই। তাতে আমি মাণ্ডুর দুর্গের নক্সা দেখেছিলুম এক পাতা জোড়া। শুধু সমতল ভূমি নয়, পাহাড়ও দেখানো আছে। সমস্ত গেট আর সমস্ত দর্শনীয় স্থান নিখুঁত ভাবে দেখানো আছে। পথ ঘাটের হদিসও আছে। এবং সেই নক্সা হাতে করে কোন গাইড না নিয়েই সমস্ত মাণ্ডু দুর্গ দেখে নেওয়া সম্ভব। ইংরেজরাও এই রকম গাইড বই বার করেছে। তাদের যত্ন ও অধ্যবসায় দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। সে রকমের বই হাতে থাকলে আমাদের সরকারী বই ছুঁতেও ইচ্ছে করে না।

কিন্তু এ সব কে দেখছে, আর কে শুনছে যাত্রীদের কথা! টুরিস্ট ট্রাফিক বাড়াবার জন্যে সরকার হায় হায় করছেন। কিন্তু টুরিস্টদের সঙ্গে মেলামেশা করে কি তাদের সুখসুবিধার কথা জানবার চেষ্টা করছেন! সরকারী গাড়ি নিয়ে সরকারী

কর্মচারীরা আসবেন টুরিস্ট সেণ্টার দেখতে, কয়েকখানা ভাল ছবি তুলবেন। তারপর প্রচুর অর্থব্যয় করে পুস্তিকা ছাপবেন বিনা মূল্যে বিতরণের জন্যে। বিক্রয়ের জন্যে বইও ছাপবেন। কিন্তু টুরিস্টরা এই সব জায়গায় এসে কী ভাবে সব দেখবেন, তার কোন ইঙ্গিত নেই তাঁদের পুস্তিকায়। টুরিস্ট অফিসে খোঁজ করেও সঠিক-বিবরণ কেউ পান কিনা জানি না।

ধন্যবাদ দিতে হয় আর্কিওলজিকাল ডিপার্টমেণ্টকে। তাঁদের হাতে যা পড়েছে, তার নাম ও ঐতিহাসিক বিবরণ দ্রষ্টব্য স্থানের সামনেই একটা ফলকে লিখে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদেরও অর্থাভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে। সংরক্ষণের ব্যবস্থা সর্বত্র সমান নয়। যেখানে তাঁদের পয়সা আছে, সেখানে নিয়মিত মেরামতের কাজ চলেছে, পথ ঘাট উন্নত হয়েছে, ফুলের বাগান পরিবেশকে আরও সুন্দর করেছে।

মহাবলীপুরমের কথা আমার মনে পড়ল। সেখানে যা সব চেয়ে ভাল লেগেছিল, তা হল পথের ধারে শহরের নক্সা। কোথায় কোন্ দিকে কী দ্রষ্টব্য আছে, কোন্ পথে গেলে সেখানে পৌঁছনো যাবে, তার নক্সা দেওয়া আছে একাধিক পথের মোড়ে। কাজেই কোন গাইড বইএর দরকার নেই, দরকার নেই গাইডেরও। বাস স্ট্যাণ্ড থেকে নেমে যাত্রীরা নিজেরাই সেই নক্সা দেখে পথ বেছে নিতে পারবেন। মহাবলীপুরমও কিছু ছোট জায়গা নয়, মাণ্ডুর মতোই হবে। মহাবলীপুরমের বাজার এলাকা থেকে সপ্তরথ যত দূরে, এখানকার রেবাকুণ্ডের দূরত্ব তার চেয়ে বেশি হবে না। মহাবলীপুরমে পাহাড় আছে, এখানেও আছে। কিন্তু সেখানকার মতো সমুদ্র ও শোর টেম্পল এখানে নেই। সেখানকার মতো স্থাপত্যের সূক্ষ্ম কারুকার্যও নেই এখানে।

শুক্লার বন্ধু বান্ধবীদের ফিরতে দেরি হচ্ছিল বলে শুক্লা নিজেই লজ্জিত হয়ে উঠছিল। শেষ পর্যন্ত বাস থেকে নামবার জন্যে

উঠে দাঁড়াতেই দেখল যে দূরে তাদের আসতে দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে তাদের কলরব আমরা শুনতে পেলুম। কতকটা আশ্বস্ত হয়ে শুক্লা বসে পড়ল।

কাছে এলে ওদের কথাবার্তা শোনবার চেষ্টা করলুম।' যা ভেবেছিলুম, ঠিক তাই। মাণ্ডুর দর্শনীয় স্থান নিয়ে আলোচনা কেউ করছে না। তারা কথা বলছে রান্নার বিষয়ে। মাংসে একটু ঝাল বেশি হয়েছিল, আর পরিমাণ ছিল কম। একজন বলল: এইবারে ফিরতে হবে তো?

আর একজন বলল: না। আরও কিছু ঘুরে দেখবার আছে।

তৃতীয় একটি ছেলে বলল: পাহাড়েও নাকি উঠতে হবে।

পাহাড়ের ওপর পাহাড়!

তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে!

ছেলেদের অভিভাবক হয়ে যাঁরা এসেছেন তাঁরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। একটা বড় গাছের ছায়ায় ছোট একটি দোকানের মতো ছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁরা সিগারেট খাচ্ছিলেন। এবারে তা ফেলে দিয়ে বাসে এসে উঠলেন। ড্রাইভারও অপেক্ষা করছিল কাছে। অনুমতি পেতেই গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দক্ষিণ মুখো অগ্রসর হল।

রেবাকুণ্ড গ্রুপ দক্ষিণ দিকেই। কিন্তু এই পথের ধারে অনেক কিছুই দেখবার আছে। শুক্লার একটা মোটামুটি ধারণা ছিল। তাই থেকে বলল: ছোটখাট দ্রষ্টব্য স্থানগুলির সামনে আমাদের বাস বোধহয় দাঁড়াবে না। শুনেছি যে এক দিনের যাত্রীরা এ সব দেখে না, দেখা সম্ভবও নয়। আর এ সব জায়গার নামও সবাই জানে না। কোন্‌টা ছাপ্পান্ মহল আর বইহান্‌কা মহল কোন্‌টা, দাইকা মহল আর জালিকা মহলই কোথায়, হাতিমহল আর লালসরাই, দরিয়া খানের কবর আর মালিক মুঘিতের মসজিদ—এ সব চিনিয়ে না দিলে চেনবার উপায় নেই।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: তুমি তো অনেক নাম জানো দেখছি!

শুক্লা বলল: খোঁজ-খবর নিয়েই জেনেছি। যে পথ ধরে আমরা চলেছি, এ সব জায়গা এই পথের ধারেই। এ ছাড়াও এখানে আর একটা পথ আছে। ডান দিকে একটা সরোবর দেখা যাবে, তার নাম সাগরতালাও। বোধহয় তারই পাশ দিয়ে নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দিরে যেতে হয়। সেই পথের ধারে আছে একটি জৈন মন্দির একথাম্বা আর চোরকোট।

শুক্লা একটু হেসে বলল: মাণ্ডুতে দেখবার জায়গা এই শেষ নয়। এ ছাড়াও অনেক কিছু আছে।—লালকোট সুরজ তালাও চিস্তি খানের মহল উজলা বাউলি রাম মন্দির—

আমি হেসে বললুম: তুমি কি পঁচাত্তরটি জায়গার নাম মুখস্থ করেছ?

শুক্লা লজ্জা পেয়ে বলল: না। এগুলোই প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান। কিন্তু গাইড না নিলে এ সব দেখা অসম্ভব।

তারপর বলল: শুনেছি যে এখানে এক ভদ্রলোক প্রাইভেট গাইডের কাজ করতেন। তাঁর একটা বাড়ি আছে এখানে। বিদেশীরা এলে তাঁকে খুঁজে বার করে সঙ্গে নিয়ে ঘোরেন। মাণ্ডুর সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান তাঁর জানা আছে, প্রত্যেকটি জায়গার ইতিহাসও।

পথের ধারে একটা সরোবর দেখেই বুঝতে পারলুম যে এরই নাম সাগরতালাও। কিন্তু বাস এখানে দাঁড়াল না। আরও অনেকটা পথ এগিয়ে একটা পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে উপস্থিত হল। পথের ধারে একটা চতুষ্কোণ কুণ্ড, আর ডান ধারে একটু এগিয়েই একটা প্রাসাদ। ছেলেরা হৈ-হৈ করে উঠল: নামতে হবে নাকি!

অন্য কয়েকজন বলল: নামতে হবে বৈকি।

শুক্লা আমাকে বলল : এই হল রেবাকুণ্ড আর বাজবাহাদুরের প্রাসাদ। সামনের পথ ধরে পাহাড়ের উপরে উঠলে রূপমতীর প্যাভিলিয়ন। ট্যাক্সি হলে সোজা উপরে উঠে যেত।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমরাও নেমে পড়লুম।

রেবাকুণ্ডের ধারে একটা গাছের ছায়াতেই আমাদের বাস দাঁড়িয়েছিল। পথের ওপারে চেয়ে দেখলুম যে কুণ্ড বলতে আমরা যা বুঝি, এ তা নয়। এ একটা সরোবর, লাল পাথর দিয়ে তার চারিধার বাঁধানো দেখছি। এক সময় হয়তো একটা প্রাকৃতিক প্রস্রবণ ছিল, তাকে কেটে গভীর করে এই কুণ্ড তৈরি হয়েছে। সে কালে পবিত্র ছিল এই কুণ্ডের জল। সুলতান বাজবাহাদুরের প্রেয়সী রূপমতী এই কুণ্ডটি তৈরি করিয়েছিলেন কিনা, কে জানে।

কিন্তু কুণ্ডের দিকে না গিয়ে আমরা সামনে বাজবাহাদুরের প্রাসাদের দিকেই এগোলুম। গোটা চল্লিশেক সিঁড়ি উঠে প্রাসাদের সিংহদ্বার। তারপর বিরাট প্রাঙ্গণ। প্রাসাদের কক্ষগুলি এই প্রাঙ্গণের চারি ধার ঘিরে অবস্থিত। মাঝখানে স্নানের হামাম। রেবাকুণ্ড থেকেই এই প্রাসাদে জল আসত। চারি দিক ঘুরে সুলতানের উপযোগী কোন ঐশ্বর্যের বিজ্ঞাপন দেখলুম না। তার বদলে মনে হল, কোন শিল্পীর সাধনার আবাসে এসে দাঁড়িয়েছি। সুলতান বাজবাহাদুর সঙ্গীতের শিল্পী রূপেই মালবে অমর হয়ে আছেন।

বাজবাহাদুর ও রূপমতীর গল্প আমার জানা ছিল। তাই শুক্লাকে আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করলুম না। কিন্তু অভিমন্যু হঠাৎ আমাকে আশ্চর্য করে দিল। বলল : নর্মদা নদী কোথায় মামা?

মনে পড়ে গেল যে আমি তাকে মাণ্ডুতে নর্মদা নদী দেখাব বলেছিলুম। রূপমতীর প্যাভিলিয়ন থেকে রূপমতী নিজে নাকি প্রত্যহ নর্মদা দর্শন করতেন। তাঁদের বাস ছিল নর্মদার তীরেই।

তাই নর্মদাকে প্রণাম না করে তিনি দিনের কাজ শুরু করতেন না। বললুম : সামনের এই পাহাড়ে উঠতে পারবে?

অভিমন্যু অবলীলাক্রমে বলল : পারব।

কিন্তু মিনতি বললেন : কত উঁচু এই পাহাড়?

বললুম : নিশ্চয়ই বেশি উঁচু নয়। রূপমতী যখন প্রত্যহ এই পাহাড়ে উঠতেন নর্মদা দেখবার জন্যে, তখন আমরাও এক দিন উঠতে পারব।

বিরূপাক্ষ বললেন : রূপমতী কি বাজবাহাদুরের সঙ্গে এই প্রাসাদেই বাস করতেন?

কঠিন প্রশ্ন। উত্তর আমার জানা ছিল না। কিন্তু তবু বললুম : বোধহয় না।

না কেন বলছেন?

বলছি এই জন্যেই যে দুজনেই শিল্পী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যে প্রেম তার জন্ম সঙ্গীতের প্রতি দুজনের অনুরাগ থেকে। দুজনেই দুজনকে শ্রদ্ধা করতেন বলে আমার বিশ্বাস। তাই শুনেছি, রূপমতী এই রেবাকুণ্ডে স্নান করে পাহাড়ের উপরে উঠতেন নর্মদা দর্শনে। সেখানেই বোধহয় দুজনের দেখা হত। রূপমতীর প্যাভিলিয়ন বলে যা আমরা জানি, তা বোধহয় সঙ্গীতের সাধনার জন্যেই তৈরি হয়েছিল।

পাহাড়ে উঠবার জন্যে আমরা সামনে পা বাড়িয়ে দিলুম। দেখলুম জনকয়েক ছেলে মেয়ে আগে ভাগেই অনেকটা উঠে গেছে, আর অনেকে গিয়ে বাসের মধ্যে বসে পড়েছে। পরিশ্রম করার অভ্যাস নেই। বিনা পরিশ্রমে যা দেখা যায়, তাতেই তারা সন্তুষ্ট।

পথ বেশি নয়, আর উচ্চতাও নয় খুব বেশি। পরিশ্রম তবু এড়ানো যায় না। পাহাড়ে ওঠার অভ্যাস নেই বলেই পরিশ্রম বোধ হয়। কিন্তু গাছপালার ভিতর দিয়ে এই পথে চলতে শীতল

বাতাসে শরীর জুড়িয়ে যায়, উপরে পৌঁছেই ভুল হয়ে যায় পরিশ্রমের কথা।

যেখানে আমরা পৌঁছলুম, তার সামনে একটুখানি প্রশস্ত জায়গা। অনেকগুলি মোটর গাড়ি এসে স্বচ্ছন্দে দাঁড়াতে পারবে। আর তারপরেই একটি কারুকার্যহীন একতলা পাকা বাড়ি। অনেকটা লম্বা। ছাদের দু ধারে দুটি গম্বুজ ওয়ালা ঘর, তার চারি ধার খোলা। খিলান আছে, কিন্তু কোন দরজা জানালা নেই। কার্নিসের উপরে ঢেউ খেলানো গম্বুজ। এরই নাম যে রূপমতীর প্যাভিলিয়ন তা বলে দেবার দরকার নেই। কিন্তু উপরে না উঠলে চারি ধারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কিছুই দেখা যাবে না।

যে ছেলেরা আমাদের আগে উঠেছিল, তাদের আমরা উপরের একটা ঘরে দেখতে পেলুম। আমরাও সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলুম। অভিমন্যুকে বললুম: এই বারে আমরা নর্মদা দেখতে পাব।

উপর থেকে নিচের সমতলের দৃশ্য পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। প্রায় বারো শো ফুট নিচে নিমর উপত্যকা। নর্মদা বয়ে যাচ্ছে সেই উপত্যকা দিয়ে। কিন্তু তার সরু রূপালি রেখা মধ্যাহ্নের রৌদ্রে চিকচিক করছে। অপরিষ্কার দিনে নাকি দেখাও যায় না।

অভিমন্যুকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: দেখতে পেয়েছ?

অভিমন্যু সত্যি কথাই বলল: নদীর মতো মনে হচ্ছে না।

বললুম: নদীর মতো দেখতে হলে জব্বলপুরে যেতে হবে। নর্মদা সেখানে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নেমেছে ঝরঝর করে, তার পরে দুদিকের পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে বয়ে এসেছে। সে পাহাড় কিন্তু এ রকম পাহাড় নয়, মার্বল পাথরের পাহাড়।

অভিমন্যু তখনই বলে উঠল: সেখানে আমরা যাব না মামা?

মিনতি আমার দিকে তাকালেন, আর আমি তাকালুম বিরূপাক্ষের দিকে। বিরূপাক্ষ গম্ভীর ভাবে বললেন: এবারে নয়।

অভিমন্যু আবদার করল না। প্রতিবাদ করতে এখনও ও শেখে নি। কিন্তু মিনতি যে খুশী হলেন না, আমি তাঁর মুখ দেখেই তা বুঝতে পারলুম।

বেলা তখন পড়ে আসছে। সূর্য আর মাথার উপরে নেই। পশ্চিমের দিকে খানিকটা হেলে এসেছে। আমরা তাই তাড়াতাড়ি উপর থেকে নেমে এলুম।

ফেরার পথে আমাদের বাস সাগরতালাও-এর কাছাকাছি এক জায়গায় দাঁড়াল।

ব্যাপার কী?

একো পয়েণ্ট!

কথাটা শুনতে না শুনতেই ছেলে মেয়েরা হুড়মুড় করে নেমে পড়ল। বাসের কণ্ডাক্টর আগেই নেমেছিল। পথের ধারে একটি বাঁধানো জায়গায় দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করে কী একটা বলল।

পরের মুহূর্তেই ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারলুম। তার চিৎকারের প্রতিধ্বনি এল ফিরে। ছেলেরা এক এক জনে এক একটা কথা- বলে চিৎকার করতে লাগল, আর প্রত্যেকটি কথার প্রতিধ্বনি আমরা স্পষ্ট শুনতে পেলুম।

কয়েকজন ছেলের আনন্দ দেখে মনে হল যে মাণ্ডুতে এই একো পয়েণ্টই তাদের সব চেয়ে ভাল লেগেছে। কিন্তু আমাদের বাসের ড্রাইভার হর্ন বাজিয়ে আমাদের ভিতরে ডেকে নিল। এখনও কিছু সময় লাগবে মাণ্ডু দেখা শেষ করতে।

সবাই বাসে উঠে পড়তেই বাস আবার উত্তর মুখো চলল। সাগরাতালাও পেরিয়ে প্রায় জামি মসজিদ পর্যন্তই ফিরে এল, তার পরে ধরল বাঁ হাতের একটি পথ। এ পথ দক্ষিণে গেছে নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির ছাড়িয়ে তারাপুর গেটের দিকে।

বাস এসে যেখানে দাঁড়াল সেখানে কয়েকটি বড় গাছ ছায়া

বিস্তার করে আছে। তার নিচে অনেকগুলি মেয়ে নানা রকমের ফল ফুল নিয়ে বসেছে যাত্রীদের কাছে বিক্রি করতে। এরা সবাই ভীল মেয়ে। এইখানেই কোথাও বসবাস করে। আর দিনের বেলায় এইখানে আসে দু পয়সা রোজগারের জন্যে।

কিন্তু চারি ধারে চেয়ে আমি কোন মন্দির দেখতে পেলুম না, কোন ঘর বাড়িও না। তাই আমরা কী দেখতে এলুম, তাই জানবার জন্যে শুক্লার মুখের দিকে তাকালুম।

ব্যাপারটা শুক্লাও বুঝতে পারে নি। জিজ্ঞাসা করে জেনে নিল যে নীলকণ্ঠের মন্দির দেখতে হলে ওধারের সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে। যাদের শখ আছে তারা এগিয়ে গেল, আর অনেকেই বসে রইল বাসের ভিতরে। ভিতর থেকে একটি ছেলে বলল: কাণ্ড দেখ এদের! কোথায় চা বিক্রি করবে, তা নয় শশা নিয়ে বসেছে। কে খাবে এই শশা!

অভিভাবকেরা নেমে গেছেন দেখে চায়ের বদলে তারা সিগারেট ধরাল।

শুক্লা আমাদের সঙ্গে চলল মন্দির দেখতে এইবারে আর একটি ইতিহাসের গল্প শুনলুম তার কাছে। নীলকণ্ঠ মন্দির থেকে আরও দক্ষিণে গিয়ে তারাপুর দরওয়াজা। খানিকটা তফাতে হল শোনগড় নামে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। মাণ্ডুতে তখন গুজরাতের সুলতান বাহাদুর শাহর অধিকার। যুদ্ধ করে তিনি এই দুর্গ জয় করেছিলেন, আর মাণ্ডুতেই বাস করছিলেন। এমন সময় দিল্লীর বাদশাহ হুমায়ুন এসে নিচের নিমর উপত্যকায় সৈন্য সমাবেশ করলেন। কিন্তু দুর্গের প্রধান দ্বার এমন সুরক্ষিত যে সে পথে আক্রমণ করা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। বাহাদুর শাহ নিজে এই যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। কিন্তু হুমায়ুন অতর্কিতে এই তারাপুর দরওয়াজার পথে দুর্গ আক্রমণ করলেন। আর অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসেই জয় করলেন এই দুর্গ।

বাহাদুর শাহ শোনগড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই নীলকণ্ঠের মন্দির আর তারাপুর দরওয়াজার মাঝখানে কতকটা বিচ্ছিন্ন এই শোনগড় মানুষের অজেয়। কিন্তু বাহাদুর শাহকে হুমায়ুন জীবন্ত বন্দী করবেন বলে সংকল্প করেছিলেন। এ দিকে শোনগড়ের পথে নিচে নামবারও কোন উপায় নেই। অনেক চিন্তার পরে বাহাদুর শাহ ছলনার আশ্রয় নিলেন। নিজের এক দেহরক্ষীকে পরালেন সুলতানের বেশ। সুসজ্জিত ঘোড়ায় চড়িয়ে বললেন নিচে লাফিয়ে পড়তে। প্রভুভক্ত দেহরক্ষী তার কর্তব্য পালনে একটুও দ্বিধা করল না। পাহাড়ের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে তার কর্তব্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেল। প্রভুর প্রাণ রক্ষার জন্যে নিজের প্রাণ দিয়ে গেল অবলীলাক্রমে। আর হুমায়ুন এই ঘটনায় প্রতারিত হলেন।

বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে আমরা ধাপে ধাপে নিচে নামছিলুম। দুই পাহাড়ের মাঝে এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন ধারার কোন হিন্দু রাজা। তারপরে মুসলমান আমলে এর রূপ পরিবর্তন হয়েছিল। কোন সুলতান এই সুন্দর স্থানটিকে একটি বিলাস ভবনে পরিণত করেছিলেন। আকবর বাদশাহ তাঁর খান্দেশ অভিযানে যাতায়াতের পথে এই সুন্দর স্থানটিতে কিছু দিন বাস করেছিলেন বলে শোনা যায়। কিন্তু মারাঠারা এই দুর্গ জয়ের পরে নূতন করে নীলকণ্ঠের পূজার প্রবর্তন করেছে।

অনেকটা নিচে নেমে আমরা একটা অপরূপ সুন্দর জায়গায় পৌঁছলুম। পাহাড়ের ধারে গভীর একটি খাদের পাশে এই প্রাসাদ। ঝর্ণার মতো সুন্দর একটি পাহাড়ী নদী তরতর করে নিচে নামতে গিয়ে বাঁধা পড়েছে এইখানে। তার কলতানে মুখর হয়ে আছে চারি ধার। প্রাসাদের পিছনে কোন খানে তাকে বেঁধে অঙ্গনের একটি কুণ্ডের মধ্যে আনা হয়েছে। এই ধারার মধ্যেই নীলকণ্ঠ শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। পূজার জন্যে মই বেয়ে শিবের নিকটে পৌঁছবার ব্যবস্থা।

অনেক বিস্ময় নিয়ে আমরা শিবকে দেখলুম। প্রণাম করলুম তাঁকে। তারপরে আবার উঠতে লাগলুম উপরে।

উপরে উঠতে উঠতে শুক্লা বলল: আমার মনে হয় রূপমতী এই প্রাসাদেই থাকতেন।

আমি বললুম: অসম্ভব নয়।

শুক্লা বলল: রেবাকুণ্ডে স্নান করে নর্মদা দর্শনের পরে তিনি নীলকণ্ঠ শিবের পূজা করতেন বলে শুনেছি। এখানে এমন সুন্দর বাসস্থান থাকতে অন্যখানে তিনি নিশ্চয়ই থাকতেন না।

এ কথার প্রতিবাদ করার মতো কোন যুক্তি আমার জানা ছিল না।

শুক্লা বলল: বাজবাহাদুর ও রূপমতীর প্রেম কাহিনী আছে ক্রাম্প সাহেবের লেডি অব দি লোটাস বইএ। কিন্তু সে বইখানি আমি সংগ্রহ করে পড়তে পারি নি। এ দেশের গাথা ও গানেও এই কাহিনী পাওয়া যায়।

এই গাথা ও গান সংগ্রহের ইচ্ছা আমার হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই শুক্লা বলল: বাজবাহাদুরকে লোকে মাণ্ডুর শেষ সুলতান বলে। কিন্তু কথাটা খুব ঠিক নয়। মাণ্ডুর শেষ সুলতান কে, আমি তা বলতে পারব না। তিনি হেরে গিয়েছিলেন গুজরাতের বাহাদুর শাহর কাছে। আর হুমায়ুন এই দুর্গ জয় করেন বাহাদুর শাহকে পরাজিত করে। কিন্তু এই মাণ্ডু হুমায়ুনের দখলেও বেশি দিন ছিল না, বিহারের শের শাহ এসে দখল করে নিয়েছিলেন এই মাণ্ডু দুর্গ, আর সুজা খানকে নিযুক্ত করেছিলেন মালবের শাসন কর্তা। এই সুজা খানের পুত্রের নাম হল বায়াজীদ। পিতার মৃত্যুর পর তিনিই বাজবাহাদুর নাম নিয়ে মাণ্ডুর সুলতান হয়ে বসলেন। সে হল ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

তখন আমরা বাসের কাছে ফিরে এসেছিলুম। যারা ভিতরে বসেছিল, তারা তাড়া দিচ্ছিল ফেরার জন্যে। আমরা উঠে বসতেই বাস

ছাড়ল। বাজবাহাদুরের গল্প আমি জানি। তিনি যে সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, তাতে কারও সন্দেহ নেই। আশৈশব তিনি সঙ্গীতের সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ পরিচালনা বা রাজ্য শাসন সম্বন্ধে তাঁর যোগ্যতা কতটা ছিল, সে সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ আছে। তার কারণও আছে। গণ্ডোয়ানা বা গড় মণ্ডলের রাণী দুর্গাবতী তাঁর তিন বছরের নাবালক পুত্র নিয়ে বিধবা হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সুশাসন ও বুদ্ধি বলে তাঁর রাজ্য সুখে ও সমৃদ্ধিতে অতুলনীয় হয়ে ওঠে। কী একটা কারণে এই রাজ্যের সঙ্গে সুলতানের যুদ্ধ বাধল। বাজবাহাদুর আস্ফালন করে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন রাণী দুর্গাবতীর সঙ্গে। কিন্তু পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছিলেন। তারপর লজ্জায় ও ঘৃণায় তিনি যুদ্ধ পরিত্যাগ করে পুনরায় সঙ্গীতে মনোনিবেশ করেছিলেন।

শোনা যায়, তিনি মাঝে মাঝে গান গেয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। এমনি এক সফরের সময় তিনি রূপমতীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। মানসিংহ রাঠোরের সুন্দরী কন্যা রূপমতীও সুলতানের সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু মুসলমানের সঙ্গে রাজপুত মেয়ের বিবাহ হবে কী করে! এ যে কলঙ্কের কথা! এ কথা প্রচারিত হলে বংশের মর্যাদা নষ্ট হবে। মানসিংহ আদেশ দিলেন, রাত্রি প্রভাত হবার পূর্বেই রূপমতীকে বিষপান করে মৃত্যু বরণ করতে হবে।

বাজবাহাদুরের কানে এই খবর পৌঁছল। রাত্রি প্রভাত হবার পূর্বেই তিনি তাঁর মানসীকে অপহরণ করলেন।

সুলতান এই প্রেমের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। রূপমতীকে তাঁর ধর্ম ত্যাগ করতে হয় নি। সখী পরিবৃতা হয়ে রেবাকুণ্ডে স্নান করতে যেতেন, তার জন্যে তৈরি হাওয়া ঘর থেকে নর্মদা দর্শন করতেন, নীলকণ্ঠ মহাদেবের পূজা করতেন ঘটা করে। রূপমতীর ধর্ম চর্চায় সুলতান কোন দিন বাধা দেন নি।

কিন্তু সঙ্গীতের সাধনা দিয়ে তো রাজ্য রক্ষা হয় না। হলও না। আকবর বাদশাহর সেনাপতি আদম শাহ্ এসে মালবের ময়দানে দামামা বাজাতে শুরু করল। বীণা নামিয়ে রেখে বাজ-বাহাদুর অসি হাতে নিলেন, এগিয়ে গেলেন সারঙ্গপুরের যুদ্ধক্ষেত্রে। সেই যুদ্ধই সুলতানের শেষ যুদ্ধ। কিন্তু রূপমতীকে মাণ্ডুর দুর্গে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। দুর্গ জয় করে মোগল সেনা তাঁর ধর্ম পালনের গল্প শুনেছিল। আকবরের কাছে পরাজিত হয়ে রানী দুর্গাবতী জহরের আগুনে পুড়ে মরেছিলেন। আর রূপমতী বিষ পান করে ধর্ম রক্ষা করেছিলেন।

ফেরিস্তার ইতিহাসে এই কাহিনী আছে, আছে ক্রাম্প সাহেবের বইএ। এ দেশের মানুষ আজও এঁদের গান গায়। কিন্তু বাজবাহাদুর ও রূপমতীকে দেখেছি প্রাচীন কাংড়া চিত্রে। সেই চিত্র আজ আমার চোখের সামনে নতুন করে ফুটে উঠল।

১৪

মাণ্ডু দেখা আমাদের হয়ে গেল। দৌলতাবাদের মতো নয়, আজমেরের তারাগড়ের মতো নয়, মাণ্ডবগড় চিতোরের মতো একটা বিরাট দুর্গ। গোটা শহরটাই একটা দুর্গ। পাহাড়ের মালভূমির উপরে সুরক্ষিত একটি শহর। তবু মনে হল যে চিতোর-গড় বোধহয় আরও প্রাচীন, আরও মহৎ। ভারতের ইতিহাসে চিতোর গড়ের স্থান আরও অনেক উঁচুতে।

বাসে আমরা একই জায়গায় বসেছিলুম। আগের মতো শুক্লা আমার পাশেই বসেছে। কিন্তু এখন একেবারেই নীরব হয়ে আছে। একটু আগেই বোধহয় তার দুএকজন সঙ্গী তাকে কটাক্ষ করে কিছু বলেছিল। সেই কথাই সে বোধহয় নিঃশব্দে হজম করবার চেষ্টা করছে।

গ্রামের দোকানগুলোর সামনে দিয়ে যাবার সময়ে কয়েকজন ছেলেমেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল। দোকানে তারা চা খেয়ে নিতে চায়। কিন্তু বাসের ড্রাইভার দাঁড়াল না। বলল: মানপুরে চা খাওয়াব।

মানপুর কোথায়?

মানপুরের উপর দিয়ে তো আমরা আসি নি। ধারে পৌঁছতে অনেক সময় লাগবে। কিন্তু শুক্লা এবারে চুপি চুপি আমাকে বলল: আমরা এবারে অন্য পথে যাচ্ছি।

তারপরে বলল: বলেছিলুম না? মাণ্ডু আসবার দুটো পথ আছে।

বলেছিলে বৈকি।

শুক্লা বলল: ধারের পথে পৌঁছে এবারে আমরা ডান হাতের পথ ধরব। তারপরেই পৌঁছব আগ্রা-বম্বে রোডের উপরে গুজরি

নামে ছোট একটি জায়গায়। সেখান থেকে বাঁ হাতে বেঁকে খানিকটা এগোলেই মানপুর।

আমি আশ্চর্য হচ্ছিলুম এই ছেলেটির পথঘাটের অভিজ্ঞতা দেখে। নিজে এ দিকে একবারও আসে নি, অথচ সবই যেন তার জানা।

পাহাড়ের উপর থেকে তখন আমরা ধীরে ধীরে নামছি। খুব সাবধানে। এই সব পাহাড়ী পথে দুটি সঙ্কেত থাকে—ঘাট বিগিন্স্ ও ঘাট এণ্ড্স্। মানে ঘাট শুরু হল ও ঘাট শেষ হল। এই দুই সঙ্কেতের মধ্যে খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে হবে।

শুক্লা এবার বলল: এই অঞ্চলে আরও একটি দেখবার জায়গা ছিল।

কী?

বলে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

শুক্লা বলল: বাঘমতী নদীর তীরে বাঘ পর্বত গুহা। দেখেছেন আপনি?

বললুম: না।

অজন্তা নিশ্চয়ই দেখেছেন!

তা দেখেছি।

শুক্লা বলল: অজন্তারই ক্ষুদে সংস্করণ হল বাঘ। পাহাড় কেটে শুধু বিহার নির্মাণই করে নি, অজন্তার মতো ফ্রেস্কো এঁকেছে দেওয়ালে। তবে দুর্ভাগ্য এই যে পরবর্তী যুগে খুব বাজে লোক বাস করত এই সব গুহায়। গুহার ভেতরে রান্নাবান্না করে সমস্ত চিত্র প্রায় নষ্ট করে ফেলেছে। তবু যা আছে, তা দেখবার জন্যে শিল্পরসিকদের যাওয়া উচিত।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: সে এখান থেকে কত দূরে?

শুক্লা বলল: তা দূর আছে বৈকি। ধার থেকে চুয়ান্ন মাইল পশ্চিমে যেতে হয়। আপনাকে বলতে ভুলে গেছি, রাতলাম

স্টেশন থেকেও ধারে আসা যায়। ধার থেকে বাঘ। কিন্তু একই পথে ফিরবার দরকার নেই। উল্টো দিকে প্রায় অতখানি পথ গেলেই আবার আগ্রা-বম্বে রোড পাওয়া যাবে।

বাঘ গুহার কথা আমার ভাল জানা ছিল না। শুক্লার কাছেই তা জেনে নিলুম। এই গুহা ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর বৌদ্ধ কীর্তি। নটি গুহার মধ্যে এখন কেবল চারটি বর্তমান আছে। বাকি সবগুলি ভেঙে পড়ে গেছে। এগুলি বৌদ্ধ বিহার। বড় একটি ঘরের চারি দিকে শ্রমণদের থাকবার জন্যে ছোট ছোট ঘর। দু নম্বর গুহার পিছনে উপাসনার জন্য একটি চৈত্যও আছে। চার নম্বর গুহার নাম রঙ মহল। এক সময় এই গুহার ভিতর ও বাহির ছিল নানা রঙে রঙীন। ভিতরের রঙ আজ ধোঁয়ায় মুছে গেছে, বাহিরে কিছু আছে। পঁয়তাল্লিশ ফুট লম্বা একটা বারান্দা নানা চিত্রে শোভিত। রোদনরতা নারীর অপূর্ব চিত্র আছে, আছে নৃত্যপরা সুন্দরীদের বিচিত্র বিলাসের চিত্র। পুরুষের দ্বন্দ্ব আছে, আর আছে হস্তী ও অশ্বারূঢ় অভিজাতের শোভাযাত্রা। গুহার বাহিরে একটি যক্ষরাজের বিরাট মূর্তিও আছে।

শুক্লাও বলল: স্থানীয় লোকেরা এই গুহাকে পাণ্ডব গুহা কেন বলে জানি না। দু নম্বর গুহার একটি বৌদ্ধ চিত্রকে বলে মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডব।

এ কোন নূতন কথা নয়। আমরা সব চিত্রের ও সব মূর্তিরই একটি মনোমত নাম চাই। নিজের ধর্মবিশ্বাসে আস্থা আছে, এমন নাম। বুদ্ধকেও তো আমরা বিষ্ণুর অবতার বলি। বৌদ্ধদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ কোথায়?

শুক্লা হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: এ সব জায়গায় যাঁরা নিজের গাড়িতে আসেন, তাঁদের ভারি সুবিধে। কারও মুখাপেক্ষী হয়ে বেড়াতে হয় না।

শুক্লার দৃষ্টিতে আমি এক রকমের ক্ষোভ দেখলুম। তাই

বললুম: নিজের গাড়ি না থাকলেও সব সময় অসুবিধা হয় না। ভ্রমণে যা দরকার, তা হল একজন ভাল সঙ্গী।

শুক্লা কোন কথা না বলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তাই দেখে আমি বললুম: নাসিকেও শুনেছি এমনি গুহা আছে। তোমার মতো একজন সঙ্গী পেলে আমি নাসিক রোড স্টেশনেই নেমে পড়তুম। সেখানকার গুহা ও আর সব কিছু দেখে সড়ক পথে এই অঞ্চলে আসতুম। নিজেদের গাড়ি না থাকার জন্যে আমাদের কোন অসুবিধা হত না।

স্টেশনের নাম নাসিক রোড, গোদাবরীর তীরে নাসিক শহর স্টেশন থেকে মাইল পাঁচেক দূরে। আর বম্বে থেকে এর দূরত্ব একশো কুড়ি মাইলের কম।

শুক্লা বলল: নাসিক দেখতে হয় কুম্ভ মেলার সময়। বারো বছর পর পর এই মেলা। লক্ষ লক্ষ লোক আসে চারি দিক থেকে। দক্ষিণের মানুষ গোদাবরীকেই তো গঙ্গা বলে!

জানতে পারলুম যে নাসিক দেখে এসেছে শুক্লা। তাই নাসিকের কথাও আমি শুক্লার কাছেই শুনলুম।

শহরের নাম নাসিক হল কেন, তাই সে আগে বলল। নাসিকের কাছেই পঞ্চবটী বন। পিতৃসত্য পালনের জন্য অযোধ্যা থেকে রাম এসেছিলেন এই পঞ্চবটীতে। এই বনেই লক্ষ্মণ শূর্পনখার নাক কেটে ছিলেন। সেই থেকে এই জায়গার নাম নাসিক হয়েছে। গোদাবরীর উপরে পাকা পুলের এ পারে নাসিক, ওপারে পঞ্চবটী।

জিজ্ঞাসা করলুম: সেখানে দেখবার কী আছে?

শুক্লা বলল: প্রাকৃতিক দৃশ্য ছাড়া দেখবার বিশেষ কিছু নেই। পঞ্চবটী তপোবন আর সীতার গুহা আছে রামায়ণের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে। পঞ্চবটীতে রামের মন্দির আছে। কালো পাথরের তৈরি বেশ বড় মন্দির, নাট মন্দির তার সংলগ্ন। ধনুর্বাণধারী রামের দণ্ডায়মান মূর্তি নানা অলঙ্কারে শোভিত।

কষ্টিপাথরের বিগ্রহ। কিন্তু নাসিক হল মন্দিরময় শহর। ক্ষীণ-স্রোতা গোদাবরীর দুই তীরে দেবদেবীর অগণিত মন্দির। সুন্দর নারায়ণের মন্দিরে অপূর্ব শিল্প কর্ম, কপালেশ্বর মন্দিরটি নাকি দুশো বছরের পুরনো। বারাণসীর গঙ্গা ও মন্দির দেখে যাঁরা মুগ্ধ হন, তাঁরা এখানেও এসে মুগ্ধ হবেন। তবে গঙ্গার সঙ্গে গোদাবরীর তুলনা হয় না। গঙ্গার মতো বিস্তার নেই গোদাবরীর। নদীতেও জল কম বলে কুণ্ড নির্মিত হয়েছে। বাঁধানো ঘাট। হাজার হাজার যাত্রী এই বাঁধানো ঘাটে দাঁড়িয়ে স্নান করে।

একটু থেমে বলল: মাইল কুড়ি দূরে ত্র্যম্বকে গোদাবরীর উৎপত্তি। সেও এক তীর্থ।

নদী দেশের জীবন, নদীর জল হিন্দুর কাছে পবিত্র, নদীর জন্ম-স্থান হিন্দুর পরম তীর্থ। হিমালয়ের দুর্গম স্থানে জন্ম নিয়েছে যমুনা ও গঙ্গা। দলে দলে যাত্রী সেই দুর্গম স্থানকে জয় করেছে নির্ভীক চিত্তে। কাঞ্চনজঙ্ঘা যদি তীর্থ হত, তবে ভারতের হিন্দু কৈলাসের মতো তাকেও জয় করত অনায়াসে।

নাসিক আমার দেখা হয় নি বলে একটুও ক্ষোভ নেই। জগতে দেখা আর কতটুকু হয়। সবই তো প্রায় না দেখাই রয়ে যায়। যেটুকু দেখা হয় তাইতেই ভরে নিতে হয় মন। সামান্যে তুষ্ট হবার কৌশল জানতে হয়। দেবতার মধ্যে আশুতোষ শিব আমাদের আদর্শ।

শুক্লা বোধহয় কিছু ভাবছিল, বলল: নাসিক থেকে যাত্রীরা বাসেই যাতায়াত করে। যে পাহাড়ে গোদাবরীর জন্ম তার নাম ব্রহ্ম পাহাড়। শ পাঁচেক সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠলে দেখা যায় যে একটি গোমুখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। এই জলই গুপ্ত ধারায় নিচের একটি কুণ্ডে এসে জমা হচ্ছে। সেখানে গোদাবরীর মন্দির আছে। কুম্ভের সময় সেখানেও যাত্রীরা স্নান করে।

ত্র্যম্বকেশ্বরের মস্ত বড় মন্দির হল পাহাড়ের নিচে। প্রাচীর বেষ্টিত প্রাঙ্গণ ও নাটমন্দিরটি সত্যই আপনাদের ভাল লাগবে।

মনে মনে মেনে নিলুম তার কথা। কিন্তু সেখানে ফিরে যাবার আর উপায় নেই। আমাদের এখন ঘরে ফেরার পালা।

কখন আমরা ধারের পথ ছেড়ে গুজরির পথ ধরেছিলুম, তাও খেয়াল করি নি। মাণ্ডু থেকে ধার মাত্র বাইশ মাইল বলে শুনেছিলুম। কিন্তু গুজরি কত মাইল তা জানি নে। জানবার দরকারও নেই। বাসে বসেই যখন যেতে হবে, তখন মাইলের হিসেব দিয়ে আমরা কী করব! কিন্তু গুজরি পৌঁছেই শুক্লা আমাকে বলল: মানপুর এখান থেকে বারো মাইল।

একটা প্রশস্ত রাজপথে পৌঁছে আমরা বাঁ হাতে ফিরেছিলুম। কেউ বলে না দিলেও বুঝেছি যে এটি হল বম্বে-আগ্রা রোড।

শুক্লা বলল: বাঁ দিকে না ফিরে ডান দিকে খানিকটা এগিয়ে গেলেই আমরা মহেশ্বর দেখতে পেতাম।

সেই মহেশ্বর। পুরাকালের মাহিষ্মতী। অনেক কিছু জানা থাকলেও শুক্লাকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: দেখবার মতো ভাল জায়গা, তাই না?

শুক্লা বলল: সুন্দর জায়গা সন্দেহ নেই। রাণী অহল্যাবাঈ ইন্দোরে রাজধানী তুলে আনবার আগে এই শহরটিকে সুন্দর করে গড়ে তুলবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। আর সফলও হয়েছিলেন তার প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য।

একটু থেমে বলল: নর্মদার তীরে শহর তো! গোদাবরীর তীরে যেমন নাসিক, নর্মদার তীরে তেমনি মহেশ্বর। তবে পার্থক্যও অনেক। নাসিক্ আর পঞ্চবটীর প্রতি দিন উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু মহেশ্বর এখন একটি প্রাচীন শহর হিসেবেই বেঁচে আছে।

তারপরেই বলল: যদি দেখতে চান তো দেখে আসতে পারেন। ইন্দোর থেকে চুয়ান্ন মাইল দূরে। কিন্তু নিয়মিত বাস চলাচল করে। যাত্রীদের জন্যে ধর্মশালা আছে। ইন্স্পেক্‌সন বাংলোতেও থাকতে পারবেন। রাণী অহল্যাবাঈএর কীর্তির কথা তো জানেন। সারা

ভারতবর্ষে তাঁর কীর্তি আছে—উত্তরে কেদারনাথ থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারী। আর পশ্চিমে সোমনাথ থেকে পূর্বে আসামেও বোধ হয় তাঁর কীর্তির চিহ্ন বর্তমান। সমস্ত তীর্থস্থানেই তিনি যাত্রীদের সুখ সুবিধার জন্য অপর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করেছেন। কাজেই নিজের রাজধানীতেও যে অনেক কিছু করেছেন তাতে সন্দেহ করবার কারণ নেই। রাণীর চেষ্টায় মহেশ্বরও একটি তীর্থে পরিণত হয়েছে।

আমি নীরবেই তার কথা শুনছিলুম। আর ভাবছিলুম বাঙলার বড়নগরে রাণী ভবানীর কীর্তির কথা।

শুক্লা বলল: নর্মদার ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছেন তিনি। আর মন্দির নির্মাণ করেছেন অনেক। কিন্তু আমি আপনাকে খানিকটা এগিয়ে নর্মদার এক অপরূপ রূপ দেখতে বলব। নর্মদা সহস্র ধারায় বিভক্ত হয়েছে মহেশ্বরের উপকণ্ঠে।

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম: তুমি দেখেছ এই দৃশ্য?

শুক্লা বলল: না। দেখবার সুযোগ পাই নি।

কেন, সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না। তার অবস্থা যে সচ্ছল নয় সে কথা আমি জানতে পেরেছিলুম। হয়তো এই সব জায়গা দেখবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তার অভাব আছে তার। কিন্তু আমি জানি যে খানিকটা সচ্ছলতা হলেই এ সব জায়গা সে নিজের চোখে দেখবে, মনের কোন আক্ষেপ সে রাখবে না।

হঠাৎ সে আমাকেই জিজ্ঞাসা করে বসল: আপনারা যাবেন সেখানে?

বললুম: আমাদের সময় কোথায়!

শুক্লা এ কথা মেনে নিয়ে বলল: তা সত্যি। আর এই জন্যেই আমি ভাবি যে এ দিকে নিজের গাড়ি থাকলে কোন ভাবনাই থাকে না। একটুখানি পথ এগিয়ে গিয়ে আমরা মহেশ্বরও দেখে আসতে পারতাম।

আমি বললুম: তোমরা তো এই বাসাটা ভাড়া করেছিলে। এই রকমের ব্যবস্থা করলেই পারতে!

শুক্লা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: কে করবে!

তারপরে বলল: ধারে খানিকটা সময় থাকবার কথা আমি বলেছিলাম। হেসে আমার কথা সবাই উড়িয়ে দিল। মহেশ্বরের কথা বললে হয়তো পাগল বলত।

মিথ্যা নয়। শুক্লা এই যুগটাকে হয়তো ঠিকই চিনেছে। নিজেদের দেশকে আমরা চিনতে চাই নে, যা চাই তা হল স্ফূর্তি। হৈ হৈ করে ঘুরে এলেই আমরা সন্তুষ্ট। সে মাণ্ডুর উপত্যকায় ঘুরলাম, না পিপলায়া পালার পুকুরের পারে, তাতে কিছুই যায় আসে না। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ভাল চাই, আর কিছু ভাল সঙ্গী। সঙ্গিনী হলেই যেন সোনায় সোহাগা। কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলুম যে শুক্লার সঙ্গে একটি মেয়েও কথা কয় নি, শুক্লাও চেষ্টা করে নি কারও কাছে ঘেঁষবার। বরং সে তাদের কৌতুক বেশ পরিষ্কার ভাবেই দেখতে পেয়েছে।

বড় রাস্তায় এসে আমাদের বাস আরও জোরে ছুটছিল। দেখতে না দেখতেই আমরা মানপুরের বাস স্ট্যাণ্ডে এসে পৌঁছে গেলুম। ছোটখাট বাজার বসেছে এইখানে। অনেক দোকান পাট, হোটেল রেস্তোরাঁ। নানা রকম ফল ফুলুরি বিক্রি হচ্ছে। ছেলেমেয়েরা সবাই হুড়মুড় করে নেমে পড়ল।

মিনতি বাস থেকে নামলেন না। বললেন: খোকাকে এইখানে কিছু খাইয়ে নিই।

বিরূপাক্ষ নেমে যাচ্ছিলেন, বললেন: একটু চায়ের চেষ্টা দেখি।

শুক্লার সঙ্গে আমিও নেমে পড়েছিলুম। বললুম: এস, একটু চা খাই আমরা।

আমার কথা শুনে শুক্লা যেন লজ্জা পেল। বললুম: লজ্জা কিসের!

শুক্লা বলল : লজ্জা নয়। চা আমি খাই নে।

তবে কী খাবে বল।

অপ্রতিভ ভাবে সে বলল : দুপুরে খেয়েছি তো, এখন আর কিছু খাব না। আপনি চা খান। আমি বরং এই জায়গাটা একটু দেখে নিই।

বলে আমাকে এড়িয়ে সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাস বেশিক্ষণ দাঁড়াল না। মিনিট দশেকের মধ্যেই বাসের হর্ন শুনে সবাই ছুটে এসে উঠে পড়ল। আবার আমরা পাশাপাশি বসলুম। শুক্লা আর আমি। অভিমন্যু আমার কাছে আসবে ভেবেছিল, কিন্তু তার আগেই বাস ছেড়ে দিল।

খানিকক্ষণ আমরা নীরবেই ছিলুম। তারপরে শুক্লা বলল : বাবনগজা নামে একটা নতুন জায়গার নাম শুনলাম। সেখানে নাকি পাহাড়ের গায়ে বিরাট এক মূর্তি ক্ষোদা আছে—শ্রবণবেলগোলার মূর্তির চেয়ে বড়। এত বড় মূর্তি ভারতবর্ষের আর কোথাও নেই।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : এর উল্লেখ তো আমি কোথাও দেখি নি।

শুক্লা বলল : এত দিন আমিও শুনি নি কারও কাছে। অথচ বাবনগজা এই অঞ্চলেই। বাস যাতায়াত করে। হাঁটতে হয় অল্পই। রাত্রিবাসের জন্য জৈন ধর্মশালাও আছে।

আমি জানতুম যে শ্রবণবেলগোলার চেয়ে বড় মূর্তি শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর আর কোথাও নেই। তাই বললুম : এ বোধহয় মূর্তি নয়, পাহাড়ের গায়ে ক্ষোদা চিত্র, মহাবলীপুরমে অর্জুনের তপস্যার মতো।

শুক্লা মেনে নিয়ে বলল : বোধহয় তাই।

তারপরেই প্রশ্ন করল : ইন্দোরে আপনারা কদিন থাকবেন?

বললুম : আমি যাঁদের সঙ্গে যাচ্ছি, তাঁরা বোধহয় কাল

সকালেই উজ্জয়িনী যাবেন।

কালই চলে যাবেন!

আশ্চর্য হয়ে আমি বললুম: কেন, ইন্দোরে আরও কিছু দেখবার আছে নাকি!

শুক্লা একটু ইতস্তত করে বলল: ওঙ্কারেশ্বর কি আপনাদের দেখা হয়ে গেছে?

বললুম: না।

কিন্তু শুক্লা এর পরে আর কোন কথা কইল না। শেষ পর্যন্ত আমিই জিজ্ঞাসা করলুম: ওঙ্কারেশ্বর না দেখে যাওয়া বুঝি উচিত হবে না?

শুক্লা বলল: এই তীর্থস্থানটি দেখবার জন্যে ভারতের নানা স্থান থেকে যাত্রী আসে। খুব বড় তীর্থ বলে শুনি।

স্বীকার করতে আমার দ্বিধা হল না যে বাঙলায় এই তীর্থের নাম অনেকেই শোনে নি। ভারতে যে সব বড় তীর্থের নাম আমরা জানি, তার তালিকায় ওঙ্কারেশ্বরের নাম নেই।

শুক্লা বলল: শুধু তীর্থস্থানই নয়, ওঙ্কারেশ্বর একটি অদ্ভুত সুন্দর জায়গা।

এ জায়গার বিবরণ শোনবার জন্যে আমি কৌতূহল প্রকাশ করলুম। বললুম: সত্যি!

শুক্লা বলল: আপনারা তো বম্বে থেকে খাণ্ডোয়ায় গাড়ি বদল করে এসেছেন। ইচ্ছে করলেই ওঙ্কারেশ্বর স্টেশনে নেমে পড়তে পারতেন।

ওঙ্কারেশ্বর স্টেশন!

শুক্লা তাড়াতাড়ি বলল: ভুল হয়েছে আমার। এই স্টেশনের নাম ওঙ্কারেশ্বর রোড। ওঙ্কারেশ্বর স্টেশন থেকে মাইল পাঁচেক দূরে নর্মদা নদীর মধ্যে একটি দ্বীপের ওপরে। লোকে এই তীর্থকে মান্ধাতাও বলে। শিবের জ্যোতির্লিঙ্গ কাকে বলে জানেন তো?

বললুম : সঠিক জানি না।

শুক্লা বলল : আমিও বুঝি না। তবে শুনেছি যে ভারতে নাকি সবসুদ্ধ বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গ আছে, তার মধ্যে দুটি এই মান্ধাতায়।

বললুম : ভারি আশ্চর্যের কথা।

শুক্লা বলল : সেখানে গেলে অনেক আশ্চর্য গল্প শুনতে পাবেন।

আমি বললুম : আমাদের তো সেখানে যাওয়া সম্ভব হবে না, যা জানবার আছে তা তোমার কাছেই শুনব।

শুক্লা একটু লজ্জা পেল। বলল : সারা দিন আমি আপনাকে বাজে কথা বলে বিরক্ত করছি।

বললুম : বিরক্ত করছ বোলো না, বল আনন্দ দিচ্ছ। তুমি সঙ্গে না থাকলে আমার অনেক কথাই জানা হত না।

তারপরেই বললুম : মান্ধাতায় কী দেখেছ বল।

শুক্লা আর দ্বিধা না করে বলল : নর্মদার মাঝখানে মাইল দেড়েক লম্বা একটি দ্বীপ। আর খরস্রোতা নদী বইছে উত্তর-দক্ষিণে। জলে অসংখ্য কুমীর। কিন্তু নদীর ধারে দাঁড়িয়েই আপনি মান্ধাতার সৌন্দর্য দেখতে পাবেন। দ্বীপের পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্তে উঁচু পাহাড়, তার শ্যামল রঙ। এই পাহাড় নদী গাছপালা ও সারি সারি মন্দিরে মান্ধাতাকে আপনার একটি সৌন্দর্যের আকর বলে মনে হবে।

এ যাবৎ আমি কুৎসিত কদর্য পরিবেশে কোন মন্দির দেখি নি। দেশের সুন্দরতম স্থানেই আমাদের মন্দিরগুলি গড়ে উঠেছে। সৌন্দর্য আছে দুর্গমতার ভিতর। তাই অনেক দুর্গম স্থানেও হিন্দুর পবিত্র তীর্থ স্থাপিত হয়েছে।

শুক্লা বলল : ওঙ্কারজীর নাম মান্ধাতা কেন হল, তারও একটা কাহিনী আছে। সূর্যবংশের রাজা মান্ধাতা এই দ্বীপে শিবের যজ্ঞ করেছিলেন। দেবতার মন্দিরও তাঁরই কীর্তি। শিবের নাম হল অনিলেশ্বর। দুটো মন্দির কেন হল, সে কথাও শুনেছি সেখানে।

মান্ধাতা যে মন্দির স্থাপন করেছিলেন, সেই প্রাচীন মন্দির ছিল দ্বীপের দক্ষিণে। কালক্রমে গভীর অরণ্যে তা হারিয়ে যায়। পুনার পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও এই মন্দির উদ্ধার করতে এসে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু ফিরে যাবার আগে নতুন এক মন্দিরে মনিলেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা করে গেলেন। এই ঘটনার অনেক দিন পরে পুরনো পবিত্র স্থানটিও খুঁজে পাওয়া যায়। তখন সেখানেও একটি নতুন মন্দির নির্মিত হয়েছে।

শুক্লা [একটু থেমে বলল: দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে পাহাড়ের উপরে দেখতে পাবেন গৌরী সোমনাথের মন্দির। তারই সামনে সবুজ পাথরের তৈরি বিরাট নন্দী যাত্রীদের নয়ন রঞ্জন করে।

আমি ভেবেছিলুম যে ওঙ্কারজীর কথা বোধহয় শেষ হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই শুক্লার কথায় বুঝলুম যে ওঙ্কারজীর অল্প দূরে নর্মদার উত্তর তীরেও অনেক কিছু দেখবার আছে। বিষ্ণুর মন্দির ও জৈনদের কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। নর্মদা যেখানে দুটি ধারায় বিভক্ত হয়েছে, সেখানেও বিষ্ণুর একটি মন্দির আছে। বরাহ অবতারের একটি সুন্দর বরাহ মূর্তি। আর সবুজ পাথরে তৈরি বিষ্ণুর চব্বিশটি মূর্তি। বিরাট বললে সম্পূর্ণ বলা হয় না, সাড়ে তিনটে মানুষের সমান উঁচু এই মূর্তি দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়।

শুক্লা এর পরে একটি কুসংস্কারের কথা বলল। বোধহয় ভুলে গিয়েছিল এই কথাটি, মনে পড়তেই বলল: সতীদাহের মতো এখানেও একটি কুসংস্কার ছিল অল্প দিন আগেও।

তাই নাকি!

বলে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

শুক্লা বলল: ধর্মের নামে কাউকে হত্যা করা হত না। লোকেরা নিজেরাই এখানে এসে আত্মহত্যা করত।

কেন?

শুক্লা বলল : লোকের অন্ধ বিশ্বাস। তাদের ধারণা ছিল যে এই পবিত্র তীর্থে মৃত্যু হলে মুক্তি একেবারে হাতের মুঠোয়। কিন্তু মৃত্যুর জন্যে কেউ অপেক্ষা করে থাকতে তো রাজী নয়। ছোট জায়গা, বসবাসের স্থান নেই বেশি। তাই বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীপুরুষেরা এসে যে কাশীবাসের মতো মৃত্যুর অপেক্ষা করবে, তার উপায় নেই। লোকে খুব সহজ একটা উপায় বেছে নিল। নর্মদার জলে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে লাগল।

আমি চমকে উঠে বললুম : এ তো আত্মহত্যা। আত্মহত্যায় তো মুক্তি হয় না, হয় পাপ। এ কথা কি কেউ বুঝিয়ে দিতে পারল না!

কে বোঝাবে! ধর্মের নামে মানুষ অন্ধ হয়। সে কালে তো হতই, এ কালেও লোকে ধর্মের নামে এমন অনেক কিছু করে যার অর্থ হয় না।

এখনও কি লোকে এই কাজ করছে?

বলে আমি শুক্লার মুখের দিকে তাকালুম।

শুক্লা বলল : বোধহয় না।

বোধহয় বলছ কেন?

বলছি এই জন্যে যে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে আইন করে এই প্রথা রহিত করা হয়েছে। তবু লোকে লুকিয়ে এ কাজ করছে কিনা, কে জানে!

আমার মনে হয় যে আইন করে বন্ধ না করলেও এ কাজ এক দিন আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যেত। ধর্মে বিশ্বাস তো মানুষের কমে আসছে, দেবতায় ভক্তিও আসছে কমে। কাজেই মুক্তির লোভও মানুষের দিনে দিনে কমছে। সতীরাও স্বামীর সঙ্গে চিতায় পুড়ে মরতে আপত্তি শুরু করেছিল। আইন করে সতী-দাহ নিবারণের অনেক আগেই এই বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল সন্তবিধবাদের মধ্যে। অন্ধ বিশ্বাসের পিছনে যা আছে তা তো মানুষেরই মন। পশুর মন নয়, রাক্ষসের মনও নয়। মানুষের

মর্মান্তিক পরিণতি সকল মানুষকেই কম বেশি বিচলিত করে। নিজের পরিণতির বেলাতেও তাই। জীবনের জন্য মমত্ববোধই ধর্মান্ধতার অবসান করে। পৃথিবীর সকল সমাজের কুসংস্কার তো এমনি করেই দূর হচ্ছে। আইন একটা উপলক্ষ, একটা অবশ্যম্ভাবী ঘটনাকে ত্বরান্বিত করে।

সতীদাহের কথায় আমার বিধবা বিবাহের কথাও মনে পড়ল। একদা বাঙলায় বিদ্যাসাগর মহাশয় চেয়োছলেন বিধবা বিবাহের রীতি প্রচলন করতে। শুনেছি, তাঁর মা নাকি বালবিধবার দুঃখ দেখে ব্যথিত হয়েছিলেন। কিন্তু সমাজে সেদিন ঘোরতর আপত্তি উঠেছিল। কিন্তু সব আপত্তি উপেক্ষা করে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন কলকাতা শহরে। কোথায় যেন পড়েছি যে ৪৮ নম্বর কৈলাস বসু স্ট্রীটে এই বিবাহ অনুষ্ঠান হয়েছিল মহা আড়ম্বরে।

এর পরে দীর্ঘ দিন গত হয়েছে। ভারত সরকার আইন প্রণয়ন করেছেন দেশের জন্য। বিবাহ বিচ্ছেদে ও বিধবা বিবাহে এখন আর কোন বাধা নেই। কিন্তু এ দেশে এই মনোভাব কি আদর পেয়েছে বিদেশের মতো! বোধহয় পায় নি। স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বন্ধন এ দেশে কুসংস্কার নয়, এ এক দেহাতীত বন্ধন। দেহান্ত হলেও যেন এ বন্ধন থেকে যায়, সম্বন্ধ ফুরিয়ে যায় না নূতন প্রলোভনে।

কিন্তু শুক্লাকে আমি এ সব কথা বললুম না। বাহিরে তখন অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। আমি সেই অন্ধকারের দিকে চেয়ে নীরবে বসে রইলুম।

কখন এক সময় গেট পেরিয়ে গিয়েছিলুম খেয়াল করি নি। ইন্দোরের বাস স্ট্যাণ্ডে এসে যখন বাস থামল তখন আমার খেয়াল হল। হৈ-চৈ করে ছেলেমেয়েরা নামতে লাগল। আমরাও নেমে পড়লুম।

শুক্লার কাছ থেকে বিদায় নিতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। একই বাসে আমরা আরও কত যাত্রী ছিলুম। কত সময় কাটিয়েছি এক সঙ্গে। কিন্তু কারও সঙ্গে আমার পরিচয় হল না। এই ছেলেটিও যে নিঃসঙ্গ তাও দেখতে পেয়েছিলুম। এর কাছেও কেউ এগিয়ে আসে নি। একেও নিজের কাছে ডাকে নি কেউ। মেয়েরা সবার সঙ্গে সমানে মিশেছে, হাসি গল্পে মাতাল করেছে পরিবেশ। কিন্তু শুক্লাকে কাছে না পেয়ে তার অভাব কেউ অনুভব করে নি। সেখানে তার মনের মানুষ নেই। যে অতীতে তার তরুণ মন ডুবে যায়, সে অতীতে এখন কারও বুঝি শ্রদ্ধা নেই। অতীতকে আমরা আর শ্রদ্ধা করি না, অতীতকে আমরা ভুলতেই চাই। এই যে এত-গুলি ছেলেমেয়ে আজ মাণ্ডুর দুর্গ দেখে এল, তারা সেখানে অতীত দেখতে যায় নি। গেছে তার বর্তমান দেখতে। নিজেদের জীবনের একটি দিন তারা উপভোগ করে এল, আর পরস্পরের পরিচয় হল গভীর। হাসি গানে মেয়েরা মধুর করেছে ছেলেদের অনেকগুলি মুহূর্ত। দূর থেকে আমরা তা দেখেছি। কিন্তু শুক্লা তার বর্তমানকে উপেক্ষা করে একটা ঐশ্বর্যময় অতীতকেই অন্তর দিয়ে অনুভব করবার চেষ্টা করেছে। সেই চেষ্টাতেই আমার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে অন্তরঙ্গ। বাহিরের ঘনিষ্ঠতা তো দুদিনের, চোখের আড়াল হলেই তা ফুরিয়ে যায়। মনের মিলে বড় নিবিড় বন্ধন, বিরহে তার অবসান নেই। শুক্লাকে ভুলতে আমার অনেক সময় লাগবে।

১৫

বাস স্টেশন থেকে পা বাড়িয়ে বিরূপাক্ষ বললেন : ইন্দোর তাহলে আমাদের দেখা হয়ে গেল।

মিনতি বললেন : ইন্দোর দেখতে তো আসি নি, এ দিকে এসেছি উজ্জয়িনী দেখতে। এবারে উজ্জয়িনীর কথা ভাব।

বিরূপাক্ষ বললেন : কষ্ট করে তা হলে আমরা ইন্দোরে এক দিন কাটালাম কেন!

সে তোমার শখে। তুমিই বলেছিলে যে ইন্দোরে এসে মাণ্ডু দেখব না, সে হয় না। তোমার মাণ্ডু দেখবার জন্যেই তো এখানে নামা। তা না হলে আমি সোজা উজ্জয়িনী যেতেই চেয়েছিলাম। কালিদাসের উজ্জয়িনী, সে জায়গা দেখে না গেলে সারা জীবন আপশোস থেকে যাবে।

আমি বললুম : তাহলে আমাদের উজ্জয়িনী যাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

করুন।

বলে বিরূপাক্ষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

মিনতি আমাকে বললেন : দেখলেন তো নিজের শখে সারা দিন ঘুরলেন রোদে। আর আমার শখের ব্যাপারে ওঁর উৎসাহ দেখুন।

অভিমন্যু হঠাৎ আমাকে বলল : মামা আমাকে আজ একটাও গল্প বলে নি।

আমি তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললুম : সময় কোথায় পেলুম বল তো। বাসটা গোঁ গোঁ করছিল, বাসে বসে কোন কথাই শোনা যাচ্ছিল না।

অভিমন্যু বলল : এইবারে গল্প শুনব।

বিরূপাক্ষ বললেন : ডান হাতের কারবারটা কি বাজারেই সেরে যাবেন, না স্টেশনের সেই থালা বাটি ?

মিনতি বললেন : তোমার স্টেশনের খাবারে ঘেন্না ধরে গেছে। একই খাবার রোজ খেয়ে খেয়ে খাওয়ার ওপরেই অরুচি ধরে যাচ্ছে।

বিরূপাক্ষ গম্ভীর ভাবে বললেন : রেলের নিন্দে করো না। রেল আমাদের অন্নদাতা।

বলে একটা হোটেলের দিকেই পা বাড়ালেন।

আজ আমরা সন্ধ্যাবেলাতেই খেয়ে নিলুম। ক্ষিদে পেয়েছিল বলে নয়, বোধ হল মিনতির বিদ্রূপ এড়াবার জন্যে। একবার স্টেশনে পৌঁছে গেলে খাবার জন্যে দ্বিতীয়বার আর বেরোতে ইচ্ছা করবে না। তখন ইচ্ছার বিরুদ্ধেই স্টেশনের খাবার খেতে হবে।

বিরূপাক্ষ স্টেশনে পৌঁছে এনকোয়ারি অফিসে এসে উপস্থিত হলেন। বললেন : উজ্জয়িনীর গাড়ির খবরটা এখনই নেওয়া যাক।

ইন্দোর থেকে উজ্জয়িনী যাবার ট্রেন আছে দু লাইনেই। মিটার গেজ ও ব্রড গেজ ট্রেন পাশাপাশি যায় না, যায় দূর দিয়ে। কিন্তু সময় প্রায় একই রকম লাগে। ইন্দোর থেকে রাতলামেও ট্রেন যায়। রাতলামেও ছোট ও বড় লাইন আছে। এই ট্রেন খাণ্ডোয়া থেকে ইন্দোর হয়ে রাতলামের উপর দিয়ে আজমের পর্যন্ত যায়। চিতোর গড়ে যেতে হলে নামতে হয় না, কিন্তু উদয়পুরে যেতে হলে গাড়ি বদল করতে হয় চিতোব গড়ে। খাণ্ডোয়া থেকে আজমের প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার রাস্তা।

খবর পাওয়া গেল যে সকাল আটটার আগে ছোট লাইনের ট্রেন আছে। সে গাড়ি উজ্জয়িনীতে পৌঁছয় বেলা প্রায় সাড়ে এগারটার সময়। তার পরে দুপুর ও সন্ধ্যা বেলায়ও ট্রেন আছে। কিন্তু মিনতি বললেন : সকালটাই তাহলে গাড়িতে নষ্ট হবে।

বিরূপাক্ষ ব্রডগেজ ট্রেনের কথা জানতে চাইলেন। তাতে জানা গেল যে দুপুর তিনটের পর একখানা ট্রেন ছেড়ে গেছে। আর

একখানা ট্রেন আছে রাত প্রায় দশটার সময়, বারোটার পরে সে ট্রেন উজ্জয়িনীতে পৌঁছবে।

বিরূপাক্ষ বললেন: হল না। অত রাতে শোবার ব্যবস্থা করা দুষ্কর হবে।

আমি বললুম: তাহলে ভোর বেলার বাসে যাওয়া যাক। বাসে শুনেছি সময় খুব কম লাগে।

আমার পরামর্শ শুনে বিরূপাক্ষ চটে উঠলেন। বললেন: পাগল হয়েছেন! রেলের পাস থাকতে পয়সা খরচ করে বাসে যাব!

মিনতি লজ্জিত ভাবে বললেন: ওঁকে ও কথা বলছ কেন! ওঁকে তো পয়সা খরচ করতেই হবে। রেলেও পয়সা লাগবে, বাসেও লাগবে। যাতে সুবিধা বেশি, সেই কথাই ওঁর মনে হয়।

বিরূপাক্ষ শান্ত হলেন। তার পরে বললেন: ঠিক আছে, ঐ দশটার গাড়িতেই যাওয়া যাবে। ট্রেন তো আগেই লাগবে প্ল্যাটফর্মে, বারোটার আগেই এক ঘুম দিয়ে নেওয়া যাবে। কী বলেন?

বলে আমার দিকে তাকালেন।

বললুম: আমার তাতে কোন কষ্ট হবে না। আর কষ্ট হলেও পরের দিনের আনন্দে তা বেমালুম ভুল হয়ে যাবে।

মিনতি খুশী হলেন আমার কথা শুনে। বললেন: খোকাকে তাহলে এখনই শুইয়ে দিই।

কিন্তু অভিমন্যু আপত্তি জানাল প্রবল ভাবে। বলল: মামার কাছে তো এখন আমি গল্প শুনব!

মিনতি হেসে বললেন: সামলান এখন।

কিন্তু সামলানো যে কঠিন কাজ ওয়েটিং রূমে পৌঁছেই তা বুঝতে পারলুম। কী গল্প বলব! ছোটদের উপযোগী গল্প বলার অভ্যাস কি আমার আছে! সহসা কোন গল্পের কথা ভেবে না পেয়ে আমি করুণ ভাবে তাকালুম মিনতির দিকে।

মিনতি বললেন: রাজা বিক্রমাদিত্যের গল্প বলুন।

বিক্রমাদিত্যের গল্প !

হঠাৎ মনে পড়ে গেল তালবেতালের কথা। অভিমন্যুকে জিজ্ঞাসা করলুম : তালবেতালের গল্প শুনেছ ?

শুনি নি তো !

বলে অভিমন্যু আমার মুখের দিকে তাকাল।

বেতাল পঞ্চবিংশতি নামে একখানি ছোটদের বই ছেলে বেলায় পড়েছিলুম। পঁচিশটি গল্প ছিল তাতে। নানা ধরনের গল্প। কিন্তু সে গল্পগুলি আমার মনে ছিল না। চেষ্টা করলে হয়তো দু-একটি গল্প মনে করতে পারব। কিন্তু মূল কাহিনীটি মনে ছিল। বললুম : তাহলে আজ তালবেতালের গল্পই তোমাকে বলি।

বিরূপাক্ষ আশ্চর্য হয়ে বললেন : এ সব গল্প আপনার মনে আছে ?

বললুম : কিছু কিছু আছে।

বল না মামা !

বলে অভিমন্যু আমাকে তাড়া দিল।

বললুম : আমরা তো উজ্জয়িনী যাচ্ছি। এই উজ্জয়িনীতেই রাজা ছিলেন বিক্রমাদিত্য। খুব সাহসী রাজা। তাঁরই সাহসের গল্প হল তালবেতালের গল্প।

বিক্রমাদিত্যের মতো বড় রাজা সে যুগে ছিল না। তাঁর মতো ভাল রাজাও ছিল না কোন রাজ্যে। প্রজাদের সুখের জন্যেও তাঁর খুব চিন্তা ছিল। একবার ভাবলেন যে প্রজারা কী ভাবে দিন কাটাচ্ছে তা তিনি ঘুরে ঘুরে নিজের চোখে দেখবেন। ভর্তৃহরি তাঁর ছোট ভাই। তাঁকে তিনি বললেন, তুমি রাজ্য চালাও, আমি কিছু দিন ভ্রমণ করে আসি। বলে ছোট ভাইকে রাজা দিয়ে বিক্রমাদিত্য বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই ভর্তৃহরির ঝগড়া হয়ে গেল তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। বললেন, আর সংসারে থেকে কাজ নেই। রাজ্য ছেড়ে দিয়ে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে বনে চলে গেলেন। এ দিকে দেবরাজ ইন্দ্র দেখলেন ভারি বিপদ।

বিক্রমাদিত্যের রাজ্য দেখবে কে! তিনি এক যক্ষকে বললেন, তুমি এখন রাজ্যের দেখা শুনো কর।

অভিমন্যু আমার মুখের দিকেই চেয়েছিল। প্রশ্ন করল: ' যক্ষ কে মামা?

বললুম: কুবেরের নাম শুনেছ?

অভিমন্যু বলল: না।

বললুম: কুবের হলেন ধনরত্নের দেবতা, হিমালয়ের উত্তরে কৈলাসে তাঁর বাড়ি। যক্ষরা হল তাঁর প্রজা। কারও ধনরত্ন বা রাজ্য রক্ষা করতে হলে যক্ষদের দরকার। চলতি কথায় আমরা যখ বলি। যে ধন যখে আগলায় তাকে বলি যখের ধন। এই রকমেরই একজন যক্ষ তখন ইন্দ্রের আদেশে বিক্রমাদিত্যের রাজ্য আগলাতে লাগল।

এ দিকে ভর্তৃহরি যে রাজ্য ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেছেন, এ কথা চারি দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল। ক্রমে সে খবর বিক্রমাদিত্যের কানেও পৌঁছল। বিক্রমাদিত্য ভাবলেন, প্রজাদের তো তা হলে ভারি বিপদ হয়েছে। ব্যস্তসমস্ত হয়ে দেশে ফিরে এলেন। কিন্তু উজ্জয়িনীতে ঢুকতে পারলেন না।

কেন?

কী করে ঢুকবেন! অন্ধকার রাত হলে কী হবে, যক্ষ তাঁকে বলল, উঁহু, যাকে তাকে আমি নগরে ঢুকতে দেব না। বিক্রমাদিত্য রেগে গিয়ে বললেন, তুমি কে হে যে আমাকে বাধা দিচ্ছ? যক্ষ বলল, এ দেশে রাজা নেই, ইন্দ্রের হুকুমে আমি তাই রাজ্য রক্ষা করছি। বিক্রমাদিত্য বললেন, আমিই তো দেশের রাজা। ছোট ভাই ভর্তৃহরিকে ভার দিয়ে আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম। সে নেই শুনেই ফিরে আসছি। কিন্তু যক্ষ বলল, উঁহু, তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করি না। বিক্রমাদিত্য বড় বীর ছিলেন শুনেছি, যুদ্ধে আমাকে হারিয়ে তবে এই নগরে প্রবেশ কর।

অভিমন্যু বলল : তারপরে বুঝি খুব যুদ্ধ হল ?

বললুম : ভীষণ যুদ্ধ। অনেক ধস্তাধস্তির পর বিক্রমাদিত্য যখন যক্ষকে নিচে ফেলে তার বুকের ওপরে চেপে বসলেন, তখন যক্ষ বলল, এইবারে বুঝতে পেরেছি যে তুমিই বিক্রমাদিত্য। তুমি আমাকে মেরো না। আমিও তোমার প্রাণ বাঁচাব। বিক্রমাদিত্য হেসে বললেন, বেশ মজার কথা তো। এই মুহূর্তে আমি তোমাকে মেরে ফেলতে পারি, আর তুমি বলছ আমার প্রাণ বাঁচাবে! তুমি কি পাগল নাকি!

সত্যিই তো।

সত্যি নয়। যক্ষও হেসে বলল, তুমি কিছুই জান না, তাই এই কথা বলছ। সব শুনলে তুমি বুঝতে পারবে যে তোমাকে বেঁচে থাকতে হলে আমার কাছে সব কিছু জেনে নিতে হবে। তা না হলে তোমার জীবন বিপন্ন হতে আর দেরি নেই। বিক্রমাদিত্য বুঝতে পারলেন যে এই যক্ষ বোধহয় ভূত ভবিষ্যৎ জানে বলেই এই কথা বলছে। তাই তৎক্ষণাৎ তাকে মুক্তি দিয়ে বললেন, এবারে বল তো কী বলতে চাও।

বিরূপাক্ষ আমাকে বললেন : যে ভাবে আপনি গল্প শুরু করেছেন, আজ রাতে তা শেষ হবে তো!

বললুম : গল্প তো শুরু করি নি, গল্পের ভূমিকা এখন বলছি।

বিরূপাক্ষ চোখ কপালে তুলে বললেন : সর্বনাশ!

বললুম : ভয় পাবেন না, সব জিনিসই সংক্ষেপে বলা যায়, এইখান থেকে গল্প কিছু সংক্ষেপ করব।

তারপরে অভিমন্যুকে বললুম : যক্ষ রাজাকে বলল এক সন্ন্যাসীর কথা। সেই সন্ন্যাসী গোদাবরী নদীর তীরে এক শ্মশানে মন্ত্র সাধনা করছে। সে একজন রাজাকে যোগবলে বধ করে একটা শিরীষ গাছে ঝুলিয়ে রেখেছে বেতাল করে।

অভিমন্যু বলল : বেতাল মানে কী মামা ?

বললুম : বেতাল মানে হল পিশাচ, ভূত প্রেতের মতো কোন জীব। মরে গিয়েও জ্যান্ত মানুষের মতো কথা বলতে পারে। যক্ষ বিক্রমাদিত্যকে বলল, এই সন্ন্যাসী তোমাকেও মেরে ঐরকম করে রাখতে চায়।

তাতে কী লাভ হবে সন্ন্যাসীর ?

বললুম : একজনকে তাল আর একজনকে বেতাল এই দুজন পিশাচকে দিয়ে সে যা ইচ্ছে তাই করাবে। একে বলে তাল বেতাল সিদ্ধ পুরুষ। তারপরে শোন যক্ষের কথা। যক্ষ রাজাকে বলল, এই সন্ন্যাসীর কাছে খুব সাবধানে থাকবে। একটু অসাবধান হয়েছ কি প্রাণ যাবে তোমার। বলে যক্ষ নিজের দেশে চলে গেল।

অভিমন্যু বলল : তারপরে কী হল ?

বললুম : তারপরে এক দিন এক সন্ন্যাসী এলেন রাজার কাছে। আশীর্বাদ করে একটি বেল দিলেন রাজাকে। রাজার সন্দেহ হল, তিনি বেল না খেয়ে সেটা তুলে রাখতে দিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী রোজ এসে রাজাকে একটি করে বেল দিতে লাগলেন। আর রাজা বেল তুলেই রাখতে লাগলেন। কিন্তু এক দিন একটা বেল হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল। আর তার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটি সুন্দর রত্ন। রাজা আশ্চর্য হয়ে বললেন, এ কি! সন্ন্যাসী বললেন, সমস্ত বেলের মধ্যেই এমনি এক একটি রত্ন আছে। সব বেলগুলো ভেঙে দেখা গেল, কথা ঠিকই। রাজা বললেন, এসব মণিরত্ন আপনি কোথায় পেলেন, আর আমাকেই বা দিচ্ছেন কেন ? সন্ন্যাসী রাজাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, রাজার কাছে তো শুধু হাতে আসতে নেই, আর আমার একটা উদ্দেশ্যও আছে। শ্মশানে আমি যোগ সাধনা করি। আপনি এক দিন সন্ধ্যার সময় এলে আমার সিদ্ধিলাভ হবে। সামনেই আছে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথি। সেদিন আপনি আসুন।

অভিমন্যু ভয়ে ভয়ে বলল : রাজা গেলেন তাঁর কাছে ?

হেসে বললুম : রাজা তো ভীতু ছিলেন না। নির্ভয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন সন্ন্যাসীর শ্মশানে। দেখলেন, তাঁর চারি দিকে অসংখ্য ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী নেচে বেড়াচ্ছে। আর সন্ন্যাসী দুটি মড়ার মাথা নিয়ে বাজনা বাজাচ্ছেন। সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে রাজা বললেন, বলুন কী করতে হবে। সন্ন্যাসী তখন সেই বেতালের কথা বললেন, শিরীষ গাছে যে মরা মানুষটি ঝোলানো আছে, তাকে সেখান থেকে নামিয়ে আনতে হবে। কঠিন কাজ। কিন্তু রাজা একটুও ভয় পেলেন না। জলঝড়ের মধ্যে সেই শিরীষ গাছটি খুঁজে বার করে বেতালকেও ঝুলতে দেখলেন। গাছটি যেন আগুনের মতো জ্বলছে, আর চারি দিক থেকে মার মার কাট কাট শব্দ হচ্ছে।

বিক্রমাদিত্য বেশ বুঝতে পারলেন যে যক্ষ তাঁকে ঠিকই বলেছিল। এই সন্ন্যাসী এবারে তাঁকেও মেরে এমনি করে গাছে ঝুলিয়ে রাখবে।

অভিমন্যু হঠাৎ বলে উঠল : রাজা তাহলে পালিয়ে গেলেন না কেন ?

বললুম : ভয় পেয়ে পালিয়ে যাওয়া তো রাজার কাজ নয়। রাজার সাহস থাকে খুব বেশি। আর এই রকম সাহস না থাকলে কি রাজা হওয়া যায়!

অভিমন্যু বলল : তবে সন্ন্যাসীকে তরোয়াল দিয়ে কেটে ফেললেন না কেন ?

বললুম : তাহলে তো গল্পই যাবে ফুরিয়ে।

তবে কী করলেন তিনি ?

কী আর করবেন! অনেক কষ্ট করে সেই শিরীষ গাছে গিয়ে উঠলেন। দেখলেন যে বেতাল নিচের দিকে মাথা নিচু করে ঝুলছে। রাজা তার দড়ি কেটে দিতেই বেতাল নিচে পড়ে গিয়ে

কাঁদতে লাগল। রাজা তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এসে তাকে যেই জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে, তোমার এই দুরবস্থা হয়েছে কেন? বেতাল অমনি খিল খিল করে হেসে গাছের উপরে উঠে আবার ঝুলতে লাগল। রাজা কিন্তু নাছোড়বান্দা। এবারে গাছে উঠে বেতালকে চেপে ধরে গাছ থেকে নামলেন। আর তাকে একটা চাদরে বেঁধে নিয়ে চললেন সন্ন্যাসীর কাছে। কিন্তু পথে যেতে যেতে বেতাল বলল, রাজা, নির্বোধ ও মূর্খ লোকেরাই ঘুমিয়ে আর ঝগড়া বিবাদ করে সময় নষ্ট করে। কিন্তু পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান লোকেরা সৎকাজ ও সৎচিন্তা করে সময় কাটায়। এস, আমরাও এ রকম চুপচাপ না চলে গল্প করে পথ চলি। তবে একটা শর্ত আছে। আমি এক একটা গল্প শেষ করে তোমাকে একটা করে প্রশ্ন করব। যদি তার ঠিক উত্তর দাও তো আমি তখনই ফিরে যাব। আর জেনে শুনেও যদি ঠিক উত্তর না দাও তো তোমার বুক ফেটে যাবে। রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, বেশ তাই হবে। তারপর বেতালের গল্প শুনতে শুনতে তিনি সন্ন্যাসীর শ্মশানের দিকে চললেন।

বিরূপাক্ষ এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এইবারে বললেন: বেতাল পঞ্চবিংশতির গল্প তো পঁচিশটা। এইবারে কি একটা করে গল্প বলবেন নাকি?

হেসে বললুম: পঁচিশটা গল্প মনে রাখতে পারি এমন স্মরণ-শক্তি আমার নেই। একটি গল্প মনে আছে। সেটা আপনাকে পরে বলব।

পরে কেন?

বললুম: গল্পটা বললেই বুঝতে পারবেন, কেন পরে বলছি। এখন বেতালের গল্পটা শেষ করি।

মিনতি বললেন: একটু ঘুমিয়ে নিলে ভাল হত খোকা। অনেক রাতে আমাদের গাড়ি।

অভিমন্যু তাড়াতাড়ি বলে উঠল : আমার একটুও ঘুম পায় নি মা। মামার গল্পটা শুনে ঘুমোব।

বললুম : গল্পটা প্রায় শেষ করে এনেছি। রাজা বিক্রমাদিত্য চব্বিশটা গল্প শোনবার পরে বেতালের প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দিয়েছিলেন, আর বেতাল অমনি ফিরে গিয়ে শিরীষ গাছে ঝুলতে আরম্ভ করেছিল। আর রাজা ফিরে গিয়ে আবার তাকে ধরে এনেছিলেন। কিন্তু শেষ গল্পটা শোনবার পরে রাজা বেতালের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে শুধু হাসলেন। বেতাল ভাবল যে রাজা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। তাই বলল, রাজা তোমার বুদ্ধি ও সাহস দেখে আমি সুখী হয়েছি। এবারে তোমাকে একটা উপদেশ দেব। আমার উপদেশ মেনে চললে তোমার কোন বিপদ হবে না, তুমি প্রাণে বেঁচে যাবে। পূজা শেষ করে সন্ন্যাসী তোমাকে বলবেন যে দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর। এ কাজ তুমি কিছুতেই কোরো না, সন্ন্যাসী তোমাকে কেটে ফেলবে। রাজা বললেন, তাহলে কী করব বল। বেতাল বলল, বলবে, আমি রাজা, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কাকে বলে তা তো জানি নে। আপনি দেখিয়ে দিন। আর সন্ন্যাসী যেই তোমাকে তা দেখাবেন, অমনি তুমি তার গলাটা কেটে দিও। তার পরেই একটা ফুটন্ত তেলের কড়া দেখতে পাবে। তার ভেতরে সন্ন্যাসী ও আমাকে ফেলে দিও। তাহলেই তুমি তালবেতাল সিদ্ধ হয়ে পৃথিবীর সম্রাট হয়ে সুখে বাস করতে পারবে।

অভিমন্যু জিজ্ঞাসা করল : রাজা বুঝি তাই করলেন?

বললুম : ঠিক তাই। সন্ন্যাসীর গলা কাটতেই দেবতারা আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। রাজা তারপরে ফিরে এলেন তাঁর রাজধানী উর্জ্জয়িনীতে। বিক্রমাদিত্যের এই উজ্জয়িনী দেখতেই আমরা যাচ্ছি।

মিনতি বলে উঠলেন : আর গল্প নয় খোকা, তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও।

আমি বললুম : সেই ভাল। আমরাও একটু চোখ বুজি।

অভিমন্যু তার মায়ের কাছে গিয়ে একটা বেঞ্চিতে শুয়ে পড়ল। আর মিনতি তাঁর আচল দিয়ে তাকে ঢেকে দিলেন।

কিন্তু বিরূপাক্ষ পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে আমাকে বললেন : বলুন এবারে আপনার সেই গল্পটা।

আমি হেসে বললুম : বেতাল পঞ্চবিংশতি আমরা ছেলেদের বই বলে মনে করি। কিন্তু আসলে তা নয়। তার শেষ গল্পটি বললেই বুঝতে পারবেন যে এটি বড়দেরই বই এবং বিক্রমাদিত্য যে বেতালের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি, সেটি খুব সঙ্গত কারণেই। আপনিও এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না।

বিরূপাক্ষ বললেন : ভূমিকাটি ভাল হয়েছে, এইবারে গল্পটি বলুন।

বললুম : সংক্ষেপেই বলি। এক রাজা যুদ্ধে পরাজিত হবার আগে তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে রাজপ্রাসাদ থেকে পালিয়ে বনে গিয়ে ঢুকলেন। কিন্তু রাণী ও রাজকন্যা আর পথ চলতে পারছিলেন না, রাজা তাই খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহের জন্য তাদের ফেলে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি ফিরবার আগেই অন্য এক দেশের রাজা ও যুবরাজ এসে তাঁদের সেই বন থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করলেন। রাজা বিয়ে করলেন রাজকন্যাকে, আর রাণীকে বিয়ে করলেন যুবরাজ। বেতাল প্রশ্ন করেছিল, এঁদের সন্তান হলে পরস্পরের কী সম্বন্ধ হবে বল তো! বিক্রমাদিত্য এই প্রশ্নের উত্তর দেন নি, তার বদলে হেসেছিলেন একটুখানি। আপনি উত্তর দেবেন?

বলে আমি বিরূপাক্ষর দিকে তাকালুম।

বিরূপাক্ষ কতকটা বিহ্বল ভাবে তাকালেন আমার দিকে, তার পরে বললেন : অসম্ভব প্রশ্ন। আমার মতো মোটা বুদ্ধির লোক এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না।

১৬

বম্বে ছেড়ে আসবার পরে আজ আমি অনেক কিছু দেখলুম, শুনলুমও অনেক কিছু। কিন্তু কেন জানি না, আমার মনে হল যে দেখে আনন্দ পাবার সেই পুরনো মন আমি বুঝি হারিয়ে ফেলেছি, ভ্রমণের সে আকর্ষণ আজ আমাকে প্রলুব্ধ করছে না। এইতো কয়েক দিন আগে ট্রেনে উঠবার সময় আমি একজন ভাল সঙ্গী খুঁজতুম। দেখে যেমন জানা যায়, তেমনি যাত্রীদের কাছে শুনে বা ভ্রমণ কাহিনী পড়েও অনেক কিছু জানা সম্ভব। যা দেখবার সুযোগ পাই নে, তা কারও কাছে শুনে জানবার চেষ্টা করি, আর তাও সম্ভব না হলে বই পড়ে জানা ছাড়া অন্য পথ আর পাই নে। এত বড় দেশ আমাদের! এত জায়গা আছে দেখবার! এত কথা আছে জানবার! এত গল্প আছে শোনবার! সে সব কি একা দেখে শুনে আর জেনে শেষ হয়! একটা মানুষের সারা জীবনের চেষ্টাতেও হয়তো সম্ভব হয় না। তাইতেই আমি ঘরের বাহিরে বেরোলেই সঙ্গী খুঁজি। যে অনেক দেখেছে, অনেক শুনেছে, পড়েছেও অনেক। সে রকম একজন সঙ্গীর সন্ধান পেলে আনন্দে মন ভরে ওঠে। অন্যের জানা দিয়ে নিজের জানার অভাব ভরে নিতে চেষ্টা করি। আজ মাণ্ডুর পথেও এমনি একটি ছেলের সঙ্গ পেয়েছিলুম। কিন্তু সে একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে। নিজে আমি কোন চেষ্টাই করি নি। সে রকম কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না।

এই যে আজ রাতের গাড়িতে আমরা উজ্জয়িনী চলেছি, আমার মন যেন চলতে চাইছে না। বিরূপাক্ষ বাহির থেকে ঘুরে এসে বললেন: প্ল্যাটফর্মে গাড়ি এসে গেছে। আর দেরি করে লাভ কী!

সত্যিই কোন লাভ নেই। রাত্রি যখন এই ওয়েটিং রুমে কাটাতে হবে না, তখন গাড়িতে গিয়ে ওঠাই ভাল। কিন্তু মিনতি বললেন: তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠেই বা করবে কি! আবার তো নামতে হবে।

বিরূপাক্ষ বললেন: যাত্রা মানেই ওঠা-নামা। আগে ভাগে উঠতে পারলে একটুখানি পা ছড়িয়ে বসতে পারা যাবে। আসুন আর দেরি করবেন না।

বলে আমাকেও তিনি তাড়া দিলেন।

আমি কোন প্রতিবাদ করলুম না, কোন আগ্রহ দেখাতেও পারলুম না। ওঁদের সঙ্গে গিয়ে ওঁদেরই পছন্দ মতো একটা গাড়িতে উঠে একটা কোণার দিকে গিয়ে বসে পড়লুম। এই চল্লিশ মাইল পথ যেতে দু ঘণ্টার বেশি সময় লাগবে। এই সময়টুকু আমাকে হয়তো চোখ বুজেই কাটাতে হবে।

মিনতি একটু জায়গা করে অভিমন্যুকে শুইয়ে দিলেন। বিরূপাক্ষও জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে একটা সিগারেট ধরালেন। কিন্তু আমি আমার জায়গায় একেবারে নিঃশব্দে বসে রইলুম।

অভিমন্যুকে শুইয়ে দিয়ে মিনতি আমার কাছে এসে বসলেন। তার পরে আমার দিকে চেয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, বাড়িতে কাকে ফেলে এসেছেন বলুন তো?

সহসা এই প্রশ্নের অর্থ আমি বুঝতে পারি নি। তাই আরও কিছু শোনবার জন্যে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

মিনতি বললেন: বাড়িতে, না অন্য কোথাও?

বম্বের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনের কথা আমার মনে পড়ে গেল। মামা মামীর সঙ্গে স্বাতিও এসেছিল আমাকে ট্রেনে তুলে দিতে। খুব কাছাকাছি এসেও সে আমার সঙ্গে কথা বলেছিল। মিনতি কি সেই দৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন! ঠিক মনে পড়ল না সেই কথা। তাই তাঁর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমি একটুখানি হাসলুম।

অভিমন্যু যে তার মায়ের কথা শুনতে পেয়েছিল, তা বুঝতে পারলুম তার প্রশ্ন শুনে। হঠাৎ আমাকেই জিজ্ঞাসা করে বসল: মামীমা কোথায় মামা?

তার প্রশ্ন শুনে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। এতটুকু ছেলেও কি তার মায়ের মতো রসিকতা করতে শিখেছে! কিন্তু মিনতি তাঁর ছেলের গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন: এ মামার মামীমা নেই রে।

আর আমাকে বললেন: সেদিন ওর এক মামা এসেছিলেন মামীমাকে সঙ্গে করে। সেই কথাই বোধহয় ওর মনে পড়েছে।

ব'লেই হেসে ফেললেন।

আমি একটু অপ্রস্তুত ভাবে বললুম: হাসছেন যে!

হাসছি সেই মামার কাণ্ড দেখে।

মিনতি থামলেন। কিন্তু অনেক রাত হয়েছে বলে আমি আর কোন প্রশ্ন করলুম না।

কী ভেবে মিনতি আবার নিজেই বললেন: সম্বন্ধে আমার এক দাদা। থাকেন খড়দহে, কাজ করেন কলকাতায়। বিয়ে হয়ে অবধি বৌদির বেড়াবার সখ। কিন্তু দাদার নানা ওজর আপত্তি। কাজেই বাপের বাড়ি শ্যামনগর থেকে শ্বশুর বাড়ি খড়দহ, আর কলকাতা নাকি দু একবার দেখে গেছেন। দাদা সেই বৌদিকে এবারে দেশ ভ্রমণে এনেছিলেন। খড়দহ থেকে শিয়ালদহ। তার পর হাওড়া থেকে অণ্ডাল। সেখান থেকে আমাদের উখরা। উখরা এসে বৌদির কী পুলক!

কিন্তু মিনতির কণ্ঠে আমি পুলকের ধ্বনি শুনলুম না। মনে হল, বেদনায় তাঁর পরিহাস বুঝি থমথম করছে। হয়তো তাঁর নিজের হৃদয়েও কোন গভীর ক্ষত আছে। কোন প্রশ্ন করলেই সেই ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হবে। তাই সে কথা এড়িয়ে যাবার জন্যে বললুম: গাড়ি ছাড়লেই আমরা বোধহয় উজ্জয়িনী পৌঁছে যাব।

মিনতি বুঝলেন যে এই প্রসঙ্গ আমি এড়িয়ে গেলুম। তাই আর কোন কথা কইলেন না।

খানিকটা তফাতে বিরূপাক্ষ তখন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প শুরু করেছিলেন। তিনি যে উজ্জয়িনীর সম্বন্ধেই নানা সংবাদ সংগ্রহ করছেন তাতে সন্দেহ নেই। আমি তাঁদের কথোপকথনের দিকে খানিকটা মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলুম।

বিরূপাক্ষ প্রশ্ন করলেন: উজ্জয়িনী আপনার ভাল লাগে না?

ভদ্রলোক গম্ভীর ভাবে বললেন: না।

সে কি!

ভদ্রলোক বললেন: সে কালিদাস নেই, সে উজ্জয়িনীও আর নেই।

বলে মেঘদূতের একটা শ্লোক মনে করবার চেষ্টা করলেন। তার বাঙলা অনুবাদ আমার মনে আছে—কবি নরেন্দ্র দেবের অনুবাদ।—

জানি বন্ধু, উজ্জয়িনী পড়ে বাঁকা পথে;
যাত্রী তুমি উত্তরের, তবু কোনো মতে—
ঘুরে যেও উজ্জয়িনী, হোয়োনা বিমুখ;
সৌধ বুকে দিও সখা তব-সঙ্গ-সুখ!
পুরনারী সেথা যারা,
চকিত নয়না তারা!
বিজলী চমকে চোখে,
আঁখি ঠারে মরে লোকে!
সে লোচন-ফুল-বাণ
যদি নাহি বিঁধে প্রাণ,
জনম জীবন তবে
সবই তব বৃথা হবে!

কালিদাসের যক্ষ পূর্ব মেঘকেই এই অনুরোধ জানান নি, তাঁর কণ্ঠে কবির বাণী উঠেছিল প্রতিধ্বনিত হয়ে। সারা ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে কবি কালিদাসের এই নিমন্ত্রণ বাণী। ভারতের আত্মার

তখন উজ্জয়িনীতে উন্মেষ হয়েছে। উজ্জয়িনীকে বাদ দিয়ে কি ভারতদর্শন সম্পূর্ণ হয়।

বিরূপাক্ষ কতকটা হতাশ ভাবে বললেন: উজ্জয়িনীতে কি এখন দেখবার কিছুই নেই!

ভদ্রলোক বললেন: শুধু শিপ্রা নদী আছে। সন্ধ্যা বেলায় সেই নদীর ধারে গিয়ে বসলে বেদনায় আপনার মন ভরে যাবে।

বেদনা কিসের?

সেদিনের সেই স্বর্ণযুগ তো শেষ হয়ে গেছে, সে যুগ আর কোন দিন ফিরে আসবে না।

বিরূপাক্ষ বললেন: নাই বা এল!

ভদ্রলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: মানুষ তাহলে বাঁচবে কী নিয়ে বলুন! শুধু শ্রম আর বিশ্রাম! স্বপ্ন না দেখলে কি মানুষের জীবন মধুর হয়, না মুক্তির আস্বাদ আসে জীবনের কঠিন যুদ্ধে।

আমি আশ্চর্য হলুম ভদ্রলোকের এই মন্তব্য শুনে। এ যেন কোন কবি-মনের কথা, সাধারণ এক যাত্রীর কথা নয়। জীবনে এ এক পরম বিশ্বাসের কথা, এ কথার প্রতিবাদ করার ইচ্ছা হওয়া উচিত নয়। বিরূপাক্ষও কোন প্রতিবাদ করলেন না। বললেন: উজ্জয়িনীতে আমরা বেশিক্ষণ থাকব না। পুরো একটি দিনও না।

ভদ্রলোক বোধহয় ভাবলেন যে তাঁর কথাতেই বিরূপাক্ষ আগ্রহ হারিয়েছেন। তাই তাড়াতাড়ি বললেন: না না, সে রকম কথা আমি বলি নি। শহরটি আপনাদের হয়তো ভালই লাগবে। তীর্থস্থান তো, ঐতিহাসিক স্থানও বটে। তবে এক বেলাতেই আপনারা সব দেখে নিতে পারবেন।

রাত দশটার কিছু আগেই আমাদের ট্রেন ছাড়ল। বাহিরে তখন অন্ধকার এমন ঘনিয়ে উঠেছে যে পথের দুধারে আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। একদল ক্লান্ত মানুষ গাড়ির ভিতরে শুয়ে বা

এলিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে।

কিন্তু বিরূপাক্ষ তখনও সেই ভদ্রলোকের কাছে উজ্জয়িনীর অনেক কথা জেনে নিচ্ছিলেন। ভদ্রলোক আরও একটি শ্লোক বলবার চেষ্টা করলেন। এ শ্লোকটির অনুবাদও আমার মনে আছে।—

উজ্জয়িনীর প্রাসাদ-পুরে
পুষ্পাসবে প্রসাদ ঝুরে;
সুন্দরীদের আল্‌তা-রাগে
অলঙ্কৃত পায়ের দাগে
আলিম্পনের চিত্রলেখায়
লক্ষ রমার চরণ রেখায়
লক্ষ্মীমন্ত অবন্তী দেশ,
দেখবে পথের থাকবে না ক্লেশ!

কিন্তু পথের ক্লেশের কথা আমি ভাবছি না। দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবার সময় পথের ক্লেশ আমার কাছে কোন ক্লেশ বলেই মনে হয় না। আমার মনে পড়েছিল মিনতির সেই প্রশ্ন, বাড়িতে আমি কাকে ফেলে এসেছি! বাড়িতে না অন্য কোথাও!

মিনতি ঠিকই বুঝেছেন। বাড়িতে আমি কাউকে ফেলে আসি নি। কিন্তু বাহিরে যাকে ফেলে এলুম, তার টান যে ঘরের মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু আমি কি তাকে ফেলে এলুম, না সে-ই আমাকে ফিরিয়ে দিল! কেন ফেরাল! জো রায়ের জন্যে! জো রায়কে সে কি আমার জায়গায় বসাবে! আমাকে না সরিয়ে দিলে সে কি তা পারত না!

বম্বেতে জো রায়কে আমাদের ডেকে আনতে হত না। খবর পেলে জো রায় নিজে এসেই জাঁকিয়ে বসতেন। মামীর সস্নেহ প্রশ্রয় আছে। মামার বিরাগের চেয়ে অনেক বেশি নির্ভয়। বাপের শাসনের অভাবে ছেলে যত নষ্ট হয়, তার চেয়ে বেশি নষ্ট নয় মায়ের আদরে। মায়ের আদরের উৎস জানা থাকলে বাপের শাসনকেও

নিঃশঙ্কায় উপেক্ষা করা যায়। জো রায় এই সত্য জানেন। আমাকে চিনেও তাই ভয় পান নি। মামীকে মুরুব্বী ধরেছেন। মামী তাঁর রূপ দেখে মুগ্ধ হন নি।; পুরুষের রূপ দেখে মুগ্ধ হবার বয়স তিনি অনেক আগেই অতিক্রম করে এসেছেন। সুখে সংসার যাপনের জন্য রূপের চেয়ে বিত্তের প্রয়োজন অনেক বেশি। রূপের অভাবে ঘর ভাঙে না, ভাঙে অর্থের অভাবে অসচ্ছলতায় ও দুর্নীতিতে। স্বাতির ঘর মামী শক্ত করে বেঁধে দেবেন বলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কিন্তু মামা এই রূপ আর বিত্তের চেয়েও বড় কিছু দেখতে পেয়েছেন। সে বোধহয় মানুষের হৃদয়। হৃদয়েরও যে একটা রূপ আছে, আছে ঐশ্বর্য, তা তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করেন। আকাশের চাঁদ দিয়ে হয় না হৃদয়ের রূপের বিচার, চাঁদির টাকাতেও হয় না তার ঐশ্বর্যের পরিমাপ। এই বিচারের জন্য চাই আর একটি দরদী হৃদয়। মামার সেই হৃদয় আছে বলেই আমার বিশ্বাস। তাঁর বিচারে নিশ্চয়ই কোন ভুল হবে না।

কিন্তু স্বাতি আমাকে ফিরিয়ে দিল! ফিরিয়ে দেওয়াই যদি তার উদ্দেশ্য হয় তো পুনা ও পানাজীর গল্প যে একেবারে অর্থহীন হয়ে যাবে। এ কটি দিনের প্রতিটি মুহূর্ত সে আনন্দে আমার অন্তর ভরে দিয়েছে। কোনখানে তো ফাঁকি দেয় নি, ফাঁকও রাখে নি কোথাও। তার আন্তরিকতায় অবিশ্বাস করলে যে অমানুষের কাজ হবে।

মালাবার হিলে জো রায়ের সঙ্গে পুনর্মিলনের ঘটনাটিও আমার মনে পড়ছে। এই ঝুলন্ত বাগান দেখবার উৎসাহ মামা মামীর ছিল না। তাঁরা এক জায়গায় বসে আমাদের ঘুরে ফিরে দেখবার অনুমতি দিয়েছিলেন। পাহাড়ের পূর্ব দিকে একটা পথ ধরে আমরা খানিকটা নেমে গিয়েছিলুম। পছন্দ মতো একটা স্থান বেছে নিয়ে পাশাপাশি বসেছিলুম দুজন। অপরাহ্ণের স্তিমিত

রৌদ্রে মেরিন ড্রাইভ দেখা যাচ্ছিল অর্ধচন্দ্রের মতো। দক্ষিণের সমুদ্র নয় তরঙ্গসঙ্কুল, স্থিরও নয়। ছলছল করে প্রাণের আবেগে উচ্ছল হয়ে স্বাতি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ইতিহাসের কথা তোমার আজ মনে পড়ছে না?

আমি হেসে বলেছিলুম, অতীতের চর্চা করে রিক্ত মানুষ।

স্বাতি বলেছিল, হঠাৎ নিজেকে ধনী ভাবছ কেন?

উত্তরে বলেছিলুম, ধন পেয়েছি বলে।

সে কি আজ নতুন পেয়েছ?

বলেছিলুম, নতুন নয়, তবে ভয় ছিল দস্যুতে কেড়ে নেবার।

সকৌতুকে স্বাতি জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ বুঝি সে ভয় আর নেই!

নির্ভয় হয়েছি, সে কথা বলবার অবকাশ আমি পাই নি। তার আগেই আমি অদূরে কোন পরিচিত মানুষের সন্ধান পেয়েছিলুম। উপর থেকে সে নিচে নামছিল। যাকে চেনা মানুষ ভাবছিলুম, তাকে আড়াল করে ছিল একটি পার্শী মেয়ে, তন্বী সুন্দরী। তার পায়ের ছন্দে আর মুখের হাসিতে একটা প্রাণবন্ত জীবনের ঘোষণা দেখেছিলুম। পুরুষটিকে চিনতে আমার বেশিক্ষণ সময় লাগে নি। যাকে সন্দেহ করেছিলুম, সেই জো রায়কে দেখেই নিঃসন্দেহ হয়েছিলুম।

কিন্তু স্বাতির দিকে তাকিয়ে দেখেছিলুম যে তার দৃষ্টি অন্য ধারে। জো রায়কে সে বোধ হয় দেখে নি। দেখে থাকলে এমন নির্বিকার ভাবে বসে থাকত না। আমি কী বলব ভেবে পাই নি। কিন্তু স্বাতি বলেছিল, আর কতক্ষণ বসে থাকব?

আমি বলেছিলুম, এখানে ভাল লাগছে না বুঝি?

স্বাতি উত্তর দিয়েছিল, বাবা মা অপেক্ষা করছেন কিনা, তাই বলছি।

অন্যত্র স্বাতি এ রকম কথা বলে নি। আমাকেই স্মরণ করিয়ে

দিতে হয়েছে। তাইতেই তার এই প্রস্তাব আমার কাছে কেমন বিসদৃশ মনে হয়েছিল। বলেছিলুম, এ জায়গা যদি ভাল না লাগে তো কোথায় ভাল লাগবে জানি নে।

স্বাতি হেসে বলেছিল, এলিফেণ্টার গুহা।

বলেছিলুম, পৃথিবীটা কি তোমার ছোট হয়ে আসছে?

এ কথার উত্তরে স্বাতি বলেছিল, নিজের জন্যে একটা জগৎ গড়বার চেষ্টা করছি। সেখানে জনতা থাকবে না।

জিজ্ঞাসা করেছিলুম, একজন থাকবে তো?

স্বাতি গম্ভীর ভাবে বলেছিল, ভেবে দেখব।

আমি বলেছিলুম, তবে আমার আরজি আজই পেশ করে রাখলুম।

স্বাতি এ কথার উত্তর দেয় নি। উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, চল।

কিন্তু পাহাড়ের উপর পর্যন্ত আমরা পৌঁছতে পারি নি। নিচে থেকে জো রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল, আরে গোপালবাবু যে! কী ব্যাপার! কবে এলেন?

ভদ্রলোক এক রকম ছুটতে ছুটতেই এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু একা। সেই পার্শী মেয়েটি তার সঙ্গে ছিল না। আমার মনে হয়েছিল যে সেই মেয়েকে সে লুকিয়ে রেখে এসেছিল। আমাদের সংবাদ সংগ্রহ করে আবার তার কাছে ফিরে যাবে।

জো রায়ের সব কথা এখন মনে পড়ছে না। শুধু এইটুকু মনে পড়ছে যে সৌজন্যে ও শিষ্টাচারে মামা মামীকে এক রকম বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। বলেছিল, কাল সকালেই আপনাদের হোটেলে এসে জুটব। আপনাদের বম্বে দেখাবার ভার নিলুম আমি। আজ সন্ধ্যা বেলায় বড় জরুরি কাজ আছে।

বলে আমাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে বিদায় নিয়েছিল। আর স্বাতি হেসেছিল আমার মুখের দিকে চেয়ে। বড় রহস্যময় হাসি। সে কি ঐ পার্শী মেয়েটিকে দেখতে পেয়েছিল! না আমাকে দেখেই হেসেছে করুণার হাসি!

কিন্তু তখন আমি স্বপ্নেও ভাবি নি যে স্বাতি জো রায়কে এড়িয়ে যাবে সুকৌশলে। পুনা যাবার নাম করে সে ভোর বেলাতেই আমাদের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনে টেনে আনল। মামীর প্রচণ্ড অমতেই আমরা পুনা যাত্রা করলুম। তারপর পুনা থেকে গোয়া।

জো রায়ের আগ্রহের কথাও আমার মনে পড়ল। ভদ্রলোক বোধহয় সকালে উঠেই আমাদের হোটেলে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। ম্যানেজারের কথা তাঁর নিশ্চয়ই বিশ্বাস হয় নি। সন্ধ্যা বেলায় যাদের দেখেছে মালাবার হিলে, ভোর বেলাতেই তারা পালিয়ে যাবে, এ বড় অসম্ভব কথা। তবু জো রায় দমবেন না, আবার আসবেন। যতবার ধরা না যায়, ততবার আসবেন। সোমনাথের পথে স্বাতি যে তাঁকে নামিয়ে দিয়েছিল, সে কথা হয়তো ভুলেই গেছেন। মনে থাকলেও গায়ে কোন অপমান মেখে রাখেন নি। পুরুষকে ধরা দেবার জন্যেই তো বারে বারে নারী তাকে ফিরিয়ে দেয়! প্রেমের পরীক্ষা হয় এই ফেরানোর খেলায়।

তারপর?

তারপরের কথা ভাবতে আমার ভয় হয়। এই ভয় আমার আগে ছিল না। এই ভয় আমার নূতন দেখা দিয়েছে। যার কিছু নেই, তার হারাবার আবার ভয় কি! আমি কি কিছু পেয়েছি যে হারাবার ভয় আজ নূতন জেগেছে! আমার বুকের ভিতর একটা অদ্ভুত ব্যথা টন টন করে উঠল।

মিনতি ঠিকই ধরেছেন। ঘর নেই, তবু আমার ব্যথা আছে। ঘরের মানুষ বুঝি বাহিরে ফেলে এসেছি। সেই দুর্ভাবনাতেই মন আজ অশান্ত হয়েছে। ভ্রমণের আনন্দ আজ পদে পদে যাচ্ছে থিতিয়ে।

আমরা কি উজ্জয়িনী পৌঁছে গেলুম!

১৭

যে ভদ্রলোকের সঙ্গে বিরূপাক্ষ কথা বলছিলেন, তিনি যে রেলের লোক আমি তা বুঝতে পারি নি। উজ্জয়িনীতে নামবার পরে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, বললেন: আমার আত্মীয় মিস্টার বারিদে।

আত্মীয়!

বলে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলুম।

বিরূপাক্ষ প্রসন্ন চিত্তে বলেছিলেন: আমরা এক বিরাট পরিবারের লোক। রেল পরিবার। এখানে আমার কোন ভাবনা নেই।

সত্যিই বিরূপাক্ষকে বড় প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। বারিদে আমাদের নমস্কার করে বললেন: আপনারা এই প্ল্যাটফর্মেই একটু দাঁড়ান আমি এখুনি ফিরে এসে আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি।

বলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বারিদে চলে যাবার পরে বিরূপাক্ষ আমাকে বললেন: ভদ্রলোক বেশ রসিক লোক। কী একটা কাজে ইন্দোরে গিয়েছিলেন। ফিরলেন এই ট্রেনে। রাত বারোটা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত ডিউটি করবেন। তারপরে ছুটি। বললেন, এমন কিছু আমাদের দেখাবেন, যা কোন যাত্রীরাই দেখতে যায় না।

আমি বললুম: আমাদের ভাগ্য তাহলে খুবই ভাল বলুন।

সত্যিই ভাল।

বলে বিরূপাক্ষ বারিদের জন্যে চারি দিকে চাইতে লাগলেন।

বারিদে অল্প কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এসে বললেন: আসুন।

কোথায় ?

প্রশ্ন করলেন বিরূপাক্ষ।

বারিদে বললেন: একখানা রিটায়ারিং রুম খালি আছে। রাতটা সেখানেই কাটিয়ে দিন। কাল ভোর বেলায় ছেড়ে দিলেই চলবে।

তাঁর কথার ধরনেই বুঝতে পারলুম যে রাতের এই ব্যবস্থার জন্য কোন ভাড়া দিতে হবে না। বিরূপাক্ষও বোধহয় এই কথাই বুঝেছিলেন, তাই খুশী হয়ে বললেন: এই জন্যেই আমরা নিজেদের এক পরিবারের লোক ভাবি।

উজ্জয়িনীর রিটায়ারিং রুমগুলি ইন্দোরের মতো উপরতলায়। সেখানে আমাদের পৌঁছে দিয়ে বারিদে বিদায় নিলেন। বললেন: সকালে আবার দেখা হবে।

বারোটা তখন বেজে গিয়েছিল। আমরাও আর দেরি না করে খাটে মেঝেয় বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়লুম।

কিন্তু সহসা চোখে ঘুম এল না। অনেক পুরনো কথা আমার মনে পড়তে লাগল।—

উজ্জয়িনী ছিল বিক্রমাদিত্যের রাজধানী। কিন্তু সে কোন্ বিক্রমাদিত্য, ঐতিহাসিক সে কথা আজও নির্ণয় করতে পারেন নি। ভারতের ইতিহাসে বিক্রমাদিত্য নামের অপ্রতুলতা নেই। বিশ্বকোষ গ্রন্থে পনের জন বিক্রমাদিত্যের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু সাধারণ ভাবে আমরা এক বিক্রমাদিত্যকে চিনি। জ্যোতির্বিদাভরণের দিগ্বিজয়ী রাজা বিক্রমাদিত্য। তিনি যখন কোথাও যাত্রা করতেন, তখন অষ্টাদশ যোজন পথে সৈন্য সমাবেশ হত। তিন কোটি পদাতিক, হস্তী অশ্ব ও রথের বাহিনী দশ কোটি, চব্বিশ হাজার তিনশো হাতী ও চার লক্ষ নৌকা তাঁর সঙ্গে থাকত। এই বিক্রমাদিত্যই বিক্রমসংবৎ প্রবর্তক। এঁরই সম্বন্ধে বহু অলৌকিক কাহিনী সারা ভারতে প্রচলিত আছে।

বেতাল-পঞ্চবিংশতি ও বত্রিশ সিংহাসনের গল্প শৈশবে কে পড়ে নি, আর শোনে নি নবরত্নের কথা!

ধনন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু-
বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥

ইতিহাস এই নবরত্নকে এক যুগের বলে স্বীকার করে না। ধন্বন্তরি ক্ষপণক অমরসিংহ শঙ্কু বেতালভট্ট ঘটকর্পর বরাহমিহির বররুচি এঁরা নাকি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিক্রমাদিত্যের সভা অলঙ্কৃত করেছেন। যে কালিদাস জ্যোতির্বিদাভরণ লিখেছেন, তিনিও নাকি কবি কালিদাস নন। ইতিহাসে যত বিক্রমাদিত্য, তত কালিদাস। এই দুটি শব্দকে যদি সম্মানসূচক উপাধি বলে মনে করা যায়, ঐতিহাসিকের তা হলে কিছু সুবিধা হয়। বড় রাজাকে যেমন রাজচক্রবর্তী বলা হয়, বিক্রমাদিত্য বোধ হয় তেমনই কোন উপাধি ছিল। অন্ধ গায়ককে যেমন আমরা সুরদাস বলি, সে যুগে বোধ হয় বড় কবিকেই কালিদাস বলত। এ কথা বিশ্বাস না করলে অত বিক্রমাদিত্য আর কালিদাসকে সামলানো সত্যিই মুশকিল।

কয়েকজন বিক্রমাদিত্যের কথা না বললে এ প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ হবে না।

প্রথম বিক্রমাদিত্য সংবৎকর্তা নামে বিখ্যাত। জ্যোতির্বিদাভরণে আছে—

যুধিষ্ঠিরাদ্বিক্রমশালিবাহনৌ ততো নৃপঃ স্যাদ্বিজয়াভিনন্দনঃ।
ততস্তু নাগার্জুন ভূপতিঃ কলৌ কল্কি ষড়েতে শককারকা নৃপাঃ॥

যুধিষ্ঠির বিক্রমাদিত্য শালিবাহন বিজয়ানন্দন নাগার্জুন এবং কল্কি, এই ছয়জন রাজা শকাব্দের প্রতিষ্ঠাতা। এই শ্লোকের প্রথমটুকু অতীত, বাকিটা ভবিষ্যৎ। যুধিষ্ঠিরের শকাব্দের পর বিক্রম শক যখন

চলছে, তখন এই শ্লোক রচিত হয়। শালিবাহনের শক এখনও কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে। এর পরে আর কোন রাজার শক বোধ হয় হবে না। হবে সরকারের শক। এইখানেই এই শ্লোকের দুর্বলতা ধরা পড়েছে।

কবি কালিদাস যে জ্যোতির্বিদাভরণের রচয়িতা, তার প্রমাণ একটি শ্লোক—

জ্যোতির্বিদাভরণ কালবিধান শাস্ত্রং।
শ্রীকালিদাসকবিতো হি ততো বভূব।

আপত্তির কারণ তিনি নিজেই লিপিবদ্ধ করেছেন। বলেছেন, যুধিষ্ঠিরের শকাব্দ তিন হাজার চুয়াল্লিশ বছর, তারপর একশো পঁয়ত্রিশ বছর বিক্রম শক, শালিবাহনের শক হবে আঠারো হাজার বছর। শালিবাহনের শক শুরু হয়েছিল বলেই পণ্ডিতেরা কালিদাসকে শালিবাহনের যুগে ফেলেছেন। মহাকবি কালিদাস যদি প্রথম বিক্রমাদিত্যের এক রত্ন হন, জ্যোতির্বিদাভরণ তা হলে অন্য কোন কালিদাসের রচনা। আর মহাকবি স্বয়ং এই গ্রন্থের রচয়িতা হলে তিনি পরবর্তী কোন বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন। নবরত্নের সভা ছিল প্রথম বিক্রমাদিত্যের সভায়, আর ইনি রাজত্ব করেছেন খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে।

গুপ্তরাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত। চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁর রাজত্বকাল। এই শতাব্দীরই সমুদ্রগুপ্তকে আমরা তৃতীয় বিক্রমাদিত্য বলে মানি। পূর্বে ঢাকা থেকে পশ্চিমের সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। অনেকে বলেন, বাঙলার সমুদ্রগড়ে তাঁর গড় ছিল, আর বাঙালী কালিদাস তাঁর সভারই রত্ন ছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন চতুর্থ বিক্রমাদিত্য। পঞ্চম বিক্রমাদিত্যকে আবিষ্কার করেছেন ফ্লীট সাহেব। তারপর ম্যাক্সমুলার সাহেবের বিক্রমাদিত্য। হর্ষ-বিক্রমাদিত্যও ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ভোজরাজ বিক্রমাদিত্য।

একটা বিষয়ে শুধু অসঙ্গতি নেই। সে তাঁদের রাজধানী উজ্জয়িনী বিষয়ে। সকলেই কোন না কোন সময়ে বা সকল সময়ে উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করেছেন। এমন কি দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে ভোজরাজ বিক্রমাদিত্য বলে পরিচিত, তিনিও উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করেছেন এবং তাঁরও নবরত্নের সভা ছিল। তবে তাঁর নয়টি রত্নের অন্য নাম। কালিদাসের সঙ্গে ভবভূতি সুবন্ধু মল্লিনাথ জয়দেবের নামও পাওয়া যায়।

বিক্রমাদিত্যের নামের সঙ্গে দুখানি গ্রন্থের নাম অঙ্গাঙ্গি ভাবে যুক্ত হয়ে আছে—বেতাল পঞ্চ-বিংশতি ও বত্রিশ সিংহাসন। শৈশবে এই দুখানি বই দিয়েই বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। এই বইএর লেখক নিয়ে অনেক মতবিরোধ আছে। বেতাল-পঞ্চবিংশতির লেখক ক্ষেমেন্দ্র, না জম্ভলদত্ত, না বল্লভ, না শিবদাস, তা জানা নেই। তেমনই বত্রিশ সিংহাসন বররুচির রচনা, না কালিদাসের, না সিদ্ধসেন-দিবাকরের, না রামচন্দ্রের, না শিবের, না ক্ষেমঙ্কর মুনির, তাও জানবার উপায় নেই। তবে বেতাল-পঞ্চবিংশতির সঙ্গে কথাসরিৎসাগরের রচনাগত মিল দেখে অনেকে একে কাশ্মীরের সোমদেব ভট্টের রচনা বলে মনে করেন। এ বই তা হলে দ্বাদশ শতাব্দীর রচনা, এবং বিক্রমাদিত্যের সমকালীন রচনা নয়। তত্ত্বের কথা মাত্রই তর্কের কথা। কঠিন ও নীরস। তথ্যেরও ভার আছে, তার ক্রিয়া মনের উপর। এ দুটি জিনিস বাদ দিতে পারলেই সহজ জীবনের স্বাদ পাওয়া যায়।

উজ্জয়িনীর উপর দিয়ে অনেক কটা যুগ চলে গেছে। এই নগরের প্রথম উল্লেখ পাওয়া গেছে সম্রাট অশোকের আমলে। তাঁর শাসনকর্তার আস্তানা ছিল এইখানে। কিছু বৌদ্ধস্মৃতিও আছে শহরের সঙ্গে জড়িয়ে। ইতিহাস এর পিছনে পৌঁছতে পারে নি, কিন্তু বিশ্বাস পৌঁছেছে। শহর থেকে মাইল দুয়েক দূরে একটি মন্দির আছে। সেখানে কৃষ্ণ ও বলরাম সান্দীপনি মুনির কাছে

ধনুর্বেদ ও আয়ুর্বেদ শিক্ষালাভ করেছিলেন। তারও আগে পৌরাণিক কথা, অমৃত মন্থনের কথা।

সমুদ্রের নিচে অমৃতের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। দেবাসুরের যুদ্ধ সাময়িক ভাবে বন্ধ হল। বিষ্ণু হলেন কূর্ম, মন্দার পর্বত তাঁর পিঠে স্থাপিত হল, বাসুকি হলেন রজ্জু। অসুরেরা মুখের দিকে ও দেবতারা লেজের দিকে ধরলেন। সমুদ্রমন্থন শুরু হল। প্রথমে লক্ষ্মী উঠলেন। রূপমুগ্ধ দেবাসুর বললেন, কে এই দেবী? বিষ্ণু বললেন, ইনি আমার মতো ব্রহ্মরূপিণী পরমাশক্তি, আমার মায়া প্রিয়া অনন্তা, সমস্ত জগৎকে ধারণ করে আছেন। সুতরাং ভাগাভাগির প্রশ্ন নেই। উঠলেন উর্বশী, তিনি হলেন ইন্দ্রসভার সুন্দরী। উঠল ঐরাবত, দেবরাজ ইন্দ্র তা পেলেন। পারিজাতও গেল স্বর্গের নন্দন কাননে। অসুরদের ভাগে কিছুই পড়ছে না, তবু খাটছে অমৃতের জন্য। শেষ পর্যন্ত সেই অমৃত উঠল, চতুর্দশ সামগ্রী। একটু-আধটু নয়, পূর্ণকুম্ভ অমৃত হাতে নিয়ে উঠলেন ধন্বন্তরি। দেবাসুরে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল, সবাই অমৃত খেয়ে অমর হবেন। ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত সেই কুম্ভ নিয়ে পালালেন। পিছনে অসুর। বারো দিন তাঁরা হাত বদল করে অমৃত রক্ষা করলেন। শেষ পর্যন্ত অসুরদের পরাস্ত করে দেবতারা অমৃত খেলেন চেটেপুটে। কিন্তু মর্ত্যের ভাগ্যে ছিল চার ফোঁটা। কুম্ভ নিয়ে কাড়াকাড়ির সময় ভারতের চার জায়গায় সেই অমৃত পড়েছিল— হরিদ্বার প্রয়াগ নাসিক ও উজ্জয়িনীতে। দেবতাদের বারো দিন পৃথিবীর বারো বছর। তাই বারো বছর পর পর এই সব স্থানে কুম্ভযোগ হয়। ১৯৬৯ সনে কুম্ভমেলা হয়েছে, আবার হবে ১৯৮২ সনে। শিপ্রা নদীর জলকণাগুলি যেন মানুষ হয়ে যাবে। এত মানুষ!

এই তীর্থেই শিব ত্রিপুরাসুর বধ করেছিলেন।

ঐতিহাসিক যুগে অশোকের পরে অনেক দিন উজ্জয়িনীর কোন

খবর পাওয়া যায় না। তারপর এলেন বিক্রমাদিত্য। আজও লোকে তাঁর ভ্রাতা ভর্তৃহরির গুহা দেখতে যায়।

গুপ্তসাম্রাজ্যে উজ্জয়িনী আবার ভারতের রাজধানী হয়েছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে সেই সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গেল। নবম ও দশম শতাব্দীতে উজ্জয়িনী হয়েছিল পরমারদের রাজধানী। তারাই যায় ধারে। দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিস ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উজ্জয়িনী লুঠ করে। কিন্তু তার বাণিজ্য নষ্ট করতে পারে নি। পরবর্তী পাঁচশো বছর মুসলমানদের অধীন ছিল। সিন্ধিয়ারা ভোগ করেন গত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। উজ্জয়িনী কিছুদিন তাঁদেরও রাজধানী ছিল।

ঘরের বাতি নিবিয়ে আমরা শুয়েছিলুম। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। বিরূপাক্ষের নাক ডাকার শব্দ পাচ্ছি মাঝে মাঝে। আমার চোখেই শুধু ঘুম নেই। আমার মন ঘুরে বেড়াচ্ছে উজ্জয়িনীর সেই স্বর্ণযুগে। সেই বিস্মৃত যুগকে কি আমরা কাল আবিষ্কার করতে পারব! জানি নে।

১৮

অতি প্রত্যুষেই আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। এ আমার একটি অদ্ভুত অভ্যাস। যেদিন ঘুমোতে আমার দেরি হয়, সেদিন ঘুম ভাঙে আগে। সময় মতো ঘুমোতে পেলেই উঠতে দেরি হয়ে যায়। ঘরের ভিতরে তখনও অন্ধকার ছিল, আর সবাই ছিলেন ঘুমে অচেতন। নিঃশব্দে আমি বাথ রুমে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে নিলুম। উজ্জয়িনীও মালভূমির উপরে অবস্থিত। দেড় হাজার ফুটের বেশি উঁচু মালভূমি। কিন্তু এ সময়ে শীত নেই বলে আমি স্নানও করে নিলুম। সারা দিনের মতো নিশ্চিন্ত হওয়া গেল বলে মনে এক রকমের প্রসন্নতা এল।

কিন্তু বাথ রুম থেকে বেরিয়ে দেখলুম যে মিনতি জেগে আছেন। বললেন: কী ভাই, রাতে বুঝি ঘুমোতে পারেন নি?

আস্তে আস্তে বললুম: খুব ঘুমিয়েছি।

তবে যে সাত সকালে উঠে সব কাজ সেরে ফেললেন!

বললুম: আপনাদের সুবিধা হবে তাতে।

আর আপনার যে কষ্ট হল!

কষ্ট কিসের! এইবারে বাইরের পৃথিবীটা একবার দেখে আসব।

বলে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলুম।

মিনতি বললেন: বেশি দেরি করবেন না ভাই, একটু তাড়াতাড়ি বেরোতে চাই।

আপনি একা বেরোবেন না তো, সবাই জাগলেই বেরোবেন!

আমি তৈরি হয়েই সবাইকে জাগিয়ে দেব।

তাহলে আমি স্টেশনটা ভাল করে দেখেই ঘুরে আসছি।

বলে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলুম। আর পিছনে শব্দ পেলুম যে মিনতি দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলেন।

বাহিরে অন্ধকার তখন স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। চারিদিক পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছে। দোতলার লম্বা বারান্দার এক ধারে আমরা একটি ঘরে ঘুমিয়েছিলুম। পাশাপাশি এমন ঘর আর কয়েকটি আছে। স্টেশনের সামনে অনেকখানি খোলা জায়গা। প্রশস্ত পথ চলে গেছে সামনের দিকে। কিন্তু খানিকটা গিয়ে মিলেছে সামনের রাজপথের সঙ্গে। সে পথ আড়াআড়ি রেল লাইনের সমান্তরাল বলে মনে হচ্ছে। দু তিনটি বাড়ি দেখতে পাচ্ছি সামনেই। দু তিন তলা বাড়ি। সামনে সাইন বোর্ড আছে। কিন্তু এখন পড়া যাচ্ছে না কী লেখা আছে। বোধহয় হোটেল রেস্তোরাঁ হবে, কিংবা মিষ্টি বা খাবারের দোকান। স্টেশনের কাছে এই সব দোকানই বেশি থাকে। যাত্রীদের প্রয়োজনেই এই সব দোকানপাট দিনে দিনে বাড়তে থাকে।

এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি সময় নষ্ট করলুম না। এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ি দেখতে পেয়ে নিচে নেমে এলুম। স্টেশনে তখন ট্রেন নেই, যাত্রী নেই। জনকয়েক রেলের কর্মচারীই নানা কাজে চলাফেরা করছে। চায়ের একটা স্টলের সামনে জন কয়েক লোক দেখতে পেয়ে সেই দিকেই এগিয়ে গেলুম। ভাবলুম, এক পেয়ালা চা এই সময়ে মন্দ লাগবে না।

কিন্তু পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলুম। তাকিয়ে দেখলুম যে আমাদের সহযাত্রী বারিদেও সেখানে চায়ের জন্ত দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখতে পেয়েই সম্ভাষণ জানালেন, বললেন: আপনি বেশ সকালে ওঠেন তো!

বললুম: নতুন জায়গায় এলে উৎসাহ বাড়ে।

বারিদে আমার জন্যেও চায়ের হুকুম করলেন, তারপরে বললেন: আমি আপনাদের কথাই ভাবছিলাম। কখন আপনাদের ঘুম

ভাঙবে জানি নে তো, তাই আপনাদের উজ্জয়িনী দেখার প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারছিলাম না।

আমি বললুম: আমাদের আরামের জন্যে যথেষ্ট ভাল ব্যবস্থা করেছেন, এবারে আমরা স্বাবলম্বী হয়েই সব দেখব ভাবছি।

বারিদে বললেন: উজ্জয়িনী তাহলে আপনাদের দেখা হবে না।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: কেন!

বারিদে বললেন: একখানা টাঙ্গায় উঠে শহর দেখাতে বলবেন তো! মহাকালেশ্বর বড়া গণেশ হরসিদ্ধি দেবী আর গোপাল মন্দির দেখবেন, দেখবেন যন্তর মন্তর, চৌবিশ খাম্বা, শিপ্রা নদীর রাম ঘাট। মঙ্গলনাথ গড়কালিকা ভর্তৃহরি গুহা কালিয়াদহ মহল সান্দীপনি মুনির আশ্রমও দেখবেন। পয়সা দিলে নৌগৃহ মন্দির কালভৈরব সিদ্ধবট, এমন কি বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ও দেখে আসতে পারবেন।

হেসে বললুম: তবে আর বাকি রইল কী!

বারিদে বললেন: উজ্জয়িনী দেখতে হলে বারিদের মতো একজন পাগলকে সঙ্গে নিতেই হবে।

বললুম: সে তো খুব আনন্দের কথা। কিন্তু সারা রাত আপনি কাজ করেছেন, আপনার এখন বিশ্রামের দরকার।

বারিদে বললেন: আপনি বোধহয় রেলে কাজ করেন না!

বললুম: না।

সেই জন্যেই এই কথা বলছেন। আপনার বন্ধু হলে এ রকম কথা বলতেন না। তিনি জানেন যে রাতে কাজ করলেও সারা দিন আমরা ঘুমিয়ে কাটাই না। তবে আপনাদের জন্যেই সকালে আমি বেরোতে পারব না, বেরোব দুপুরের দিকে। এ বেলা আপনারা কী কী দেখবেন তার ব্যবস্থা আমি করে দেব।

তখন আমাদের চা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। দুজনেই দু পেয়ালা

হাতে পেয়ে গিয়েছিলুম। সেই চায়ে চুমুক দিয়ে বারিদে বললেন: আপনারা সবাই তৈরি হয়ে নিলেই একখানা পরিচিত টাঙ্গা ঠিক করে দেব। সে আপনাদের মহাকালেশ্বর মন্দির, বড়া গণেশ হরসিদ্ধি দেবীর মন্দির দেখিয়ে যন্তর মন্তর দেখাতে নিয়ে যাবে। ফেরার পথে শিপ্রার ঘাট দেখিয়ে গোপাল মন্দির দেখাবে। এর বেশি আর কিছু দেখবার চেষ্টা করবেন না। দূরের জায়গাগুলো দেখাবার জন্যে দুপুরে আমি আপনাদের নিয়ে যাব। এমন একটি জায়গা আপনাদের দেখাব যা দেখলে সেই পুরনো যুগটার কথা আপনাদের মনে পড়ে যাবে।

বললুম: আপনার আইডিয়া খুবই ভাল, কিন্তু আপনার কষ্টের কথা ভেবে খুশী হতে পারছি না।

বারিদে বললেন: রাতের ডিউটিতে আমাদের কষ্টের কথা আপনার বন্ধুর কাছে জেনে নেবেন।

বলে খুবই প্রসন্ন চিত্তে হাসতে লাগলেন।

বারিদে আমাকে চায়ের পয়সা দিতে দিলেন না। তার বদলে তাঁর অফিসে টেনে নিয়ে গিয়ে একখানা সরকারি পুস্তিকা আমার হাতে দিলেন। বললেন: গত কুম্ভমেলার সময় এটি ছাপা হয়েছিল। কিছু ছবি টবিও আছে। উজ্জয়িনীর একটা নক্সাও আছে এতে। এটা যোগাড় করে রেখেছি। এটি সঙ্গে নিয়ে বেরোবেন।

বলে সেই পুস্তিকাটি আমার হাতে দিলেন।

ভদ্রলোকের বোধহয় কিছু কাজ ছিল এই সময়ে। বললেন: আমার সঙ্গে দেখা না করে যেন বেরিয়ে যাবেন না। এই ঘরে যদি না পান তো একটু অপেক্ষা করবেন।

বলে বিদায় নিলেন আমার কাছে।

আমি উপরে না গিয়ে স্টেশনের বাইরে উন্মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে পুস্তিকাটির আগা গোড়া পড়ে ফেললুম। তার আধখানা পড়তে হল না। সে অংশ হিন্দীতে লেখা। ইংরেজী অংশটুকুই

আমি পড়ে দেখলুম যে বারিদে আমাকে সংক্ষেপে সব কিছুই বলে দিয়েছেন।

পুরাকালে এই উজ্জয়িনীর কত বিচিত্র নাম ছিল তাই দেখেই বিস্মিত হলুম সবচেয়ে বেশি। শুধু উজ্জয়িনী অবন্তী বা অবন্তিকা নয়, বিশালা বা কুশস্থলী প্রভৃতি পরিচিত নামই নয়, অনেক অশ্রুত-পূর্ব নাম আছে এই তালিকায়। অমরাবতী পদ্মাবতী ভোগবতী হিরণ্যবতী কনকশৃঙ্গ কুমুদবতী প্রতিকল্লা নামও আছে। এইসব নাম কবে কোন্ সময়ে কোন্ রাজার রাজত্ব কালে প্রচলিত ছিল, তার কোন উল্লেখ নেই। বরং এই সব নামে কিছু সংশয় উপস্থিত হয়েছে। কুশস্থলী প্রভৃতি নাম আমরা অন্য প্রসঙ্গে পেয়েছি। অবন্তিকা নাম অবশ্য আমরা মোক্ষদায়িকা সপ্তপুরীর নামের মধ্যে পেয়েছি। অবন্তিকা সেখানে দেশের নাম নয়, নগরের নাম।

উজ্জয়িনী এখন যে শুধু তীর্থস্থানই নয়, তারও পরিচয় আছে এই পুস্তিকায়। ইন্দোরের মতো একটি শিল্পনগরী হিসাবেও উন্নতি করছে। চারটি কটন মিল আছে। অন্য মিল ফ্যাক্টরিও আছে।

বারো বছর পর পর যে এখানে কুম্ভযোগ হয় তা জানতুম। কিন্তু প্রতি বৎসর শীতকালে যে কালিদাস সমারোহ হয় তা জানলুম এই বই পড়ে। কুম্ভযোগের সম্বন্ধেও একটি নতুন কথা জানলুম—

উজ্জয়িন্যাং পূর্ণ কুম্ভে চতুর্দশ সমন্বিতে
যোগে শিপ্রা নদে স্নান পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।

বইএর হিন্দী অংশ থেকেই এ শ্লোকটি আমি উদ্ধৃত করলুম। বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্ণ কুম্ভে যখন চতুর্দশ যোগ যুক্ত হয়, তখন এই উজ্জয়িনীর শিপ্রায় স্নান করলে মানুষের পুনর্জন্ম হয় না। এই রকম যোগ হয়েছিল ১৯৬৯ সনে।

বইএর সর্বত্র আমি আর একটি জিনিস লক্ষ্য করলুম। শিপ্রাকে ক্ষিপ্রা বলা হয়েছে হিন্দী ও ইংরেজীতেও। শিপ্রা কোথাও বলা

হয় নি। অথচ আমরা এই নদীকে শিপ্রা বলেই জানি। কালিদাসের রচনাতেও এই বানান। শিপ্রা এ দেশে ক্ষিপ্রা হল কেমন করে তা জানি নে। আরও জানলুম যে উজ্জয়িনীকে এখানে সবাই উজ্জয়িন বলে, উজ্জয়িনী কেউ বলে না।

আরও কিছু সময় নিচে অতিবাহিত করে আমি উপরে গেলুম। দেখলুম যে বিরূপাক্ষও তখন বেরোবার জন্য তৈরি হয়ে নিয়েছেন। আর মিনতি অভিমন্যুকে নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আমাকে দেখতে পেয়েই বিরূপাক্ষ বলে উঠলেন: যাক, আপনি এসে পড়েছেন তাহলে!

বললুম: উজ্জয়িনী দেখার ব্যবস্থা করেই এসেছি।

কী রকম?

বলে বিরূপাক্ষ ব্যাপারটা জানতে চাইলেন।

আমি বললুম: আপনার আত্মীয় বারিদেই সব ব্যবস্থা করেছেন। জলযোগ সেরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। তিনি একটা পরিচিত টাঙ্গায় আমাদের তুলে দেবেন।

উত্তম প্রস্তাব।

বলে বিরূপাক্ষ মিনতিকে তাড়া দিলেন।

স্টেশনেই জলযোগ সেরে বারিদের কাছে পৌঁছতে আমাদের সময় লাগল না। ইতিমধ্যেই তিনি একখানা টাঙ্গা ঠিক করে রেখেছিলেন। বেশ উঁচু ধরনের টাঙ্গা, উঠবার কায়দাও একটু অন্য রকম। সাধারণত যে রকম টাঙ্গার সঙ্গে আমরা পরিচিত, এ ঠিক সে রকমের টাঙ্গা নয়। কয়েকখানা সাইকেল রিক্সাও ছিল। মিনতি তা দেখতে পেয়ে বললেন: সাইকেল রিক্সায় গেলে ভাল হত না?

কথাটা তিনি বাঙলায় বলেছিলেন রিক্সার দিকে তাকিয়ে। তাই বারিদে কিছু সন্দেহ করে বললেন: উজ্জয়িনীতে রিক্সা খুব সুবিধার যান নয়। উঁচু নিচু পথঘাট আছে। রিক্সায় অনেক বেশি সময়

লেগে যায়। অন্তত মহাকালেশ্বর মন্দিরে যাবার সময় রিক্সার কথা ভাববেন না।

বলে তিনি টাঙ্গাওয়ালাকে সব নির্দেশ দিয়ে দিলেন। শেষে বললেন: সব দেখিয়ে তুমি এঁদের আমার বাড়িতে নিয়ে আসবে।

বিরূপাক্ষ প্রতিবাদ করে উঠলেন: আপনার বাড়িতে আবার কেন!

বারিদে বললেন: আত্মীয়রা কি হোটেলে খাবেন নাকি! আমার বাড়িতে তুটো ভাত খেলে কি আপনাদের জাত যাবে!

জাতের কথা নয়, কথা হল অসুবিধার। আপনি শুধু শুধু আপনার পরিবারকে এই অসুবিধার মধ্যে ফেলবেন কেন!

বলে বিরূপাক্ষ বারিদেকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করলেন।

বারিদে বললেন: তার মানে, আপনার দেশে গেলে আপনি আমাকেও হোটেলে খেতে বলবেন, এই তো!

আমি হাসছিলুম তুজনের কথাবার্তা শুনে। আর মিনতি খুবই সঙ্কোচ বোধ করছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিরূপাক্ষ যখন হার স্বীকার করলেন, তখন টাঙ্গাওয়ালা বলল: তাহলে আগে গোপাল মন্দিরে যাওয়াই ভাল।

কেন?

বলে বারিদে তার দিকে তাকালেন।

টাঙ্গাওয়ালা বলল: গোপাল মন্দির থেকে শিপ্রার ঘাট দেখিয়ে মহাকালেশ্বরের মন্দিরে আসব। সেখান থেকে বড়া গণেশ হরসিদ্ধি মাতা যন্তর মন্তর দেখিয়ে আপনাদের কলোনিতে আনব।

বারিদে বললেন: সে মন্দ কথা নয়। তাতে পথ একটু সংক্ষেপ হবে, সময়ও কম লাগবে। কিন্তু দেখো বাবা, বারোটার মধ্যে নিয়ে এসো। খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করে আমরা আবার বেরোব। একেবারে কালিয়াদহ পর্যন্ত যেতে হবে।

মিনতি বললেন : আপনি শুধু শুধু আমাদের জন্যে কষ্ট স্বীকার করছেন।

বারিদে বললেন : কষ্ট কিসের বলুন তো! আমি আপনাদের সঙ্গেই বেরোতে পারতাম, কিন্তু তাতে আমার গিন্নীর কষ্ট হত। দুপুর বেলা এক সঙ্গে এসে পড়লে সবাইকে তিনি খাওয়াতে পারতেন না।

মিনতি বললেন : খবর না দিয়ে গেলে কেই বা খাওয়াতে পারে!

বারিদে হেসে বললেন : সেই জন্যেই আমি আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি না।

বলে টাঙ্গাওয়ালাকে তাড়া দিয়ে বললেন : ভাল করে সব কিছু দেখিও। ফাঁকি দিও না যেমন অন্য যাত্রীদের দাও।

আমরা সবাই টাঙ্গায় উঠে বসেছিলুম। টাঙ্গাওয়ালা আর দেরি করল না। শপাং করে ঘোড়ার পিঠে একটা চাবুকের ছোঁয়া দিতেই টাঙ্গা চলতে শুরু করল। উজ্জয়িনীর স্টেশন এলাকা ছেড়ে আমরা রাজপথে এসে পৌঁছে গেলুম।

১৯

উজ্জয়িন শহরের মানচিত্রটি আমার হাতে ছিল। আমি সেটি ভাল করে দেখে নিয়েছিলুম। উজ্জয়িন স্টেশন শহরের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে। ইন্দোর থেকে আসবার সময় শিপ্রা নদীর পুল পেরিয়ে আমরা শহরে প্রবেশ করেছি। এই নদী শহরের পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত। যন্তর মন্তর রেল লাইনের দক্ষিণে, তার নিকটেই রেল কলোনি। তারপরে রেলওয়ে স্টেশন ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে গেলে বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়। এই পথের ধারেই রবীন্দ্রনাথের নামে টেগোর উদ্যান।

রেল লাইনের উত্তরে শহর। সে দিকে সুভাষ মার্গ আছে রেল লাইনের সমান্তরাল। অশোক মার্গ তিলক মার্গ প্রভৃতি কয়েকটি পথ সোজা উত্তরে গেছে। মঙ্গলনাথ সিদ্ধবট কালিয়াদহ মহল শহরের উত্তর প্রান্তে।

বারিদে যে সব জায়গা দেখবার নির্দেশ দিয়েছেন সে সমস্তই কাছাকাছি। শহরের মাঝখানে বাজারের পথে গোপাল মন্দির। ফেরার পথে আমরা মহাকালেশ্বর দেখব।

বিরূপাক্ষ আমার হাতের বইখানির দিকে তাকিয়ে বললেন: এ আবার কোথায় সংগ্রহ করলেন?

বললুম: আপনার আত্মীয়ের কাছে।

দেখি।

বলে তিনি বইখানা চেয়ে নিয়েই তখনই ফিরিয়ে দিলেন। বললেন: এই রাজভাষা আমি দূর থেকে ভক্তি করি।

বললুম: ভেতরে পুরনো রাজভাষাও আছে।

বিরূপাক্ষ বললেন: ও আপনার হাতেই থাক।

উজ্জয়িন যে বেশ সমৃদ্ধ শহর তা পথ ঘাট আর ঘর বাড়ি দেখেই বুঝতে পারছিলুম। নক্সায় দেখেছি যে মাধব কলেজ হাসপাতাল ও চক পেরিয়ে গোপাল মন্দির। কিন্তু টাঙ্গাওয়ালার সঙ্গে আলাপ করে শহর সম্বন্ধে কিছু জেনে নেবার চেষ্টা করলুম না। সে ইচ্ছা আমার হল না। আমি নিঃশব্দে বসে সারাটা পথ অতিক্রম করে একেবারে গোপাল মন্দিরের দরজায় এসে নামলুম। সবাই নামলেন।

গোপাল মন্দিরের একটা ছবি ছিল এই পুস্তিকায়। কিন্তু ছবির সঙ্গে মন্দিরের নিচের অংশেরই মিল দেখলুম। নিচে দাঁড়িয়ে উপরের অংশ কিছুই দেখা যায় না। উপরে যে রাজপুত শৈলীর অলিন্দের পিছনে কারুকার্য করা নিচু গম্বুজ আছে, আর তার পিছনে একটি উঁচু শিখর, তার কিছুই দেখা যায় না নিচে থেকে। এই দৃশ্য দেখতে হলে নিশ্চয়ই কোন বাড়ির ছাদে উঠতে হয়। কাশীতেও এই রকম শুনেছি। বিশ্বনাথের গলিতে দাঁড়িয়ে বিশ্বনাথের মন্দিরের দরজাই শুধু দেখা যায়। মন্দিরের গম্বুজ ও শিখর দেখতে হলে উঠতে হয় সামনের একটি বাড়িতে সেই বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে লোকে মন্দিরের ছবি তোলে।

এই গোপাল মন্দির যে কত বড় নিচে দাঁড়িয়ে তার কোন ধারণাই হয় না। কোন ধারণা করবার জন্য কোন উৎসাহ পেলুম না আমি। বিরূপাক্ষর সঙ্গে সোজা মন্দিরের ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়লুম। মন্দিরের দরজাগুলি সব ঝকঝকে রূপোর তৈরি। ভিতরেও রূপোয় তৈরি কৃষ্ণের মূর্তি। কিন্তু এ মন্দির তত প্রাচীন নয়, সোয়া শো বছর পূর্বে এটি নির্মিত হয়েছে। দৌলত রাও সিন্ধিয়ার পত্নী মহারাণী বায়জাবাঈ এই মন্দির নির্মাণ করেন।

এই সব দেখে বেরিয়ে আসতে আমাদের বেশি সময় লাগল না। মিনতি বললেন: এইবারে কি আমরা শিপ্রা নদীর দিকে যাব?

আমি বললুম : বারিদে সেই নির্দেশই দিয়েছেন।

পরে বুঝেছিলুম যে এই গোপাল মন্দির উজ্জয়িনীর একেবারে কেন্দ্র বিন্দুতে। এখান থেকে কোন জায়গাই দূরে নয়, আর দূরত্বের হিসাব করা হয় এই মন্দির থেকেই। আমাদের টাঙ্গাওয়ালা কোন প্রশ্ন না করে শিপ্রা নদীর পথ ধরেছিল। নদী তো শহরের পশ্চিম প্রান্তে উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত হচ্ছে। এর উপরে ঘাট আছে অনেক। তাদের নামও শুনেছিলুম—রাম ঘাট নৃসিংহ ঘাট দক্ষিণী ঘাট চক্রবর্তী ঘাট। বারিদে আমাদের রাম ঘাটে নিয়ে যেতে বলেছিলেন। সে ঘাট তত কাছে নয়। আর টাঙ্গা সেই ঘাটের কাছেও পৌঁছল না। একটা জায়গায় পৌঁছে সে টাঙ্গা থেকে নেমে পড়ল। বলল : এইখান থেকে এগিয়ে শিপ্রার ঘাট দেখতে পাবেন। অনেক নিচে দিয়ে নদী বইছে। অনেক সিঁড়ি ভেঙে জলের কাছে পৌঁছতে হবে।

কাজেই আমরাও নেমে পড়লুম। একটুখানি এগিয়েই বুঝতে পারলুম যে টাঙ্গাওয়ালা ঠিকই বলেছে। অনেক নিচে দিয়ে বইছে শিপ্রা নদী। খুব সংকীর্ণ নয়, প্রশস্তও নয় গঙ্গার মতো। কাশীর মতো ঘাট বাঁধানো আছে। কিন্তু অনেক সিঁড়ি। শুনেছিলুম যে গয়ায় বিষ্ণুপাদ মন্দিরের ধারে দাঁড়িয়েও ফল্গু নদীকে দেখা যায় এমনি নিচে। কিন্তু তার জলধারা নেই। ফল্গু অন্তঃসলিলা, বালির নিচে দিয়ে তার জলের ধারা বইছে।

অভিমন্যু তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। মিনতিও তার পিছনে নামতে লাগলেন। বিরূপাক্ষ দাঁড়িয়ে রইলেন উপরে, আর আমি চারি ধারে চেয়ে দ্রষ্টব্য কিছু আছে কিনা তাই দেখতে লাগলুম। ঘাটের উপরে ও নিচে ঘর বাড়ি কিছু আছে, মন্দিরও আছে। একটি আখড়াও আছে—তার নাম দত্তকা আখড়া। সন্ধ্যা-পুরীজী মহারাজের গদি আছে এখানে।

উপর থেকেই দেখতে পেলুম যে অনেকখানি প্রশস্ত ঘাট

আছে শেষ সিঁড়ি আর নদীর মাঝে। এ বোধহয় কুম্ভ স্নানের জন্যেই এই ব্যবস্থা। বহু যাত্রী এক সঙ্গে নিচের ঐ প্রশস্ত ঘাটে দাঁড়িয়ে কুম্ভ স্নান করতে পারবে।

নদীর উপরেও ঘর বাড়ি ও মন্দির দেখতে পাচ্ছিলুম। কিন্তু সেগুলো কী তা জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবার লোক দেখলুম না।

জলের কাছে খানিকক্ষণ হুটোপুটি করে অভিমন্যু উপরে উঠে এল। মিনতিও উঠে এলেন। বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে। এতগুলো সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট হবারই কথা। কিন্তু অভিমন্যুর জন্যই তাঁকে এই কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে।

ফিরে এসে আমরা যখন টাঙ্গায় বসলুম, তখন টাঙ্গাওয়ালা আমাদের বলল: এ সব দেখবার জন্যে টাঙ্গার দরকার হয় না। হেঁটেই যাত্রীরা সব দেখে।

কী রকম?

বলে বিরূপাক্ষ তার দিকে তাকালেন।

টাঙ্গাওয়ালা বুঝিয়ে দিল যে স্টেশন থেকে মহাকালেশ্বর মন্দিরে এসে যাত্রীরা টাঙ্গা ছেড়ে দেয়। অনেকে বাসে চেপে আসে সেখানে। তারপর মহাকালেশ্বর দর্শন করে পাশে বড়া গণেশ দেখে। তারপরে হরসিদ্ধি দেবীর দর্শন করে চলে আসে এই রাম ঘাটে। রাম ঘাট থেকে হাঁটতে হাঁটতেই চলে যায় গোপাল মন্দিরে। তারপর একটা রিক্সা বা টাঙ্গা করে স্টেশনে ফেরে। আর ধর্মশালা তো সব সেইখানেই।

মিনতি বললেন: তবে আমরা টাঙ্গায় চেপে এলাম কেন।

টাঙ্গাওয়ালা বলল: যন্তর মন্তর দেখতে হলে টাঙ্গা ছাড়া উপায় নেই। অতটা পথ হেঁটে যাতায়াত করতে আপনাদের কষ্ট হবে।

তারপরে বলল: অন্য টাঙ্গাওয়ালা হলে এইখানে আপনাদের নামিয়ে দিয়ে। বলত, এ দিক দিয়ে গিয়ে হরসিদ্ধি দেবীর মন্দির আর বড়া গণেশ দেখে মহাকালেশ্বর মন্দিরে চলে যান। ফিরে এলে

এখান থেকেই যন্তর মন্তর দেখাতে নিয়ে যেত। কিন্তু আমি সে রকমের লোক নই। আপনাদের যাতে কোন কষ্ট না হয় তার জন্যে ঘুরে আপনাদের মহাকাল মন্দিরের সামনে নিয়ে যাচ্ছি। আমাকে অনেকটা ঘুরতে হবে, তার জন্যে পরোয়া নেই। আপনাদের সুখ হলেই আমার পরিশ্রম সার্থক।

বিরূপাক্ষ আমাকে বললেন: এই ভূমিকার মানে বুঝতে পারছেন তো!

বললুম: অনুমান করতে পারছি।

বিরূপাক্ষ বললেন: দক্ষিণার অঙ্কটা বাড়াবার চেষ্টা।

বললুম: সে কথা বারিদে বুঝবেন। নিশ্চয়ই একটা রেট আছে, তাই দরাদরি করবার দরকার হবে না।

পথ যে বেশি দূর নয়, তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হল না। আমরা অল্প সময়েই মহাকালেশ্বর মন্দিরের সামনে পৌঁছে গেলুম। অনেকগুলি টাঙ্গা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকটা প্রশস্ত জায়গা আছে বাস যাতায়াতের জন্য। কয়েকটি দোকানপাট আছে রাস্তার ধারে। জন কয়েক পুরুষ ও মেয়ে ফুল ফল পূজার উপকরণ ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে বসেছে। সামনেই মন্দিরের প্রবেশ পথ দেখতে পাচ্ছি। এ রকমের প্রবেশ পথ এর আগে কোথাও দেখি নি। রাজপথ থেকে অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে হল। শহরের এই অংশ বেশ উঁচুতে। সাইকেল রিক্সা তাই বোধহয় আসে না, আসে টাঙ্গা আর বাস। তারপরে নামতে হয়। নিচে নেমেও এগিয়ে যেতে হয় অনেকটা পথ।

মহাকালেশ্বর শিবের মন্দির কয়েক শতাব্দী পূর্বে প্রথম নির্মিত হয়েছিল। সে মন্দির এখন আর নেই। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যে মন্দির আমরা আজ দেখছি, তা অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুনর্বার নির্মিত হয়েছে। শিবের এখানে জ্যোতির্লিঙ্গ, ভারতের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম।

মন্দিরের ভিতরে সুন্দর একটি তোরণ দ্বার নির্মিত হয়েছে। একেবারে আধুনিক তার আকৃতি। এই দ্বার দিয়েও মন্দিরের ভিতরে যাওয়া যায়। অন্য ধার দিয়েও পথ আছে। বিরূপাক্ষরা যখন মহাকালেশ্বর দর্শনের জন্য ভিতরে গেলেন, আমি তখন বাহিরটা দেখবার জন্য সচেষ্ট হলুম।

সম্মুখে যে বিশাল শিখর যুক্ত মন্দিরটি দেখছি, এ ছাড়াও আরও অনেক ছোট ছোট মন্দির আছে। সে সবের পরিচয় জানবার জন্য আমি একজন মানুষ খুঁজছিলুম। স্থানীয় লোক হলেই ভাল হয়। তাঁরা দেবতার দর্শনের জন্যে আসেন আর বিদেশীদের সাহায্য করেন আনন্দ সহকারে। আমি দেখতে পেলুম যে প্যাণ্ট ও বুশসার্ট পরিহিত এক ভদ্রলোক মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে জুতো পায়ে দিলেন। আমি তাঁরই কাছে এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করলুম তাঁকে।

ভদ্রলোক খানিকটা আশ্চর্য হয়েছিলেন। তারপরে বিদেশী যাত্রী শুনে বললেন: মন্দির দর্শনে এসেছেন তো?

বললুম: হ্যাঁ।

তিনি বললেন: তবে ভুল করবেন না। ওপরে যে শিবলিঙ্গ দেখতে পাবেন তিনি হলেন ওঙ্কারেশ্বর। মহাকালেশ্বর আছেন নিচের তলায়। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যেতে হবে।

তারপরে তিনি আমাকে ছোট ছোট মন্দিরগুলোও চিনিয়ে দিলেন। সাক্ষী গোপাল হনুমানজী স্বপ্নেশ্বর বৃদ্ধকালেশ্বর অনাদি কল্পেশ্বর ইত্যাদি মন্দির। বললেন: মন্দিরের পিছনেও যাবেন। সেখানে চতুষ্কোণ সরোবর আছে। আর তার চারি ধারে ছোট ছোট মন্দির। পিছনের দ্বার দিয়ে বেরোলেই রুদ্রসাগর ও বড়া গণেশ দেখতে পাবেন।

ভদ্রলোকের বোধহয় কাজের তাড়া ছিল, তাই তাড়াতাড়ি আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। আর আমি এগিয়ে গেলুম মন্দিরের দিকে।

বিরূপাক্ষরা বেরিয়ে আসছিলেন। তাঁদের এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে দেখেই আমার সন্দেহ হল যে তাঁরা বোধহয় উপরের ওঙ্কারেশ্বর দর্শন করেই ফিরে আসছেন। মন্দিরের সামনে মিনতি ফুলের মালা ও পূজার উপচার কিনেছিলেন, তাও তাঁর হাতে দেখলুম না। বিরূপাক্ষ আমাকে তাড়া দিয়ে বললেন: ঠাকুর দেখবেন না!

আমি বললুম: আপনারা যে ওঙ্কারেশ্বর দেখেই ফিরে এলেন! মহাকালেশ্বর দর্শন করবেন না? উজ্জয়িনীতে সবাই তো মহাকাল দর্শনে আসেন!

বিরূপাক্ষ কিছু বিরক্ত ভাবে বললেন: কী বলছেন আপনি!

মিনতির দিকে তাকিয়ে বললুম: আমি তো দেখলুম, আপনি সামনের ঐ মন্দিরে পুজো দিয়ে বেরিয়ে এলেন। নিচের তলায় তো নামেন নি!

নিচে আবার তলা আছে নাকি!

বলে মিনতি আমার দিকে তাকালেন পরম বিস্ময় নিয়ে।

বললুম: আসুন আমার সঙ্গে। মন্দিরের ভিতরে পার্বতী কার্তিক ও গণেশের মূর্তিও দেখে নেবেন।

সগৌরবে আমি আবার তাঁদের মন্দিরের ভিতরে নিয়ে গেলুম। দু-একজন যাত্রীকে অনুসরণ করেই নিচে যাবার কক্ষটি দেখতে পেলুম। অনেকগুলো সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। সবই শ্বেত পাথরের। সেই সিঁড়ির শেষে যে গর্ভগৃহ তারই মধ্যে মহাকালেশ্বরের জ্যোতির্লিঙ্গ। মিনতি অভিভূত ভাবে তাকালেন আমার মুখের দিকে।

আমি দেবতাকে দেখলুম। প্রশান্ত গম্ভীর পরিবেশে দেখলুম মহাকালকে। পীঠস্থানের ভৈরব ইনি। দেবী হলেন হরসিদ্ধি। কিন্তু এ কথা জেনেছিলুম পরে।

সোমনাথের কথা আমার মনে পড়ল। সোমনাথে অহল্যাবাঈ যে ছোট মন্দিরটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন, সেখানেও এই রকম

ব্যবস্থা। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলে সোমনাথের দর্শন পাওয়া যায়। এ হল পুরনো মন্দিরের কথা। সোমনাথের প্রাচীন মন্দিরের জায়গায় যে নূতন মন্দির তৈরি হয়েছে, সেখানে এ রকম নয়। সেখানে মন্দিরের ভিতরে ঢুকলেই চোখের সামনে সেই বিশাল শিবলিঙ্গ। কিন্তু কাছে যাবার অনুমতি নেই পুরনো সোমনাথের মতো। অহল্যাবাঈর সোমনাথই এখন পুরনো সোমনাথ হয়েছেন।

মিনতি খুশী হলেন অপরিমিত। তাঁর চোখে মুখে আমি আনন্দের জ্যোতি দেখতে পাচ্ছিলুম। কিন্তু অভিমন্যু একটা অপ্রিয় কথা বলে ফেলল: মামা না বললে আসল ঠাকুর আমাদের দেখাই হত না।

আমি বললুম: এটা ভুল কথা। ঠাকুর সদয় থাকলে নিজেই দেখা দেন। দেখা না হলে বুঝতে হবে যে ঠাকুর দেখা দিতে চান না। তার জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই।

কিন্তু বিরূপাক্ষ একেবারে নীরব হয়ে রইলেন। তাঁর আত্মাভিমানে কিছু আঘাত লেগেছে বলে মনে হয়। তাই আমি আর কিছু বলে তাঁকে দুঃখ দেবার চেষ্টা করলুম না।

কিন্তু মিনতি চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন: ওঁর কাজই এই রকম। সারাক্ষণ এমন তাড়াহুড়ো যেন ট্রেন এসে সিগ্‌নালে দাঁড়িয়ে গেল।

আমি হেসে ফেললুম তাঁর কথা শুনে।

মিনতি বললেন: হাসলেন যে!

বললুম: আপনার উপমাটি ভাল লাগল। আমরা হলে বলতুম, এই বুঝি ট্রেন ফেল হল।

বিরূপাক্ষ ততক্ষণে সহজ হতে পেরেছেন। বললেন: সারাক্ষণ যা দেখেন, তাই বলবেন তো!

তাঁর কথায় খানিকটা আরাম পেয়ে বললুম: আসুন, মন্দিরের পিছনটাও একবার দেখে নেওয়া যাক।

বলে সামনের দিকে না এগিয়ে পিছনের দিকে বেরিয়ে এলুম।

একটি চতুষ্কোণ সরোবর, তার চারি ধারের ঘাট বাঁধানো। জলে পৌঁছতে অনেকগুলো সিঁড়ি নিচে নামতে হয়। ছোট ছোট মন্দিরও আছে এখানে ওখানে। ডান ধারে রাজপথও দেখতে পাচ্ছি। এই পথের ধারেই বড়া গণেশের মন্দির। হরসিদ্ধি দেবীও দুরে নয়। টাঙ্গাওয়ালাকে এ দিকে এসে অপেক্ষা করতে বললে আমরা মন্দিরের পিছনের দরজা দিয়েই বেরোতে পারতুম। সে কথা বলি নি বলে আমরা আবার সামনের দিকে চলে এলুম।

মন্দির বেশ প্রশস্ত। ভিতরে অনেক জায়গা, নতুন ধরনের তোরণ তৈরি হয়েছে। বাহিরের প্রাঙ্গণও বেশ বড়। কিন্তু মন্দিরটি প্রাচীন নয় বলে মিনতি বললেন: এ মন্দিরেরও নিশ্চয়ই কোন ইতিহাস আছে।

বললুম: আছে বৈকি। পাঠান আমলে ইলতুৎমিস যখন উজ্জয়িনী জয় করেছিলেন, তখন এই মন্দিরটি নিশ্চয়ই ধ্বংস করে গিয়েছিলেন। হিন্দুর মন্দির ধ্বংস করা তাঁরা ধর্ম বলে মনে করতেন। মন্দিরের বিগ্রহ নষ্ট করে গৌরবান্বিত মনে করতেন নিজেকে। দ্বিতীয়বার এই মন্দির নির্মাণ করেন ভোজরাজ। তার পরেও আবার নষ্ট হয়েছিল। সিন্ধিয়া এটি পুনর্নির্মাণ করেন।

কথা বলতে বলতেই আমরা মন্দিরের সামনে এসে গেলুম। সেই সিঁড়ি বেয়েই উপরে উঠতে হল। টাঙ্গাওয়ালা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাদের ভিতরে উঠে বসতে সাহায্য করে নিজে উঠল সকলের শেষে। এবারে সে সামনের দিকে না এগিয়ে মন্দিরের বাঁ হাতের পথ ধরল। সরোবরের ধার থেকেই আমরা এই পথটি দেখেছিলুম। কিন্তু এইবারে দেখলুম যে পথ বেশ ঢালু হয়ে নিচের দিকে নামছে। খুব সাবধানে নামতে হচ্ছে। কিন্তু একটুখানি এগিয়েই সে দাঁড়াল। বলল: এই হল বড়া গণেশের মন্দির। দেখে আসুন ভিতরে গিয়ে।

মন্দিরের ভিতরে ঢুকে দেখলুম যে বিশাল আকারের গণেশ বিচিত্র রঙে রঞ্জিত। দেবী ও হনুমানের মূর্তিও আছে। এক নজরে দেখে আমি বেরিয়ে এসেছিলুম বলে টাঙ্গাওয়ালা আমাকে একটি বাড়ি দেখিয়ে বলল: ঐ বাড়ি হল পণ্ডিত সূর্যনারায়ণজী ব্যাসের ভারতী ভবন। হিন্দী আন্দোলনের সময় তিনি তাঁর পদ্মভূষণ উপাধি ত্যাগ করেছিলেন।

এই আন্দোলনের কথা আমার জানা নেই। টাঙ্গাওয়ালাও যে এর বেশি কিছু জানে না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলুম। তাই আর কোন প্রশ্ন করলুম না।

টাঙ্গায় বসে আর একটুখানি পথ এগিয়েই আমরা হরসিদ্ধি দেবীর মন্দিরে পৌঁছে গেলুম। মহাকালেশ্বর মন্দির থেকে পায়ে হেঁটে এলে বোধহয় সমতল পথে পৌঁছতে পারতুম। টাঙ্গায় চেপে আসার জন্যে আমাদের কয়েক ধাপ সিঁড়ি উপরে উঠতে হল। তার আগেই টাঙ্গাওয়ালা আমাদের বলেছিল যে এই মহাদেবী হরসিদ্ধি রাজা বিক্রমাদিত্যের ইষ্টদেবী ছিলেন।

রাস্তার দিক মন্দিরের পিছনের দিকে। আমরা ঘুরে সামনের দিকে এলুম। মন্দির খুব বড় নয়। কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে মন্দিরের ভিতরে ঢুকতে হয়। গর্ভগৃহের উপরে উঁচু শিখর আছে একটি। আর মন্দিরের সামনে খানিকটা দূরে দুটি দীপস্তম্ভ দেখে অভিমন্যু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল যে এ দুটিও বোধ হয় দুটি কণ্টকিত মন্দির। কিন্তু কাছে গিয়ে বোঝা গেল যে এ দুটি দীপস্তম্ভ। উৎসব অনুষ্ঠানে এই স্তম্ভ দুটির চারিধারে দীপ জ্বালাবার জন্যে ব্যবস্থা আছে। এছাড়া একটি বড় গাছের নিচে একটি গুহার ভিতরেও নাকি দেবমূর্তি আছে।

উজ্জয়িনী কোন পীঠস্থান কিনা আমি ভাবছিলুম। সহসা মনে পড়ছিল না এই কথা।

বিরূপাক্ষ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: কিছু

ভাবছেন বলে মনে হচ্ছে ?

বললুম : উজ্জয়িনী পীঠস্থান কিনা জেনে নেওয়া দরকার।

কিন্তু কার কাছে জানবেন ?

শেষ পর্যন্ত মন্দিরের এক ব্রাহ্মণকেই আক্রমণ করলুম : তিনি সমর্থন করলেন আমার সন্দেহ। বললেন : সতীর কোহলী পড়েছিল এইখানে।

কোহলী মানে যে হাতের কনুই, তা বুঝতে আমাদের বেশ সময় লেগেছিল।

পরে আমি পুঁথিপত্র দেখেছিলুম এই ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হবার জন্য। তন্ত্রচূড়ামণির মতে উজ্জয়িনী পীঠস্থানই বটে। কিন্তু দেবীর নাম মঙ্গলচণ্ডিকা আর ভৈরব হলেন কপিলাম্বর। হরসিদ্ধি দেবী বা মহাকালেশ্বর নাম সেখানে নেই। সতীর কূর্পর এখানে পড়েছিল। অভিধানে কূর্পর বা কুর্পর হল হাতের কনুই বা পায়ের হাঁটু।

এখান থেকে আমরা যন্তর মন্তর দেখতে চললুম। পথে সন্তোষীমাতা ও বরসিদ্ধীমাতা দেখতে নামলুম না। সন্তোষীমাতার মন্দিরের সামনে যে মেয়েরা ফুলমালা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তারা অনেকবার অনুরোধ করেছিল নামবার জন্যে। কিন্তু বিরূপাক্ষ তাঁর সংকল্পে দৃঢ়। বললেন : বারিদে যা বলে দিয়েছেন তাই আমরা দেখব।

মিনতি বললেন : বেলাও বাড়ছে। বারোটার মধ্যে আমাদের সেখানে পৌঁছতে হবে।

সন্তোষীমাতার মন্দিরের পরেই আমাদের পথ বাঁ দিকে গ্রামের দিকে চলে গেছে। পথের পাশে আর ঘরবাড়ি নেই। উজ্জয়িনের গ্রামাঞ্চল এটি। যানবাহন লোকজনও দেখছি না এই পথে।

বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে আমরা যন্তর মন্তরের সামনে পৌঁছে

নেমে পড়লুম। যন্তর মন্তরকে এখানে যন্তর মহল বলে। এই যন্তর মন্তরটিও জয়পুরের মহারাজা দ্বিতীয় জয়সিংহের তৈরি পাঁচটি মান মন্দিরের অন্যতম।

জয়সিংহ নিজে জ্যোতিষের পরম পণ্ডিত ছিলেন। সে যুগে এ দেশে জ্যোতিষের ব্যাপক চর্চা ছিল না। জয়সিংহ কী ভাবে এই সব যন্ত্র আবিষ্কার করলেন সেই কথা ভেবেই এখন আশ্চর্য হতে হয়। অভিমন্যু জিজ্ঞাসা করল: এ সব কি বিক্রমাদিত্যের তৈরি?

উত্তর বিরূপাক্ষ দিলেন। বললেন: না। জয়পুরের রাজা জয়সিংহের তৈরি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: রাজার গুরুর নাম জান?

অভিমন্যু মাথা নেড়ে বলল: না।

পথের ধারের ছোট গেট দিয়ে আমরা তখন ভিতরে ঢুকে পড়েছিলুম। আর ইঁট পাথরের তৈরি বড় বড় আকারের যন্ত্র দেখেই অভিমন্যু এ কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। বললুম: জয়সিংহের গুরুর নাম ছিল বিদ্যাধর পণ্ডিত। তিনি ছিলেন বাঙালী পণ্ডিত।

আমার কথা শুনে বিরূপাক্ষও চমকে উঠলেন মিনতির মতো। বললেন: সত্য কথা বলছেন তো?

বললুম: পড়া কথা বলছি। বিদ্যাধরের জন্মবৃত্তান্ত বা কর্ম-জীবন সম্বন্ধে কিছু জানি না, তবে পড়েছি যে জ্যোতিষ ও পুরাতত্ত্বে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল, আর তিনি ছিলেন জয়সিংহের সভায় একজন পণ্ডিত। রাজাকে তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রই শেখান নি, প্রাচীন শিল্প শাস্ত্রানুসারে জয়পুর শহরের প্ল্যানও তিনি তৈরি করে দিয়েছিলেন। তারপরে দিল্লীর বাদশাহ মুহম্মদ শাহর অনুরোধে পঞ্জিকা সংস্কার করেছিলেন।

মিনতি বললেন: এই রকমের যন্তর মন্তর আরও কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ছে।

বিরূপাক্ষ বললেন: অনেক জায়গায় দেখেছি। দিল্লী মথুরা বেনারস—

সম্প্রতি আমি জয়পুরে দেখেছি যন্তর মন্তর। সে কথা বলতেই অভিমন্যু বলল: আর এই উজ্জয়িনীতেও একটা দেখছি।

আমি তার কথায় চমকে উঠলুম। সেও যে আমাদের মতো ভারতবর্ষ দেখছে, সে কথা যেন ভুলেই গিয়েছিলুম। কিন্তু সে ভোলে নি। পাঁচটা জায়গার নাম হাতে গুনে নিয়ে জিজ্ঞেস করল: এই পাঁচটাই কি জয়সিংহের তৈরি?

আমি বললুম: হ্যাঁ।

অভিমন্যুর আগ্রহেই আমাদের কয়েকটা যন্ত্র ভাল করে দেখতে হল, বোঝাতেও হল। জয়পুরের মতো এখানেও একটা সূর্য ঘড়ি আছে। সিঁড়ির ধাপের উপরে সূর্যের ছায়া দেখে স্থানীয় সময় নির্ণয় করতে হয়। আর একটি যন্ত্রে চন্দ্র সূর্যের গ্রহণ গণনা করা হয়। সূর্যের অয়ন নির্ণয় করা যায় আর একটি যন্ত্রে—কর্কট ও মকরক্রান্তির দিকে সূর্যের গতি। যন্তর মন্তরের বাগানের একটি মালী এই সব কথা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল। বেরিয়ে আসবার আগে তাকে আমি কিছু দক্ষিণা দিলুম।

এ সব যন্ত্রের কথা আমাদের বেশি দিন মনে থাকবে না। মনে থাকবে একটি ছোটখাট ফুলের বাগানের ভিতরে এক মহারাজার শখের কথা। ইঁট ও পাথর দিয়ে যে সব বড় বড় যন্ত্র তিনি নির্মাণ করেছিলেন, তার আকার ও প্রকার অষ্টাদশ শতাব্দীরই উপযোগী। এই মানমন্দিরটি যে ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল, তা বিশ্বাস করতে একটুও দ্বিধা হয় না।

পৃথিবীর মানুষের মনে তখন সভ্যতার আবেগ এসেছে। শিল্পে ও বিজ্ঞানে তার বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে। সে যুগ আমরা আজ অনেক পিছনে ফেলে এসেছি সত্য, কিন্তু সেদিনের মানুষের প্রতিভাকে অস্বীকার করতে পারি না।

টাঙ্গায় বসে শহরে ফেরার পথে এই সব কথাই আমার মনে আসছিল। যে পথে আমরা এসেছি, সে পথে না ফিরে আমরা সামনের দিকেই এগিয়ে চলেছি। উজ্জয়িনীর ওয়াটার ওয়ার্কস্ আমরা পেরিয়ে গেলুম।

মানুষ যে তার কীর্তির জন্য বেঁচে থাকে, এ সব জায়গায় এলে এ সত্যে আর সন্দেহ থাকে না। জয়সিংহের ঐতিহাসিক কাহিনী লোকে হয়তো ভুলে যাবে। কিন্তু এই সব যন্তর মন্তর যতদিন থাকবে, তত দিন তাঁকে এ দেশের মানুষ ভুলতে পারবে না। জ্যোতিষে তাঁর এমন একটা গভীর অনুরাগ ছিল যে তিনি বিদেশ থেকে জ্যোতির্বিদ এনেছিলেন নিমন্ত্রণ করে। মেনুমেনন নামে এক বিদেশী পাদ্রী ভারতবর্ষে এসেছিলেন। রাজা তাঁর মুখে পর্তুগালের গল্প শুনলেন, শুনলেন সে দেশের জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতির গল্প। জয়সিংহ আর দেরি করলেন না। নিজের কয়েকজন পণ্ডিতকে পাঠালেন পর্তুগালের রাজা ইমানুয়েলের কাছে। এদের সঙ্গে ভারতে এলেন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ সেভিয়ার ডি সিল্‌ভা, সঙ্গে আনলেন ডি লা হায়ারের জ্যোতিরঙ্ক। সেই সমস্ত ফরমূলা আর টেবল নিয়ে জয়সিংহ নিজে গণনা করলেন দিনের পর দিন। তারপর হতাশ হয়ে সবই ফিরিয়ে দিলেন।

পাদরী সাহেব আশ্চর্য হয়ে বললেন। এ আপনার কাজে লাগল না!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজা বললেন, না।

তারপরে বুঝিয়ে দিলেন সেগুলির দুর্বলতার কথা। কাগজে-কলমে খুবই ভাল সন্দেহ নেই, কিন্তু বর্তমান পরিদর্শনের সঙ্গে অনেক প্রভেদ দেখা যাচ্ছে। চন্দ্রের স্থিতি নির্দেশে অর্ধ অক্ষাংশ ও চন্দ্র সূর্যের গ্রহণে প্রায় পনের পলের প্রভেদ। এই পার্থক্য যে যন্ত্রের নিকৃষ্ট ব্যাসের জন্য হচ্ছে, তাও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

এইখানেই ইতি নয়। জ্যোতির্বিদ টুলুক বেগের খ্যাতি ছিল

তুর্কিস্থানে। তাঁরও অনেক যন্ত্রপাতি ছিল। জয়সিংহ সে সবেরও ভুল বার করে সবাইকে বিস্মিত করে দিয়েছিলেন।

চলতে চলতে কখন যে আমরা রেল কলোনিতে এসে পৌঁছে গিয়েছিলুম খেয়াল করি নি। টাঙ্গার শব্দ পেয়েই বারিদে বেরিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করে নামালেন। টাঙ্গাওয়ালাকে বললেন: ঘণ্টা দুই পরে আবার এস।

আর আমাদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে শ্রীমতী বারিদে ও ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন।

একটি সুখী পরিবার বলেই মনে হল। ভাল লাগল তাঁদের আত্মীয়ের মতো ব্যবহার।

অতি সাধারণ নিরামিষ আহার। ভিতরের বারান্দায় মেঝেয় বসে আহার করে আমরা বাহিরের ঘরে এসে বসলুম। একখানা তক্তপোশ আর খান কয়েক চেয়ার ছিল এই ঘরে। তারই উপর বসে আমরা গল্প শুরু করলুম। আমাদের টাঙ্গা আসতে তখনও দেরি ছিল। এই অবসরে গল্প আমাদের জমে উঠল।

মিনতি বসেছিলেন শ্রীমতী বারিদের পাশেই। বললেন: মারাঠী মহিলাদের সম্বন্ধে আজ আমার একটি ভুল ভাঙল।

আমি দেখলুম যে বারিদে বেশ উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। আর শ্রীমতী বারিদে হেসে বললেন: মারাঠী মেয়েদের বুঝি বাঘ ভালুক ভাবতেন!

মিনতি বললেন: তা নয়। একখানা বইএ আমি মারাঠী মেয়েদের কাছা দিয়ে শাড়ি পরা দেখেছি। পথেও অনেক জায়গায় দেখেছি শাড়ি পরবার এই ধরন।

বারিদে যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হলেন। আর শ্রীমতী বারিদে হেসে বললেন: ঠিকই দেখেছেন। শ্বশুর বাড়িতে আমরাও কাছা দিই। একটু গোঁড়া পরিবারে আজও মেয়েরা কাছা দিচ্ছে। তাই আমাদের শাড়ি দশ হাতে কুলোয় না, আপনাদের মতো এগার হাতেও ছোট হয়। আমরা বারো হাত শাড়ি পরি।

বারো হাত!

বলে মিনতি বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

আর শ্রীমতী বারিদে বললেন: আর বেশি দিন বোধহয় এ নিয়ম চলবে না। এরই মধ্যে পুরনো ধরন ধারণ অনেক বদলেছে। যেটুকু আছে, এও শেষ হয়ে যাবে।

বারিদে এইবারে বিরূপাক্ষের সঙ্গে গল্প শুরু করলেন। বললেন: আমরা মারাঠী হয়েও খাঁটি মারাঠী নই।

বিরূপাক্ষ আশ্চর্য হয়ে বললেন: কী রকম?

বারিদে বললেন: বাঙলার বাইরে যে সব বাঙালী থাকেন, তাঁদের আপনারা বাঙালী বলে স্বীকার করেন?

বিরূপাক্ষ বললেন: করি বৈ কি!

কিন্তু বারিদে এ কথা মেনে নিলেন না, বললেন: এ আপনার তর্কের কথা।

কেন?

বেশি দিন নিজের দেশের বাইরে থাকলেই ধরন ধারণ সব পাল্টে যায়। এই আমাদেরই দেখুন না। এক সময় মারাঠারা প্রায় সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। সারা ভারতে না হলেও বলতে পারেন যে গুজরাত মহারাষ্ট্র আর এই মধ্য প্রদেশে তাদের খুবই প্রতিপত্তি ছিল। গুজরাতের বরোদা তো মারাঠা রাজ্য। মহারাষ্ট্রের কথা ছেড়েই দিন। মহিসুরের এলাকা নিয়েও ঝগড়া বিবাদ হচ্ছে, বিবাদ হচ্ছে গোয়ার দখল নিয়ে। তারপর এ দিকে আসুন। নাগপুর ইন্দোর গোয়ালিয়র—এ সবও তো মারাঠা রাজ্য। কিন্তু সত্যি বলতে কি, এখানে আমাদের তেমন প্রতিপত্তি নেই। মারাঠা বলে কিছু দাবী করতে গেলেই মধ্যপ্রদেশের লোকে মাথায় চাঁটি মেরে বসিয়ে দেবে।

মারাঠাদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আমি আগেই শুনেছিলুম। তাই এ সম্বন্ধে আমার বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না। মধ্য-প্রদেশ সম্বন্ধে কিছু জানবার আগ্রহই ছিল বেশি। তাই বললুম: এ রাজ্যের আদিবাসীদের সম্বন্ধে আমার কিছু জানবার ইচ্ছা ছিল।

বারিদে বোধহয় আশ্চর্য হলেন আমার কথা শুনে। বললেন: আদিবাসী বলতে তো রাজ্যে আছে গোঁদ ভিল আর বনজর,

শুধু মধ্যপ্রদেশে নয়, রাজস্থান থেকে অন্ধ্র ও উড়িষ্যার সীমানা পর্যন্ত তারা ছড়িয়ে আছে। ইচ্ছা করলে কেউ সারা জীবন ধরে তাদের নিয়ে গবেষণা করতে পারে।

আমি হেসে বললুম: অমন সাধ তো আমাদের নেই, সামান্য কিছু জানতে পারলেই আমরা খুশী হব।

বারিদে ভাবলেন একটুখানি। তারপরে বললেন: মধ্যপ্রদেশে গোঁদরা সব চেয়ে প্রাচীন জাতি। আর্যরা এ দেশে আসবার আগে থেকেই তারা বসবাস করছে।

মিনতি বললেন, নাচগানে আদিবাসীরা খুবই শৌখিন বলে শুনেছি।

বারিদে বললেন: ঠিকই শুনেছেন। গোঁদদের প্রধান নাচের নাম হল কর্ম। পুরুষ ও মেয়েরা এক সঙ্গে নাচে। মেয়েরা বাহুতে বাহু রেখে সরল রেখায় চৌকো ভাবে ঘুরবে, আর ছেলেরা বৃত্তের আকারে। এক সময় একজনের কাঁধে আর একজন চড়বে, নেমে আসবে। কখনও বৃত্তের মধ্যে ঢুকবে, কখনও আসবে বেরিয়ে। বাজনা যত জোরে হবে, নাচও তত তাড়াতাড়ি চলবে। শেষ হবার আগে আপনার কানে তালা লাগবার উপক্রম হবে।

মিনতি বললেন: ভারি মজার তো! এ সব কি এখানে দেখতে পাওয়া যায়?

বারিদে বললেন: উহুঁ। এ সব দেখতে হলে উৎসবের সময় ওদের গ্রামে যেতে হবে। কিন্তু ওদের এক রকম নাচই নয়। ঝুমর নাচের মতো এদের আরও অনেক নাচ আছে। প্রেমের গান ও সামাজিক কাহিনীর গান গাইবার সময়েও তারা নাচে। তাদের রণ্পা নাচও চমৎকার। রণ্পা বোঝেন?

মিনতি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: ডিটেকটিভ গল্পে বোধ-হয় পড়েছি।

বললুম : বাঁশের খুটির পা, তার উপরে চড়ে দৌড়নোর মতো তাড়াতাড়ি হাঁটা যায়।

বারিদে বললেন : ঠিক বলেছেন। এ দেশের লোকের রণ্‌পা ব্যবহার করা চিরদিনের অভ্যাস। এ শুধু তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে। এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে যায়। অরণ্যও অতিক্রম করে। যানবাহনের অভাবের জন্যেই বোধহয় তারা রণ্‌পার ব্যবহার বেশি করত। কালে কালে রণ্‌পায় চড়ে নাচতেও শিখল।

মিনতি বললেন : নিশ্চয়ই ভারি অদ্ভুত দেখায় এই নাচ।

বারিদে উৎসাহিত হয়ে বললেন : যদি নাচ দেখতে চান তো কিছু দিন থেকে যান এই দেশে। আদিবাসীদের আরও নানা রকম নাচ দেখিয়ে দেব।

আমি হেসে বললুম : দেখা যখন হবে না, তখন কিছু শুনেই যাই আপনার কাছে।

বারিদে বললেন : নাচ কি আর মুখে বলে বোঝানো যায়! হয় নেচে দেখাতে হয়, নয় ছবি দেখে একটা ধারণা করতে পারেন।

আমি সহাস্যে বললুম : যদি নেচে দেখান তাহলেই সব চেয়ে ভাল হয়।

বারিদে বললেন : জুড়িদার!

শ্রীমতী বারিদের দিকে তাকাতে আমি সাহস পেলুম না। ভদ্রমহিলার সঙ্গে পরিচয় এমন ঘনিষ্ঠ নয় যে তিনি আমার কৌতুক উপভোগ করবেন। তাই বললুম : মুখে বললেও একটা ধারণা আমরা করে নিতে পারব।

বারিদে বললেন : এদের নানা রকমের নাচ আছে। শ্রাবণে গোদো নাচ, ভাদ্রের পূর্ণিমায় নাচে নব রাণী নৃত্য। মাঘে দেওয়ারি আর চৈত্রে চৈত দণ্ড। ক্ষেতে বীজ বপনের সময় বীজ ফুতনি, আর বর্ষার দেবতার জন্য রাত জেগে নাচে গোন্‌চা।

তারপরে বললেন: সব চেয়ে রোমান্টিক নাচ হল লক্ষ্মীজাগর। দূর দূরান্ত থেকে জোয়ান ছেলেমেয়েরা এসে এক জায়গায় একত্র হবে। লক্ষ্মীর মূর্তি মাঝখানে রেখে সারা রাত ধরে নাচবে, আর ভোর বেলায় ফিরে যাবে নিজের নিজের গ্রামে। রাত হলে আবার তারা আসবে। এক দিন দু দিন নয়, এক মাস ধরে এই নৃত্য চলবে। তাদের প্রাণের প্রাচুর্য দেখে আশ্চর্য হতে হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: এ সবই কি গোঁদদের নাচ?

বারিদে বললেন: সব গোঁদদের। ভীল আর বন্‌জরদের নাচ অন্য রকম।

এ সম্বন্ধেও কিছু শোনবার জন্যে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

বারিদে বললেন: ভীলদের ডাগ্‌লা শুধু পুরুষদের নাচ। কিন্তু পালি নাচে মেয়ে পুরুষ দু দলই যোগ দেয়।

তারপরে বললেন: বন্‌জরদের লঙ্গি নাচ শ্রাবণ মাসে। রাখী-পূর্ণিমা আর কালীপূজার রাতেও তারা নাচে। গান গায় বীরের কাহিনী। ঘেরো নাচ পুরুষরা নাচে কাঁধে হাত দিয়ে, কামচিনো নাচে ছজন কিংবা আটজন পুরুষ কাঁধে একটা মানুষ নিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচে। হোলির দিন রঙ খেলার পর তাদের ফাগ। অন্তত একটা পুরুষ মেয়ে সাজবে, কয়েকজন বসবে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে, আর বাকি সবাই তরোয়াল হাতে নাচবে।

বারিদে একটু থেমে বললেন: এদের মেয়েরা সাধারণত এক সঙ্গে নাচে না। মেয়েদের নাচের নাম লোটা আর সৌন্দরিয়। লোটা নাচে মেয়েরা মাথায় নেয় জলভরা কলসী। সৌন্দরিয়ে তারা দু সারিতে মুখোমুখি দাঁড়ায়, হাত বাড়িয়ে হাত ধরে। আর গান গেয়ে গেয়ে নাচে।

মিনতি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলেন: এ সব নাচ আপনি দেখেছেন?

বারিদে বললেন : কিছু দেখছি। আর—

ভদ্রলোক থামতেই আমি বললুম : শুনেছেন কিছু।

বারিদে বললেন : উঁহু।

তবে ?

বারিদে সহাস্য বললেন : একবার একখানা সরকারী বই পেয়েছিলুম হাতে। তাতেই এই সব নাচের নাম দেখেছি।

বললুম : আপনার স্মরণ শক্তি ভাল।

মিনতির দিকে চেয়ে বারিদে বললেন : এইবারে আপনাদের দেশের সম্বন্ধে কিছু বলুন।

মিনতি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন : সর্বনাশ !

তাঁর বাঙলা কথা তিনি বুঝলেন কিনা জানি না, তবে এটুকু বেশ বুঝলেন যে মহিলা বেশ বেকায়দায় পড়েছেন। তাই আমি বললুম : আমাদের দেশে ভাল নাচ নেই। বাঙলার নাচ বলতে ধেই ধেই করে নাচ, যে নাচ শ্রীগৌরাঙ্গ নেচেছিলেন পুরীর সমুদ্র তীরে।

বারিদে বললেন : তাকে তো কীর্তন বলে শুনেছি।

মিনতি বললেন : কিছু দিন রাইবিশে নামের একটা নাচ চালাবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সে নাচ আমি দেখি নি। দেখেছি রবীন্দ্র নৃত্য।

শ্রীমতী বারিদে বললেন : রবীন্দ্র নৃত্যের অনুষ্ঠান আমরাও দেখেছি।

আমি আরও কিছু বলতে পারতুম, কিন্তু বললুম না। রবীন্দ্রনাথ মণিপুরী রাস দেখেছিলেন, দেখেছিলেন সাঁওতালের ঝুমর নাচ। বাঙলায় নাচের অভাব তিনি নিশ্চয়ই অনুভব করেছিলেন। তাই তাঁর শান্তিনিকেতনে গানের সঙ্গে নাচ শিক্ষার ব্যবস্থাও হয়েছিল।

গুরুসদয় দত্ত ব্রতচারী নাচের প্রবর্তন করেন। শুধু রাইবিশে

নয়, কাঠি নাচও আছে বাঙলায়। মালদহে গম্ভীরা আছে। কীর্তনের মতো বাউল আছে, যাত্রা আর কৃষ্ণলীলাও নাচ।

কিন্তু এ সব কথা বলে সময় নষ্ট করার ইচ্ছা আমার ছিল না। সময় আমাদের সংক্ষিপ্ত। এই সময়ের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার আমাদের করতে হবে। মধ্যপ্রদেশের ভাষার কথা আমার মনে পড়েছিল। জিজ্ঞাসা করলুম: সবাই কি এখানে হিন্দী ভাষায় কথা বলে?

বারিদে বললেন: মোটেই না। মধ্যপ্রদেশের সরকারী ভাষা হিন্দী হলেও আমরা সবাই নিজেদের ভাষাতেই কথা বলি। আদিবাসীদেরও আছে নিজেদের ভাষা—হল্‌চি, গোল্‌দি, ভিলাইলি। এ ছাড়াও আঞ্চলিক ভাষা আছে। মালবে মালবি, নর্মদার উপত্যকায় বুন্দেলখণ্ডি, পুরনো রেওয়া রাজ্যের ভাষা হল বাঘেলখণ্ডি। আবার পূর্ব ছত্রিশ গড়ের ভাষা হল ছত্তিসগড়ি।

তারপরে বললেন: মধ্যপ্রদেশের সাহিত্য রচনা হচ্ছে হিন্দী ভাষায়। হিন্দীতে অনেক লেখক এখানে নাম করেছেন। আপনারা সে সব নাম শুনেছেন কিনা জানি না।

বিরূপাক্ষ কোন জবাব দিলেন না। কিন্তু আমি বললুম: সত্যিই শুনি নি।

বারিদে বললেন: আমিও হিন্দী পড়ি না। কিন্তু এ রাজ্যের হিন্দী লেখকদের নাম শুনেছি। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন কেশবদাস বিহারী কুম্ভন দাস হরিদাস স্বামী এবং ছত্রসাল।

কিন্তু এঁরা কবি না উপন্যাস লেখক বারিদে তা বলতে পারলেন না।

কথা বলতে বলতেই বারিদে একবার বাইরে গিয়ে দেখে এলেন। বুঝতে পারলুম যে তিনি টাঙ্গা এসে দাঁড়িয়ে আছে কিনা তাই দেখতে গিয়েছিলেন। টাঙ্গা না দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে আমার একটি নাম মনে পড়েছিল। খবরের

কাগজে সেই নাম পড়েছিলুম। বারিদে ফিরে আসতেই জিজ্ঞাসা করলুম : কণ্ঠিবাবার সম্বন্ধে কিছু জানেন ?

বারিদে হেসে উঠলেন। বললেন : বস্তারের কণ্ঠিবাবা তো ?

বললুম : হ্যাঁ।

বারিদে বললেন : বস্তারের রাজার মৃত্যুর পরে শুনেছি এক সাধু এসে বসবাস শুরু করেছেন। তিনি সবাইকে একটি করে কণ্ঠি দিচ্ছেন। তার জন্যে যে যা পারে তাই দিচ্ছে। এক সিকি থেকে যত সিকি ইচ্ছে তত দিতে পারে। আদিবাসীরাই দলে দলে গিয়ে কণ্ঠি নিয়ে তাঁর শিষ্য হচ্ছে।

শিষ্য হয়ে কী করতে হয় ?

বারিদে বললেন : যা শুনেছি, তা শিষ্যদের কাছে লোভনীয় নয়। আদিবাসীরা রোজ স্নান করত না। কিন্তু কণ্ঠি নেবার পরে দু বেলা আহারের আগে স্নান করতে হবে। ওরা মদ খেত খুব। সে মদ আর ছুঁতে পাবে না। মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিতে হবে—এই সব নিয়ম কানুন। আদিবাসীরা এর থেকে কী পাচ্ছে জানি না, শুনতে পাচ্ছি বস্তারের প্রায় সব আদিবাসীই এখন কণ্ঠি-বাবার শিষ্য। যারা এখনও শিষ্য হয় নি তাদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদেরও সংবাদ পাচ্ছি।

বিরূপাক্ষ বললেন : সবাইকে বৈষ্ণব করে ছাড়বেন মনে হচ্ছে।

এইবারে আমি চম্বলের ডাকাতদের কথা জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলুম। কিন্তু তার সুযোগ পেলুম না। বাহিরে টাঙার শব্দ পাওয়া গেল। সশব্দে টাঙা এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াল না, মনে হল যে তার মুখ ঘুরিয়ে রওনা হবার জন্যেও তৈরি হয়ে নিল।

বারিদে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : আর দেরি নয়, এবারে বেরিয়ে পড়তে হবে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম : আজ আপনার খুবই কষ্ট হল।

কেন ?

বললুম: সারা রাত কাজ করেছেন, আবার রাতে নিশ্চয়ই যেতে হবে কাজে। দুপুরে যে একটু আরাম করে ঘুমিয়ে নেবেন, তা হল না।

বারিদে হেসে উঠলেন। বললেন: আপনার বন্ধুর কাছে জেনে নিন রাতের ডিউটির কথা। তার পরে আর এ কথা বলবেন না।

বলে হাসতে হাসতেই আমাদের ডেকে নিয়ে টাঙ্গায় গিয়ে উঠলেন।

মিনতি বিদায় নিলেন শ্রীমতী বারিদের কাছে। আমি তাঁকে হাত জোড় করে নমস্কার করলুম।

টাঙ্গা চলতে শুরু করতেই বারিদে বেলার দিকে তাকিয়ে বললেন : আমাদের একটু দেরি হয়ে গেল, তাই না!

বিরূপাক্ষ বললেন : দেরি কিসের!

বারিদে বললেন : যে সব জায়গা দেখতে যাচ্ছি, তা অন্ধকারে দেখা যাবে না। দিনের আলো থাকতেই সব কিছু দেখে নিতে হবে।

তারপরেই বললেন : নতুন জায়গা দেখার পক্ষে দিনের আলো খুবই অপরিহার্য।

বিরূপাক্ষ বললেন : খুবই সত্যি কথা। কিন্তু আপনি না থাকলে আমরা কী করতুম জানেন?

বারিদে কোন প্রশ্ন না করে বিরূপাক্ষর মুখের দিকে তাকালেন।

বিরূপাক্ষ বললেন : স্টেশনের রিফ্রেশমেণ্ট রুমে খেয়ে দেয়ে ওয়েটিং রুমে দিব্বি একটা ঘুম দিতুম। তারপরে বিকেলের চা খেয়ে ভাবতুম কোথায় যাই! বাইরে বেরিয়ে দু-চার জনকে জিজ্ঞাসা করতুম। কাছাকাছি কিছু আছে জানলে একবার ঘুরে আসতুম। তা না হলে টাইম টেবল দেখতুম ভোপালের ট্রেনের সময় দেখবার জন্যে।

বিরূপাক্ষর কথায় বারিদে হেসে উঠলেন। বললেন : খাঁটি কথা বলেছেন। আমি হলফ করে বলতে পারি যে বিকেল বেলায় বেরোলে আপনারা গড়কালিকার মন্দির দেখে ভর্তৃহরি গুহা পর্যন্ত পৌঁছতেন। কিন্তু অন্ধকার হয়েছে দেখেই ভয়ে আর নিচে নামতেন না। ওপর থেকে এক নজর দেখেই ফিরে আসতেন।

কোথায় যেতে হবে টাঙ্গাওয়ালাকে তা বলা হয় নি। সে মুখ

ফিরিয়ে বলল : সকাল বেলায় কাচ মন্দিরটা দেখানো হয় নি।

অভিমন্যু বলে উঠল : এখানেও কাচ মন্দির আছে!

বারিদে সস্নেহে বললেন : ইন্দোরের কাচ মন্দির দেখেছ বুঝি?

অভিমন্যু বলল : খুব সুন্দর। কিন্তু শুধু পায়ে ঢুকতে হয় বলে পা কেটে যাবার ভয় করে।

বারিদে বললেন : তবে এখানকার কাচ মন্দির দেখবার দরকার নেই। ইন্দোরের মতো বড় নয়, অমন সুন্দরও নয়। তবু জৈনরা একটা কাচ মন্দির তৈরি করেছে।

মিনতি বললেন : বৃন্দাবনেও একটা কাচ মন্দির আছে। কিন্তু সেটা বৈষ্ণবদের।

বারিদে বললেন : ধর্মের নামে খামখেয়ালিপনা।

আমি বললুম : বলবেন না এই রকম কথা। কার মনে আঘাত দিয়ে ফেলবেন, তার ঠিক নেই।

বারিদে বললেন : আপনার মনে আঘাত লাগে নি তো!

হেসে বললুম : নিজেরও একটা মন আছে কিনা, মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়।

আমার এই কথা শুনে মিনতি আমার দিকে তাকালেন রহস্যময় ভাবে। কিন্তু কোন কথা বললেন না।

টাঙ্গাওয়ালা বুঝতে পেরেছিল যে তাকে কাচ মন্দির যেতে হবে না। তাই জিজ্ঞাসা করল : তাহলে কি গড়কালিকা যাব?

বারিদে কিন্তু চিন্তিত ভাবে বললেন : সেই ভাল।

টাঙ্গাওয়ালা তার ঘোড়ার পিঠে সপাং করে একটা চাবুক মারল। সেটা বোধহয় গন্তব্য স্থল জানতে পারার আনন্দে।

বারিদের চিন্তিত ভাবটি বিরূপাক্ষ লক্ষ্য করেছিলেন। বললেন : আপনি কী একটা যেন ভাবছেন মনে হচ্ছে!

বারিদে বললেন : ঠিকই বুঝেছেন।

বিরূপাক্ষ খুব সহজ ভাবে বললেন : এত ভাবাভাবির কী আছে!

যতটা দেখা যায়, ততটাই দেখব। কত জায়গাতেই তো গেলুম, কোথাও কিছু দেখা হয় নি বলে কি মনে কোন ক্ষোভ আছে আমাদের!

কিন্তু বারিদে বললেন: আমার নিজের মনে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেটা আমার কাছে কঠিন সমস্যা।

কী রকম?

বারিদে বললেন: উজ্জয়িনীতে যত দ্রষ্টব্য স্থান আছে, তার মধ্যে কালিয়দী প্রাসাদ খুবই উল্লেখযোগ্য। কোন কালে নাকি সূর্যের মন্দির ছিল শিপ্রা নদীর দু বাহুর বেষ্টনে। এখন আর মন্দির নেই। সেই সব কারুকার্যমণ্ডিত পাথরে সেতু নির্মিত হয়েছে। কিছু দিন পূর্বে এই প্রাসাদটি মালবের সুলতানরা প্রমোদ ভবন রূপে ব্যবহার করতেন। নারী ও সুরায় রঙীন হয়ে উঠত এই প্রাসাদের কক্ষগুলি, সন্ধ্যায় বাতাস হত বিলাসে বিহ্বল।

তারপরেই জিজ্ঞাসা করলেন: পিতৃহন্তা নাসিরুদ্দীনের নাম মাণ্ডুতে শুনেছেন তো! এই প্রাসাদের ভিতরে অপঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মত্ত অবস্থায় নাকি হামামের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বেগমরা তাঁকে টেনে তুলতে সাহস পায় নি। আগেও একবার নাকি এই রকম হয়েছিল। সেবারে যারা তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছিল, তিনি তাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন।

মিনতি বললেন: সর্বনাশ!

এই ঘটনা আমি জানতুম। তাই কোন কথা বললুম না। কথা বললেন বিরূপাক্ষ: এ নিয়ে ভাববার কী আছে!

বারিদে বললেন: ভাবনা এই ঘটনা নিয়ে নয়। ভাবনা এই প্রাসাদ আমরা দেখব কিনা তাই নিয়ে। শহর থেকে ছ মাইল দূরে এই প্রাসাদ। বুঝতেই পারছেন যে টাঙ্গায় যেতে আসতে আমাদের কত সময় লাগবে!

বিরূপাক্ষ অবিলম্বে বললেন: তাহলে যাব না আমরা।

মিনতি বললেন : তাহলেই তো আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

কিন্তু বারিদের দৃষ্টি একটু স্বপ্নময় মনে হল। বললেন : এক সময় শিপ্রার জল আসত এই প্রাসাদের ভিতরে। নানা আধারে জমত, ঝরঝর করে ঝরে পড়ত পাথরের ঝিলমিল বেয়ে। সেই সব প্রণালী আজও আছে, জলও বোধহয় ঝরে। কিন্তু হাসি ঝরে না, শিপ্রার জল আর ছলছল করে ওঠে না নূপুরের নিক্কণে।

এই মানুষটির কল্পনা আমার ভাল লাগল। কিন্তু বিরূপাক্ষ হেসে উঠলেন। আর বারিদে বোধহয় অপ্রস্তুত বোধ করলেন খানিকটা।

আমি আশ্চর্য হলুম মিনতির কথা শুনে। তিনি বোধহয় বারিদের কল্পনাকে সম্মান দেবার জন্যেই বলে উঠলেন : এ সব জায়গা না দেখলে মনে দুঃখ পাবারই কথা।

তাই নয়!

বলে বারিদে আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপরেই জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি কালিদাস পড়েছেন?

বললুম : কিছু কিছু পড়েছি।

বারিদে বললেন : কালিদাসের কাব্যেও এমনি একটি জল-প্রাসাদের বর্ণনা আছে। সরোবরের মাঝখানে দ্বীপের মতো একটি গ্রীষ্মাবাস। অজস্র ফোয়ারা দিয়ে জল ছড়িয়ে পড়ছে চারি ধারে। অপূর্ব তার নির্মাণ কৌশল। অনেকে বলেন, অবন্তী খণ্ডে যে ব্রহ্মকুণ্ডের উল্লেখ আছে, কালিয়দী সেই কুণ্ডেরই নাম। সেখানে বিষ্ণুর মন্দির ছিল। কৃষ্ণের মূর্তি ছিল প্রাচীরের গায়ে ক্ষোদিত। তাঁকে ঘিরে গোপীরা জোড় হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

কিছু বিচিত্র নয়। যে জাতি সভ্যতার চরমে পৌঁছেছিল অন্যান্য জাতির জন্মের আগে, তার ইতিহাস আমরা কতটুকু জানি! যেটুকু আছে, তাও আমরা রূপকথা বলে অবহেলা করি।

বারিদের দিকে আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখলুম। উজ্জ্বল যৌবন তাঁর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু মন এখনও স্থবির হয় নি। তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহ দেখে বয়সের অনুমান করতে ভরসা হচ্ছে না। কাল তিনি আমাদের কেউ ছিলেন না। বিরূপাক্ষর বিরাট রেল পরিবারের তিনি নূতন আত্মীয়। কিন্তু চরিত্রের চমৎকারিত্বে তিনি দু দণ্ডেই পুরনো হয়ে গেছেন।

আমরা উত্তরের পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। টাঙ্গাওয়ালা জিজ্ঞাসা করল: অঙ্কপাতে যাবেন না?

অঙ্কপাত!

বলে বারিদে থামলেন।

বিরূপাক্ষ বললেন: সে আবার কী?

বারিদে বললেন: এইখানে সান্দীপনি মুনির আশ্রম ছিল। সান্দীপনি মুনির নাম মনে পড়ে?

বিরূপাক্ষ বললেন: না।

বারিদে বললেন: মহাভারতের যুগে অবন্তীপুর যে একটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, তারই প্রমাণ হল এই আশ্রম। ঋষি সান্দীপনি ছিলেন সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ব্রহ্মার অংশে এই মহাযোগীর জন্ম বলে লোকের বিশ্বাস ছিল। আর তিনি অধ্যাপনার কাজেই নিযুক্ত থাকতেন। কৃষ্ণ বলরাম ও সুদামা মথুরা থেকে এইখানে এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মুনি এঁদের ধনুর্বেদ ও আয়ুর্বেদ শিখিয়েছিলেন।

বারিদে একটু থেমে বললেন: পুরাণের গল্পে আপনাদের অনুরাগ আছে কিনা জানি নে, থাকলে এঁদের গুরুদক্ষিণার গল্পও বলতে পারি।

আমি তাড়াতাড়ি বললুম: বলুন না।

বারিদে বললেন: কৃষ্ণ বলরাম গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলে মুনি তাঁর মৃত পুত্রের পুনর্জীবন চেয়েছিলেন। এই গল্পটি খুবই অবাস্তব

হলেও পুরাণে আছে বলেই বলছি। মুনির পুত্র যখন প্রভাস তীর্থে সমুদ্র স্নান করছিল, তখন পঞ্চজন নামে এক শঙ্খাসুর তাকে ধরে নিয়ে সমুদ্র গর্ভে চলে যায়। এই অসুর একটি দুর্ভেদ্য বড় শঙ্খের মধ্যে বাস করত। কৃষ্ণ বলরাম এই অসুর বধ করে মুনির পুত্রকে উদ্ধার করেন।

বারিদে বললেন : কৃষ্ণের শঙ্খের নাম জানেন তো ?

বললুম : পাঞ্চজন্য।

বারিদে খুশী হয়ে বললেন : পঞ্চজনের দেহ থেকেই কৃষ্ণ এই শঙ্খটি তৈরি করে নেন।

মনে মনে আমি ভেবেছিলুম যে এই জায়গাটি বোধহয় আমাদের ভালই লাগত। কিন্তু বারিদে টাঙ্গাওয়ালাকে বললেন : এখন নয়। পরে যদি সময় থাকে তো যাব।

তারপরে আমার দিকে চেয়ে বললেন : বুঝতেই পারছেন, পুরাকালের কি এখন কিছু আছে! এখন সেখানে সান্দীপনি মুনির এক মন্দির আছে। তার পাশেই বল্লভাচার্যের বৈঠক। পুষ্টিমার্গের প্রতিষ্ঠাতা বল্লভাচার্যের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন!

বললুম : শুনেছি। রাজস্থান ও সৌরাষ্ট্রে তাঁর প্রতিপত্তিও দেখে এসেছি। বৈষ্ণবদের মধ্যে এমন ধনী সম্প্রদায় আর নেই।

বারিদে বললেন : এর কাছেই গোমতী কুণ্ড, আর খানিকটা এগিয়ে গেলেই শিপ্রার উপরে গঙ্গাঘাট। গোপাল মন্দির থেকে মাইল তিনেক দূরে বলে বাস যাতায়াত করে।

তারপরে বললেন : মঙ্গলনাথ আর সিদ্ধবট দেখতে হলে আরও খানিকটা উত্তরে যেতে হবে।

আমি বললুম : এ সব জায়গার কথা আমরা আপনার কাছেই শুনে নেব।

বারিদে বললেন : মঙ্গলনাথ শিবের মন্দির নয়, মঙ্গল গ্রহের মন্দির। মৎস্য পুরাণের একটি শ্লোকে আছে 'অবন্ত্যাত কুজোজাত'।

এর মানে হল যে মঙ্গল গ্রহের জন্ম হয়েছিল অবন্তীতে। আমার মনে হয় যে পুরাকালের জ্যোতির্বিদরা বোধহয় এই গ্রহটিকে অবন্তী থেকেই প্রথম দেখেছিলেন। তাইতেই বলা হয়েছে যে মঙ্গল গ্রহের জন্ম হয়েছে অবন্তীতে। একটি সুন্দর জায়গা। সময় থাকলে দেখা যেত।

আমি বললুম : আর সিদ্ধবট ?

বারিদে বললেন : সিদ্ধবটকে সিদ্ধনাথও বলে। শিপ্রা নদীর তীরে একটি প্রাচীন বটগাছ। এর মাহাত্ম্য হল বুদ্ধ গয়ার বটবৃক্ষের মতো। মুসলমানেরা নাকি এই বটগাছটি ধ্বংস করার চেষ্টা করেও পারে নি। কালভৈরবও শিপ্রা নদীর তীরে, আর ত্রিবেণীতে নবগ্রহের মন্দির। শনি পুজার জন্যে এই স্থানটি সবিশেষ পরিচিত।

তারপরেই বারিদে বললেন : আমি আপনাদের এই সব জায়গা দেখে সময় নষ্ট করতে বলব না। আপনাদের মতো যাত্রীর কাছে এ সবের কত মাহাত্ম্য আমি তা বুঝি।

এর পরে হাসতে হাসতে বললেন : একবার বেনারসে গিয়ে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। সেখানে তো অলিতে গলিতে মন্দির। আর পাণ্ডাদের মতে সবই এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ যে কোনটাকে বাদ দেবার উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত ক্ষেপে যেতেই রক্ষা পেয়ে গেলাম।

আমরা তখন শহরের পথ ছেড়ে নির্জন গ্রামের পথ ধরেছিলুম। মনে হচ্ছিল যেন একটা প্রাচীন দুর্গের পাশ দিয়ে আমরা চলেছি। কিন্তু দুর্গের দেওয়াল বা ঘরবাড়ি কিছুই নেই। গাছপালায় ঢাকা একটা উঁচু জায়গাকেই আমার দুর্গ বলে মনে হচ্ছিল। তাই জিজ্ঞাসা করলুম : আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি ?

বারিদে বললেন : গড়কালিকার মন্দিরের সামনে দিয়ে আমরা ভর্তৃহরি গুহায় যাব। এই কালী মন্দির খুব প্রাচীন বলে পরিচিত। অবন্তী সঞ্জকে দেশে কালিকা যত্র তিষ্ঠতে। এর থেকেই অনেকে বলেন যে প্রাচীন অবন্তী ছিল এই দিকেই। এইখানেই ছিল

কালিদাসের ইষ্ট ভূমি। মহারাজা বিক্রমাদিত্য এই প্রাচীন জীর্ণ মন্দিরের সংস্কার করেছিলেন।

বেশি সময় লাগল না। মন্দিরের সামনে পৌঁছে আমরা নেমে পড়লুম। সাধারণ মন্দির। কিন্তু ভিতরে কালীর বিরাট মূর্তি। সামনে সভামণ্ডপ। আশে পাশে গণেশজী ও অন্য দেবতাও আছেন ছোট ছোট মন্দিরে। বারিদে বললেন: আরতির সময় শহর থেকে বাস আসবে। বাসেও এখানকার প্রায় সব দর্শনীয় স্থানই দেখা যায়। কিন্তু এক দিনে দেখবার উপায় নেই বলে টাঙ্গা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

ভর্তৃহরি গুহা এখান থেকে দূরে নয়। সামনের দিকে খানিকটা এগিয়ে যেতেই শিপ্রা নদীর তীরে এই গুহা চোখে পড়ল। গুহা বললে ভুল হবে। একটি বাড়ি। রাস্তা থেকে অনেকটা নিচে নেমে যেতে হয়। রাজা ভর্তৃহরির সাধনা কেন্দ্র ছিল এই স্থান। কিন্তু বারিদে এখানে আমাদের ঘুরে দেখবার জন্যে বেশি সময় দিলেন না। বললেন: আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তো একটি খুব সাধারণ জায়গা দেখাবার ইচ্ছা আমার আছে। ভালো লাগবে কিনা জানি না, তবু—

বাধা দিয়ে আমি বললুম: নিশ্চয়ই দেখব।

বারিদে খুশী হয়ে বললেন: আসুন তাহলে।

বলে আমাদের উপরে এনে আবার টাঙ্গায় বসলেন।

অভিমন্যু আমাকে বলল: ভর্তৃহরি কে মামা?

মিনতি বললেন: আপনার গল্পের সেই ভর্তৃহরি নাকি?

বিরূপাক্ষ বললেন: ভট্টিকাব্যের কবির নাম ভর্তৃহরি। সংস্কৃত ব্যাকরণের অমন পণ্ডিত এ দেশে ছিলেন না।

সংস্কৃতের ছাত্ররা যে এ কথা হাড়ে হাড়ে স্বীকার করে তা আমার জানা ছিল। নতুন কলেজে উঠে ভট্টিকাব্য হাতে পেয়েই সংস্কৃত পড়ার বাসনা তাদের শেষ হয়ে যেত। কিন্তু তিনি ছিলেন বল্লভীরাজ শ্রীধর সেনের সভাপণ্ডিত।

বারিদে বললেন : ইনি সে ভর্তৃহরি নন। ইনি হলেন মহারাজা বিক্রমাদিত্যের বৈমাত্রেয় ভাই ভর্তৃহরি। এঁর কথা আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে।

কিছু জানা থাকলেও আমি বললুম : আপনার কাছে শুনব।

বারিদে বললেন : ইতিহাসে ভর্তৃহরি একটি অপরূপ চরিত্র। রাজাবলীতে দেখি যে তিনি গন্ধর্বসেনের পুত্র, এক দাসীর গর্ভে তাঁর জন্ম। বত্রিশ সিংহাসনে তিনি বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা। ভর্তৃহরির মা ছিলেন বিক্রমাদিত্যের মায়ের সখী। বিক্রমাদিত্যের পরামর্শে তিনি তাঁর মাতামহের রাজসিংহাসন পেয়েছিলেন। কিন্তু বেশি দিন রাজ্যসুখ ভোগ করেন নি। সিংহাসন ত্যাগ করে তিনি কাশীবাসী হয়েছিলেন। স্ত্রীকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন, লোকে তাই তাঁকে স্ত্রৈণ বলত। এই স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করেই তিনি সংসার ত্যাগ করেন, আর সন্ন্যাস গ্রহণ করে যোগ সাধনায় জীবন অতিবাহিত করেন।

একটু থেমে বারিদে বললেন : একটি মর্মান্তিক প্রবাদও আমি শুনেছি। সন্ন্যাসী ভর্তৃহরিকে নাকি হত্যা করেছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য নিজে। কিন্তু এই কুকর্মের কোন কারণ না থাকায় এ প্রবাদ সত্য বলে মনে হয় না।

মালবে আরও একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। তার থেকে জানা যায় যে মালবের রাজা ছিলেন ভর্তৃহরি এবং তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিক্রমাদিত্য তাঁর পিতার নিকট রাজ্যের কোন অধিকার পান নি। রাজা ভর্তৃহারর সঙ্গে মনোমালিন্য হবার পরে তিনি দীন দরিদ্রের মতো নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতেন। তার পরে স্ত্রীর বিশ্বাস ভঙ্গের বেদনায় ভর্তৃহরি রাজ্য ত্যাগ করে চলে গেলে বিক্রমাদিত্য এসে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। অনেকে বলেন যে ভর্তৃহরিই বিক্রমাদিত্যকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন।

হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বারিদে জিজ্ঞাসা করলেন :

আপনি চুনারের দুর্গ দেখেছেন?

বললুম: না।

বারিদে বললেন: একজন এই দুর্গ দেখে এসে বলেছিল যে যোগমার্গ অবলম্বন করে ভর্তৃহরি যেখানে তপস্যা করছিলেন, বিক্রমাদিত্য সংবাদ পেয়ে সেখানে একটি বাসগৃহ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। সেখানেই নাকি ভর্তৃহরির সমাধি আছে। জন কয়েক সাধু সেই সমাধির দ্বার রক্ষা করেন। তাঁরা নিজেদের যোগী নামে পরিচয় দেন। গেরুয়া পরেন ও হাতে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে রাজা ভর্তৃহরির গুণ কীর্তন করে বেড়ান। কাশীতে নাকি এঁদের প্রধান কেন্দ্র।

বারিদে কিন্তু থামলেন না। বললেন: সন্ন্যাসী হয়েছিলেন বলেই ভর্তৃহরিকে আমরা সম্মান করি না। তিনি অমর হয়েছেন তাঁর কাব্য ও ব্যাকরণের জন্য। শৃঙ্গারশতক নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতক নামে তিনখানি কাব্য গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন, আর কাব্যপদীয় বা হরিকারিকা সূত্র নামে পাণিনির মতো একখানি অমূল্য ব্যাকরণ। এ ছাড়াও লিখেছেন মহাভাষ্য দীপিকা ও মহাভাষ্য ত্রিপদী ব্যাখ্যা নামে দুখানি গ্রন্থ। তাঁর সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কথা এই যে তাঁর কাব্য শুধু ভারতবর্ষে নয়, বিদেশেও আদৃত হয়েছে। প্রায় তিনশো বছর আগে তাঁর কাব্যগুলি প্রথমে ফরাসী ভাষায় ও পরে লাতিন জর্মন ও ইংরেজী ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। দু হাজার বছর আগের এক ভারতীয় কবির এই সম্মান কি বিস্ময়ের নয়!

বারিদের কাছে আমি একেবারে নতুন কথা শুনলুম। পরম বিস্ময়ে বললুম: সত্যিই তাই।

২২

ফেরার পথে বারিদে বললেন : ভর্তৃহরির গুহার কাছেই মাটি খুঁড়ে পুরনো উজ্জয়িনীর অনেক কিছু আবিষ্কার করা গেছে। আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তো এই ধরনের কিছু আপনাদের দেখাতে চাই।

উত্তরে আমি বললুম : বেশ তো।

বারিদে বেশ খুশী হলেন আমার কথা শুনে, বললেন : যাত্রীরা যা দেখতে আসেন, আপনারা প্রায় সবই দেখে ফেলেছেন। এই শহর সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণাও আপনাদের হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন উজ্জয়িনী সম্বন্ধে কোন ধারণা হওয়া সম্ভব নয়।

বিরূপাক্ষ বললেন : সে তো মাটির নিচে চাপা আছে।

বারিদে বললেন : মৃতদেহ কবরেই থাকে, কিন্তু আত্মা যে অবিনশ্বর। উজ্জয়িনীর আত্মা তার সাহিত্যে অমর হয়ে আছে।

মিনতির চোখে আমি এক রকমের অদ্ভুত উজ্জ্বলতা দেখলুম। স্বপ্নময় ভাবালুতা। পশ্চিমের আকাশে দেখা দিয়েছে সূর্যাস্তের বর্ণাঢ্য বিজ্ঞাপন। প্রকৃতির প্রসাধন শুরু হয়েছে। অন্ধকারে তার অদৃশ্য অভিসার। কিন্তু এখনি কেন নয়নে আবেশ লাগছে! উজ্জয়িনীর অপরাহ্ণেই কি স্বপ্নের সহজ সঞ্চার!

বারিদে বললেন : সংস্কৃত সাহিত্যে আমার কোন দিন অনুরাগ ছিল না। সম্প্রতি একটা নাটকে অভিনয় করে ধরা পড়েছি।

মিনতি জানতে চাইলেন : আপনি বুঝি অভিনয় করেন?

শখ ছিল, সুযোগ পাই নি। বয়স যখন কম ছিল, তখন এ নিয়েই ভেসে পড়তে ইচ্ছে হয়েছিল। গোড়াতেই বাপের কাছে মার না খেলে জীবনটা আজ অন্য রকম হত।

বিরূপাক্ষ বললেন : সিনেমার হিরো!

বয়স কম থাকলে সবাই এই রকম ভাবে। বিশেষত যাদের চেহারা একটু চলনসই তাদের তো কথাই নেই।

মিনতি বললেন : আপনার অভিনয়ের কথা বলুন।

আমরা অভিনয় করেছিলাম শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটক। আমার ভূমিকা ছিল ব্রাহ্মণ চারুদত্তের।

সে-ই তো নায়ক!

নায়ক বলেই আমার বিপদ হয়েছিল। সে যুগের চাল চলন আর তার সামাজিক আবহাওয়া জানতে গিয়েই একটা নতুন নেশা ধরে গেল। শুধু উজ্জয়িনীর কথাই পড়লাম কত জায়গায়। সূত্রগ্রন্থে রামায়ণ মহাভারত পুরাণে আছে অবন্তীর পরিচয়। বিশালা নাম হয়েছিল এর বিশালতার জন্য। পুষ্পকরণ্ডিনী এর অন্য নাম। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় আড়াইশো বছর আগে চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক এখানে রাজত্ব করেন, আর তার প্রায় একশো বছর পর এখানকার গিরিমঠ থেকে চল্লিশ হাজার বৌদ্ধ যান সিংহল দ্বীপে। এ কথার উল্লেখ আছে সিংহলীদের মহাবংশে। টলেমির লেখায় ও পেরিপ্লাসে এই নগরের উল্লেখ আছে ওজিনি নামে, হিউএন চাঙ বলেছেন উ-শে-এন-না।

মৃচ্ছকটিকের যুগটাকে ঠিক ধরা যায় না। শ্রীহর্ষের মতো শূদ্রক কোন রাজার নাম। তিনি নিজে লিখেছিলেন, না শ্রীহর্ষের মতো কোন সভাকবিকে দিয়ে রচনা করিয়েছিলেন, তা জানবার উপায় নেই। শূদ্রকের কাল নির্ণয় করাও সম্ভব হয় নি। কাদম্বরীতে বিদিশার অধিপতির নাম শূদ্রক। কথাসরিৎসাগরে শূদ্রক শোভাবতী নগরীর নৃপতি। বেতাল পঞ্চবিংশতিতে তিনি বর্ধমানের রাজা। দশকুমারচরিত হর্ষচরিত ও রাজতরঙ্গিণীতেও শূদ্রকের উল্লেখ আছে। স্কন্দপুরাণে শূদ্রকের উল্লেখ দেখে মনে হয় যে তাঁর কাল বিক্রমাদিত্যের অনেক পূর্বে। এই সমস্ত উল্লেখের কথা উপেক্ষা করে মৃচ্ছকটিকের সমাজ ব্যবস্থার বিচারে একটা কাল নির্ণয় সম্ভব।

ব্রাহ্মণেরা যজন যাজন ছেড়ে বাণিজ্য করে ধনী হয়েছেন, আর রাজসিংহাসনে বসেছেন শূদ্রজাতি—এই হল মৃচ্ছকটিকের কাল। মনে হয় ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব তখন সমাজে শিথিল হয়ে গেছে, আর বৌদ্ধদের অভ্যুদয় হয়েছে জয়যুক্ত। মৃচ্ছকটিকে দেশের সামাজিক অধঃপতনের চিত্র নিখুঁত ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

উজ্জয়িনীতে তখন হিন্দু রাজার অধিকার। বৌদ্ধদের যত মঠ, তার চেয়ে বোধ হয় হিন্দুর দেবমন্দির বেশি। মঙ্গলেশ্বর কেদারেশ্বর মহাকাল ভৈরব, কুণ্ডের মধ্যে বিষ্ণুসাগর দামোদর অঙ্কপাত তীর্থ ও দশাশ্বমেধ ঘাট। সতীর সম্মান ছিল দেশজোড়া, গাছের ছায়ায় ছায়ায় সতী স্তম্ভ। বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসন পোঁতা ছিল নগরের দক্ষিণে যোগসহীদ পাহাড়ের নিচে। ছিল ভর্তৃহরির গুহা। আজ একটি মানমন্দির আপনারা জয়সিংহের কীর্তি বলে দেখলেন। বাবর বলেছেন যে এক দিন উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্যের তৈরি মানমন্দির ছিল।

শহরের কাছাকাছি তখন আমরা পৌঁছে গেছি। বারিদে হঠাৎ বলে উঠলেন: বাঁয়ে বাঁয়ে।

বামে একটি অনাদৃত পথ। গাছে ঢাকা ছায়াচ্ছন্ন।

বিরূপাক্ষ বললেন: এ পথে কেন?

আপনাদের একটি জায়গা দেখাব বলেছিলাম।

এই পথে!

এ পথে কোন দ্রষ্টব্য স্থান আছে বলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

বারিদে এ কথা মেনে নিয়ে বললেন: একখানা পোড়ো বাড়ি দেখাব। কালিদাসী আমলের বাড়ি না হলেও তার প্ল্যান কতকটা সে যুগের।

বেশি দূর নয়। কয়েক মিনিটেই আমরা সেখানে পৌঁছে গেলুম। কয়েকটি দরিদ্র পরিবার সেখানে বসবাস করছে। আমরা তাদের উপেক্ষা করেই সব কিছু দেখে নিলুম। বারিদে বুঝিয়ে

বললেন: সাতটি অঙ্গন পেরিয়ে গৃহস্বামীর বাসভবন হত। অষ্টম অঙ্গনের পর মালঞ্চে ঘেরা পুকুর।

বললেন: এ গৃহে আজ সিংহদ্বার নেই, নেই শুভ্র প্রাচীর, পাথরের সোপান, স্ফটিকের মতো সুন্দর বাতায়ন আর নানা চিত্রে রঞ্জিত প্রাচীরে ফুল ও মালার বাহার। এই দ্বিতীয় আঙিনায় যানবাহন থাকত, আর বৈঠকখানা ছিল তৃতীয় আঙিনায়। তারপর প্রমোদ ভবন। রন্ধনশালা আরও এগিয়ে। ষষ্ঠ আঙিনায় থাকত ক্রীতদাসেরা। গোয়াল আর আস্তাবল হত সপ্তম আঙিনায়।

ক্রীতদাসের কথায় অন্য কথা মনে পড়ল। ফেরার পথে বারিদে আমাদের সে কথাও শোনালেন: যত বড়লোক, তাঁর তত ক্রীতদাস। দেশে বেকার নেই। বড়লোকের ক্রীতদাস হলেই যখন অন্নবস্ত্রের পাকা সংস্থান হয়, তখন শুধু জীবন ধারণের জন্য চুরি-ডাকাতির প্রয়োজন নেই। মদে মেয়েমানুষে আর পাশা খেলায় সর্বস্ব হেরে গিয়েই ঋণ শোধের জন্য লোক ক্রীতদাস হয়েছে, এমন ঘটনার উল্লেখ আছে সে যুগের কাব্যে ও নাটকে। রেশম রত্ন প্রভৃতি মূল্যবান পণ্য নিয়ে দূর দূরান্তরের বণিক আসত উজ্জয়িনীতে, থাকত শ্রেষ্ঠীছত্রে। তাঁদের আমোদ-আহ্লাদের জন্য অঢেল আয়োজন।

বড় অন্ধকার দুর্গন্ধ সেই সন্ধ্যাগুলো। দ্যূতশালা নির্মিত হত রাজব্যয়ে, লভ্যের অংশ পেতেন রাজা। মদ্যপানে নিন্দা ছিল না, নারীকেও আসক্ত দেখা গেছে মদে ও বিলাসে। সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ বারবনিতার প্রণয়প্রার্থী হয়েছেন পরম নিশ্চিন্তে। তাদের বিবাহকে সমাজ অনুমোদন করেছে।

বারিদে জিজ্ঞাসা করলেন: মৃচ্ছকটিক পড়েছেন?

উত্তর মিনতি দিলেন: না।

এ একখানা অপূর্ব নাটক। আমার মনে হয় পৃথিবীতে সামাজিক নাটকের এমন সার্থক উদাহরণ আর দ্বিতীয় নেই। শেক্সপীয়রের

বয়স তো এখনও চারশো বছর পুরো হয় নি, গ্রীক নাটক না হয় আরও কিছু পুরনো হবে। মৃচ্ছকটিকের বয়স দেড় হাজারের কম হবে না, দু হাজার বছরেরও বেশি হতে পারে। কিন্তু পড়লে কে বলবে যে নাট্যকার আধুনিক নন। অন্য নাটকের সঙ্গে মৃচ্ছকটিকের তফাত এইখানে যে এর পাত্র-পাত্রী সমাজের সাধারণ মানুষ, সামাজিক সমস্যাই এর বিষয়বস্তু। নাটকের নায়ক কোন রাজা বা যুবরাজ নয়, একজন গৃহী ব্রাহ্মণ, তার স্ত্রীপুত্র আছে। নায়িকা কোন রাজকন্যা বা অপ্সরা নয়, একজন বারবনিতা। তাদের মিলনের অন্তরায় কোন দৈব অভিশাপ নয়। অন্তরায় একজন দ্বিতীয় পুরুষ, রাজার শালা, পিছনে তার ক্ষমতা আছে। বিবাহিত ব্রাহ্মণ চারুদত্ত বারবনিতা বসন্তসেনার প্রেমে আবদ্ধ হয়েছে। রাজার শালা সংস্থানক তার প্রতিদ্বন্দ্বী। বসন্তসেনা দরিদ্র চারুদত্তকে ভালবেসে সংস্থানককে প্রত্যাখ্যান করেছে। সংস্থানক উৎপীড়ক সমাজের প্রতিনিধি, সুতরাং সে প্রতিহিংসা নেবে। এই সঙ্গে একটি দ্বিতীয় কাহিনী সমাজের নিম্নতম মানুষের পরিচয় দিচ্ছে। এক ব্রাহ্মণকুমার শর্বিলকের অধঃপতনের কাহিনী। বসন্তসেনার ক্রীতদাসী মদনিকা। তার প্রেমে পড়ে শর্বিলক চুরি শিখছে। যার পূর্বপুরুষ কোন দিন দান গ্রহণ করে নি, সেই বংশের ছেলে একটা পণ্যা নারীকে পাবার জন্য চুরি বিদ্যা অধ্যয়ন করছে। চুরি বিদ্যার কলা কৌশল শেখাবার জন্য যে যুগে অনেক বিদ্যালয় ছিল।

বারিদে থামতেই মিনতি বললেন: সুন্দর গল্প তো!

বিরূপাক্ষ বললেন: চলুক, চলুক।

সহাস্যে বারিদে আবার গল্প শুরু করলেন, বললেন: চরিত্রগুলির একটু বিশেষত্ব আছে। এই যেমন চারুদত্ত। সর্বস্বান্ত হয়েও ব্রাহ্মণ তার নিত্য পূজা দেবসেবা করছে। সংসারে চরম অভাব, বন্ধু বান্ধব তাকে ত্যাগ করেছে। বিদূষক তাকে প্রশ্ন করছে, জদো এব্বং পুজ্জইন্তা বিং দেবদা ণ দে পসীদন্তি, তা কো গুণো দেবেস্থং

অর্চিদেম্নং? এত পূজাতেও যদি দেবতা প্রসন্ন না হন, তবে কেন মিথ্যা দেবতার অর্চনা করেন?

চারুদত্ত বলল, বয়স্য মা মৈবং গৃহস্থস্য নিত্যাঽয়ং বিধিঃ। ও কথা বলতে নেই, গৃহস্থের এটা নিত্য কর্ম।

তপসা মনসা বাগ্‌ভিঃ পূজিতা বলিকর্মভিঃ।
তুষ্যন্তি শর্মিনাং নিত্যং দেবতাঃ কিং বিচারিতৈঃ॥

নিত্য কর্মে দেবতা তুষ্ট হন, এতে আর বিচার কী আছে!

তারপর বসন্তসেনা। বারবনিতা হয়েও তার চরিত্রে দৃঢ়তা আছে। চারুদত্তের জন্য আর সকলকে সে প্রত্যাখ্যান করেছে। এমন কি চারুদত্তের পুত্র রোহসেনের জন্যও তার দুর্বলতার শেষ নেই। এক দিন রোহসেন এক ধনীর দুলালের সঙ্গে সুবর্ণ শকট নিয়ে খেলা করছিল। সেই ছেলেটি তার শকট নিয়ে চলে যেতেই রোহসেন কেঁদে আকুল হল। পরিচারিকারা তাকে একখানি মাটির শকট কিনে দেয়, কিন্তু তাতে তার মন ভরল না। বসন্তসেনা এই কথা শুনে নিজের অলঙ্কার বিক্রি করে রোহসেনকে সোনার শকট কিনে দেয়।

চারুদত্তের স্ত্রীর মধ্যেও মহত্ত্ব দেখতে পাই। নির্লোভ ও ধার্মিক নামে চারুদত্তের খ্যাতি ছিল। বসন্তসেনা এক সময় তাঁর কাছে কিছু অলঙ্কার গচ্ছিত রেখেছিল। শর্বিলক তখন শিখে-পড়ে পাকা চোর হয়েছে। সে সেই অলঙ্কার চুরি করে। চারুদত্তের লজ্জার সীমা নেই। কিন্তু তার চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হল তার স্ত্রী। স্বামীকে লোকনিন্দার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য নিজের সমস্ত অলঙ্কার বসন্তসেনাকে দেবার জন্য স্বামীর হাতে দিল।

ক্রীতদাসী মদনিকাও কম নয়। শর্বিলক যখন সেই অলঙ্কার তার হাতে দিল, সে তা গ্রহণ করতে পারল না। অর্থ না পেলে বসন্তসেনা মদনিকাকে মুক্তি দেবে না, কাজেই চুরি ছাড়া শর্বিলকের গত্যন্তর নেই। মদনিকা তবু বলল, যাও, বসন্তসেনাকে এই অলঙ্কার দিয়ে বল যে চারুদত্ত পাঠিয়েছে।

যে কৌশলে বসন্তসেনা চারুদত্তের স্ত্রীর অলঙ্কার ফেরত দেয়, তাও অপূর্ব।

কিন্তু এই সব ছোটখাট মহত্ত্বের পাশে গভীর পাপ ছিল আত্মগোপন করে। সংস্থানক যখন বুঝতে পারল যে বসন্তসেনাকে পাওয়ার চেষ্টা দুরাশা, তখন সে এক মর্মান্তিক ষড়যন্ত্র করল। ঠিক করল যে বসন্তসেনাকে হত্যা করে সেই অপরাধে চারুদত্তকে অভিযুক্ত করবে। সংস্থানক রাজার শালা, তার লোকবল বা অর্থবলের অভাব নেই। কাজেই ষড়যন্ত্র সফল হল। প্রহারে বসন্তসেনা অচেতন হল, তার আর খোঁজ পাওয়া গেল না। শোকাতুর চারুদত্তের বিচার শুরু হল। সাক্ষীর অভাব নেই। চারুদত্ত নিজেই অপরাধ করেছি বলল। আধিকরণিকের তবু কিছু সন্দেহ ছিল। কিন্তু সাক্ষী-প্রমাণে দণ্ড দিতেই হবে। স্মৃতিশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড বিহিত নয়, তাই তিনি চারুদত্তের নির্বাসন দণ্ড দিলেন। রাজা এই দণ্ডাজ্ঞা অনুমোদন করলেন না। শালার ইচ্ছায় চারুদত্তের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

কিন্তু তার ফল মারাত্মক হল। নিরপরাধ ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড হবে শুনে প্রজাবিদ্রোহ শুরু হল। রাজা সিংহাসনচ্যুত হলেন। উত্তেজিত জনতা যখন রাজাকে আক্রমণ করে, চারুদত্ত তখন তাঁর প্রাণ রক্ষা করে। বলে, শত্রুঃ কৃতাপরাধঃ শরণমুপেত্য পাদয়োঃ পতিতঃ শস্ত্রেণ ন হন্তব্যঃ। ক্ষমাই তো ব্রাহ্মণের ধর্ম।

মিনতি প্রশ্ন করলেন : বসন্তসেনার কী হল ?

লজ্জিত ভাবে বারিদে বললেন : গল্প বলতে আমি জানি নে।

না না, আমি তা বলছি নে।

বসন্তসেনা মারা যায় নি। এক বৌদ্ধ ভিক্ষু তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁরই সেবায় শুশ্রূষায় সে জীবন লাভ করে। চারুদত্তের সঙ্গে তার পুনর্মিলন হয় অত্যন্ত নাটকীয় ভাবে।

গল্প শেষ হবার পর খানিকটা পথ আমরা নিঃশব্দে অতিক্রম

করলুম। তারপর বারিদে বললেন: আর কিছু দেখবার আছে?

কতকটা আচ্ছন্নের মতো মিনতি বললেন: আছে।

আছে!

বিরূপাক্ষ আশ্চর্য হলেন।

মিনতি বললেন: গোপাল মন্দিরের সামনে আমি একবার নামব। আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন ভাই?

বলে আমার দিকে তাকালেন।

বারিদে বললেন: ঠাকুর বুঝি আপনার ভাল লেগেছে!

বিরূপাক্ষ বললেন: বেশ তো, আমরা সকলেই আবার দেখব!

না না, তোমরা সবাই কেন দেখবে! আমাকে একা একটুখানি থাকতে দাও।

এই অনুরোধের অর্থ বিরূপাক্ষ বুঝলেন না। কিন্তু প্রতিবাদও করলেন না। প্রতিবাদ করে হয়তো ফল হবে না, তাই চুপ করে রইলেন।

মন্দিরের সামনে পৌঁছে টাঙ্গা থামল। মিনতি নামলেন। অভিমন্যুও নামতে যাচ্ছিল, মিনতি তাকে বাধা দিয়ে বললেন: না খোকা, তুমি বাবার সঙ্গে থাক। আমি একটু পরেই ফিরব।

অভিমন্যুও তার মাকে চেনে মনে হল। আমিও কি চিনেছি! আর কিছু বলবার আগেই আমি নেমে পড়েছিলুম।

টাঙ্গা চলে গেল। উজ্জয়িনীর পথে তখন অন্ধকার নামতে শুরু করেছে।

২৩

টাঙ্গা থেকে নেমেই মিনতি বললেন : ওরা ভাবল, আমরা বুঝি গোপাল মন্দির দেখতে নামলাম!

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : তা নয় বুঝি!

আপনি পাগল হয়েছেন!

বলে মিনতি আমার দিকে তাকালেন সকৌতুকে।

খানিকটা চিন্তিত ভাবে আমি বললুম : তাহলে আমরা কোন্ দিকে যাব?

মিনতি একটা ধর্মশালার নাম করলেন। আর সেই কথা শুনে বিস্ময়ের আমার সীমা রইল না। বোধহয় ভয়ই পেয়েছিলুম খানিকটা। আর মিনতি তা লক্ষ্য করে হেসে বললেন : অমন ভয় পাচ্ছেন কেন! আমি কি আপনাকে খেয়ে ফেলব!

আমাকে আর খাবেন কী করে!

মাথা খাবার বয়সও বোধহয় নেই!

বলে মিনতি হাসতে লাগলেন।

একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করে আমরা সেই ধর্মশালার দিকে হাঁটতে লাগলুম। মিনতি একেবারে নিঃশব্দে হাঁটছেন। তাঁর মনে কী আছে, তা অন্তর্যামীই জানেন! আমি আর তা জানবার চেষ্টা করলুম না।

মেয়েদের মনে কী আছে, তা কি সহজে জানা যায়! স্বাতির সঙ্গে কম দিন তো আমি কাটাইনি, কিন্তু তার মনের কথা আজও জানতে পেরেছি কি! পুনা এক্সপ্রেসে পাশাপাশি বসে গেলুম পুনা দেখতে, তারপরে চলে গেলুম গোয়ায়। কত জায়গায় তার

সঙ্গে কত কথা হল। কিন্তু আসল কথাটাই জানতে বাকি রয়ে গেল। সে কথা কি সে কোন দিন আমাকে বলবে না!

আমার মুখের দিকে চেয়ে মিনতি হঠাৎ হেসে উঠলেন। আর আমি চমকে উঠলুম সেই হাসি শুনে।

মিনতি বললেন: অত দুর্ভাবনার কিছু নেই। আমি একজনের খোঁজ নিতে যাচ্ছি।

আমি যে অন্য কথা ভাবছিলুম লজ্জায় তা বলতে পারলুম না। হাসবার চেষ্টা করে বললুম: দুর্ভাবনা হয়েছে কেন ভাবছেন! আপনি চুপ করে চলছিলেন বলেই আমি কথা কই নি।

তাই বুঝি!

বলে মিনতি একটা বক্রোক্তি করলেন মনে হল। তারপরেই হেসে বললেন: আপনি খুব অন্যমনস্ক ছিলেন। কথা বলে আমি উত্তর পাই নি।

তাঁর কথায় আমি লজ্জা পেলুম, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করলুম না।

চলতে চলতেই মিনতি বললেন: ধর্মশালার অফিসে একটা খোঁজ নেব।

কিন্তু কী খোঁজ নেবেন, তা বললেন না।

ধর্মশালাটি খুঁজে পেতে আমাদের বেগ পেতে হল না। মিনতিই জিজ্ঞাসা করলেন: সুজিত বোস নামে এখানে কেউ আছেন?

যে ভদ্রলোককে প্রশ্নটি করেছিলেন, তিনি তৎপর ভাবে বললেন: না।

মিনতি বললেন: মাস কয়েক আগে এখানে তিনি ছিলেন।

ভদ্রলোক সংক্ষেপে উত্তর দিলেন: তা হবে।

কোথায় গেলেন বলতে পারেন?

না।

এবারে আমি প্রশ্ন করলুম: তাঁর কোন ঠিকানা আপনারা লিখে রাখেন নি?

সে খুঁজে বার করা অসম্ভব।

বললুম: অসম্ভব কেন! আমরা অপেক্ষা করব। দরকার হলে খরচ করব।

ভদ্রলোক কিছু বিরক্ত ভাবে বললেন: কত দিন আগে এখানে ছিলেন?

মিনতি উত্তর দিলেন: বারোই বৈশাখ।

ভদ্রলোক একটা মুখভঙ্গি করে বললেন: অত দিনের পুরনো খাতা আমার কাছে নেই।

মিনতি বললেন: আমি এই বছরের কথাই বলছি।

দুঃখিত।

বলে ভদ্রলোক তাঁর মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আর মিনতি আমার মুখের দিকে তাকালেন অসহায় ভাবে। আমি জোর দিয়ে বললুম: ঠিকানা না নিয়ে আমরা কিছুতেই যাব না। দরকার হলে পুলিসে খবর দেব।

মিনতি বললেন: না না, ঝগড়া করবেন না। সে বড় কেলেঙ্কারি হবে।

বলে আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে অনুসরণ করে আমিও বেরিয়ে এলুম।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে চলবার পরে আমি বললুম: এবারে আমরা কোথায় যাব?

কোথায়!

মিনতিকে বড় অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। আর আমি নীরবে তাঁর উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলুম।

অনেকক্ষণ পরে মিনতি বললেন: চলুন, শিপ্রার ঘাটে গিয়ে একটু বসি।

তাই চলুন।

চলতে চলতেই আমার মনে হল যে কোথায় যেন একটা বেদনার গান গুন গুন করে বাজছে। আমার মনের তারে তার স্পন্দন শুনতে পাচ্ছি। সেই গানের কোন কথা নেই, কোন ধ্বনি নেই। শুধু মানে আছে, আর আছে একটা আকুতি। অন্তরে গিয়ে তা বেদনায় আচ্ছন্ন করছে আমার চেতনা।

অসংখ্য প্রশ্ন আমার বুকের ভিতর জট পাকিয়ে উঠেছিল। কে সুজিত বোস, কী সম্বন্ধ তার সঙ্গে, কেন লুকিয়ে থাকে, কেন এই ছলনার প্রয়োজন—এ সব কথা মিনতিকে জিজ্ঞাসা করা যায় না। মন থেকেও মুছে ফেলা যায় না কিছুতে। সৌজন্যের সঙ্গে কৌতূহলের হয় যুদ্ধ। মন অস্থির হয়, ক্ষত বিক্ষত হয়। আমার মনেও বুঝি অন্য রকমের এক যন্ত্রণা ছিল। তাই মিনতি হঠাৎ বলে উঠলেন: আমার কাছে আপনি লুকোতে পারবেন না।

কী?

আপনার বেদনার কথা।

আমার বেদনা!

আপনার দিকে তাকালেই যে আমি তা দেখতে পাই।

আমি বিস্মিত হলুম, কিন্তু আপত্তি জানাবার সাহস হল না।

আরও খানিকটা পথ চলে মিনতি বললেন: ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনে আমি আপনাকে চিনেছি। আপনি তখন স্বাতির সঙ্গে কথা বলছিলেন।

আপনি চেনেন স্বাতিকে!

চিনতাম না। চিনেছি সেই দিনই। সেই মুহূর্তেই।

আমার মনে হল যে মিনতি ঠিকই চিনেছেন, চিনতে তাঁর ভুল হয় নি। কিন্তু কেমন করে চিনলেন!

মিনতি বললেন: আপনি আশ্চর্য হবেন জানি। কিন্তু এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মেয়েদের চোখ ঠিক ঈগল পাখির মতো।

বলে হাসতে লাগলেন। তার পরেই গম্ভীর হয়ে বললেন: আপনার কী রকম আত্মীয় তাঁরা?

শুধু নামে। দূরবীন লাগালেও কোন রক্তের সম্বন্ধ বেরোবে না।

তবে বাধা কিসের?

কিসের বাধা!

মিনতির এই বাধার প্রশ্ন আমি বুঝেছিলুম। কিন্তু এই প্রশ্ন তাঁর মনে কেন এল! অবিবাহিত নরনারী কিছু অন্তরঙ্গ হলেই তাদের বিবাহের কথা কেন অন্যের সমস্যা হবে! সমস্যা তো সমাজের সৃষ্টি, নীতির বড় বড় বাধা তুলে স্বাভাবিক জীবনটাকে খর্ব করেছে। মনুর অনুশাসনের মানে আছে, তাতে চরিত্রবল গড়ে ওঠে, সমাজের ভিত্তি হয় দৃঢ়। কিন্তু আজ তো মনুর অনুশাসন শিথিল হয়ে গেছে। আজকের সমাজনীতি রাজনীতির মতো নতুন সমস্যা এনেছে ডেকে। নানা বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। সে ধর্মের ভিত্তিতে নয়, পেশা দিয়েও নয়। এ যুগের সকল বর্ণের মূলে আছে অর্থ। অর্থ দিয়েই মানুষের পরিচয়, মানুষের কৌলীন্য। বিবাহে ঠিকুজীর বিচারের আগে হয় অর্থ-সামর্থ্যের বিচার। কিন্তু সে অর্থ কী ভাবে এল, তার কোন বিচার নেই। অর্থের অভাবই সমাজে প্রতিষ্ঠার সব চেয়ে বড় অন্তরায়। মিনতি কি এই বাধার কথা জানেন না!

বুঝেছি।

মিনতির বুক থেকে একটা দীর্ঘ শ্বাস উঠল মনে হয়। কিন্তু আমার বুক থেকে উঠল না। আমার মনে হল যে ওই দীর্ঘ শ্বাসের সঙ্গে আমি তাঁর নিজের অতীতের পদধ্বনি শুনলুম। তাঁর চিন্তার প্রবাহ এখন উল্টো মুখে বইছে, বর্তমান থেকে অতীতে গেছে পৌঁছে।

শিপ্রার ঘাটে পৌঁছে আমরা পাশাপাশি বসলুম। কিন্তু একটু

দূরে দূরে, আঁচল উড়লেও যেন তার স্পর্শ আমার গায়ে না লাগে এমনই তফাতে।

শিপ্রার ধারা এখানে সোজা বয়ে যায় নি, নদীর মতোই বেঁকে ঘুরে গেছে। বাঁধানো ঘাটের উপর ঘর বাড়ি মন্দির আছে গায়ে গায়ে লেগে। অল্প অল্প বাতাস বইছে। আমরা স্থির হয়ে আছি।

কিন্তু মন কিছুতেই স্থির হয়ে থাকতে চাইছে না। কিছু বলবার জন্যে মন ছটফট করছে। মিনতি কী করে এমন স্থির হয়ে আছেন! তাঁর কি বলবার কিছু নেই! কিছু করবারও নেই!

এমনি করে স্বাতির পাশে আমি অনেক বার অনেক জায়গায় বসেছি। কিন্তু মন এমন চঞ্চল হয় নি, এমন অসহায় মনে হয় নি। বোধ হয় স্বাতির জন্যই হয় নি। সে আমাকে নীরব থাকতে দেয় নি, কথায় কথায় ব্যস্ত করে রেখেছে। নর নারী যখন নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে, তখন তাদের এক জাত। নীরব হলেই তারা জাত বদলায়, অন্ধকারে সভ্যতা ভোলে। মানুষের ধর্ম দুর্বলতা, নির্জনে অন্ধকারে মানুষ দুর্বল হয়। আমি দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতে পারি না বলেই এত অস্থির বোধ করছি। মিনতি স্বাতি হলে কোন ভাবনা ছিল না। তার সঙ্গে সম্বন্ধ আমার সহজ হয়ে গেছে।

মিনতির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, ভাবনায় মিনতি ভিন্ন জগতে চলে গেছেন। আমার কথা তাঁর মনে পড়ছে না, মনে পড়ছে না শিপ্রার কথা বা উজ্জয়িনীর কথা। আমার হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়ল। একটা সন্ধ্যা মিনতি শিপ্রা নদীর তীরে কাটাতে চেয়েছিলেন। সে কি এমনি করে! না, সুজিত বোসের সঙ্গে!

মিনতিকে এখন বড় রহস্যময় মনে হচ্ছে, যেমন রহস্যময় মনে হয়েছিল সুজিত বোসকে। ধর্মশালায় তাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। কিন্তু উজ্জয়িনীর সন্ধ্যায় যে সে আজও হারিয়ে যায় নি, তাতে আমার সন্দেহ নেই। বিরূপাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে বুঝি সে

সুজিত বোসকে আনা যায় না। বড় কোমল পেলব স্পর্শ সুজিতের, বিরূপাক্ষের তীব্র তাপে বুঝি ঝলসে যাবে। এই সন্ধ্যায় তাই মিনতি একা থাকতে চেয়েছেন, আমাকে এনেছেন শুধু নিরাপত্তার জন্য। আমাকে নীরব থাকতে হবে, তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করলে এখন চলবে না।

কিন্তু আমার ধ্যান যে বারবার ভেঙে যাচ্ছে। আমি যা ভাবতে চাই না, সেই ভাবনাই ঘুরে ফিরে আসছে। সে তো ঠিক ভাবনা নয়—সে ভয়, সে ঈর্ষা, সে বেদনা। বম্বেতে জো রায় আমাকে হটিয়ে দিয়েছে। মামী তাকে প্রশ্রয় না দিলে কিছুতেই আমাকে হটাতে পারত না। মামা নিরপেক্ষ ছিলেন। আর স্বাতি! স্বাতি কি আমার পক্ষে ছিল না! তবে সে কেন আমায় অত তাড়াতাড়ি ট্রেনে তুলে দিল! কেন শেষ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে থাকতে দিল না!

স্বাতির কৈফিয়ত আমি ভুলি নি। কিন্তু সে কৈফিয়তে এখন আর মন ভরছে না। মনে হচ্ছে, সে একটা মনগড়া কথা। কিন্তু সেই কথাতেই তো তখন আমার সমস্ত মন ভরে গিয়েছিল। অভিভূত হয়েছিলুম, আচ্ছন্ন হয়ে ছিলুম সারাটা পথ।

কী ভাবছেন?

মিনতির প্রশ্নে আমি চমকে উঠে তাকালুম।

একেবারে যে হারিয়ে ফেলেছেন নিজেকে!

সত্যিই তো, মিনতিই আমাকে এ কথা বলবেন। তাঁরই জন্য আমি চুপ করে আছি কি না, তাই এই অভিযোগ শুনতে হল। বললুম: কোন কথা বলব কি না ভাবছি।

বেশ কথা।

বলে মিনতি খিল খিল করে হেসে উঠলেন।

আমার বিস্ময়ের আর সীমা নেই। এ কোন্ মিনতিকে আমি দেখছি! এ যে স্বাতির মতোই ছলনাময়ী। নিজের দুর্বলতাকে হাসি দিয়েই ঢেকে দিলেন।

বললুম : আপনার কাছে আমি হেরে গেলুম।

হেরে যেতেই আপনি অভ্যস্ত দেখছি।

উপায় কী বলুন!

স্বাতির কাছে এ কথা বলেন নি?

না।

সত্যি?

তার কাছে গম্ভীর হবার সুযোগ পাই নি।

মিনতি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : চলুন এবারে। দেরি দেখলে সবাই হয়তো খুঁজতে বেরোবেন।

চলুন।

উঠে দাঁড়াতে আমার একটুও দেরি হল না।

পথ চলতে চলতে আমি মিনতির কথাই ভাবছিলুম। তাঁর হৃদয়ের কোন নিভৃত কোণে যে বেদনার ধ্বনি বাজছে, তার উৎসের সন্ধান আমি পেলুম না। জানতে চাইবার দুঃসাহস আমার হল না। মিনতিও সযত্নে আমার কৌতূহল এড়িয়ে গেলেন।

আবার ভাবতে শুরু করেছেন?

না।

না মানে? আমি দেখছি আপনি ভাবছেন!

মেনে নিতে আমার দ্বিধা হল না। বললুম : ভাবনার ওপর আমার কোন দখল নেই। নীরব থাকলেই কিছু মনে আসে।

মিনতি হেসে বললেন : এ বুঝি সৃষ্টিছাড়া নিয়ম!

বোধ হয় না! আপনাকেও আমি ভাবতে দেখেছি।

ভুল দেখেন নি তো?

ভুল দেখি নি, কিন্তু ভুল বুঝেছি কি না জানি নে।

সে বিচার আজ থাক্।

আমি জানি, মিনতি এই রকমই কিছু বলবেন। এত অল্প পরিচয়ে

এর চেয়ে বেশি বলা সম্ভব নয়। অপেক্ষা আমাকে করতেই হবে।

চলতে চলতে মিনতি আবার থমকে দাঁড়ালেন। বললেন: কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

বললুম: পথ তো চিনি নে, তাই ভাবছি—

বাধা দিয়ে মিনতি বললেন: সারা দিন ঘুরে বেড়িয়েও আমরা পথ চিনতে পারছি নে।

বললুম: এতক্ষণ তো অন্যের ভরসায় ঘুরেছি।

মিনতি হেসে বললেন: এবারেও তবে অন্যের সাহায্য নিন।

আমি আর দেরি করলুম না। একটা গাড়ি ধরে বললুম: স্টেশনে চল।

স্টেশনের কাছাকাছি এসেই দেখতে পেলুম যে বিরূপাক্ষ স্টেশনের বাহিরে ব্যস্ত ভাবে পায়চারি করছেন। আমাদের দেখতে পেয়েই এগিয়ে এসে বললেন: এত দেরি হল তোমাদের!

মিনতি সংক্ষেপে বললেন: হ্যাঁ।

দেরি আমাদের বেশি হয় নি। মন্দিরের আরতি দেখে ফিরতে হলে আমাদের এতটা সময়ই লাগত। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে দেখলুম, এ প্রসঙ্গ শেষ হয়ে গেল।

মিনতি জিজ্ঞাসা করলেন: খোকা কোথায়?

তার চাচার কাছে।

বলে বিরূপাক্ষ বোধ হয় বারিদের কথাই বললেন।

উজ্জয়িনীর পথ ঘাটে দোকানে ও বাজারে তখন উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। রাতের হিসাব আর পাওয়া যাচ্ছে না।

স্টেশনের ভিতরে এসে দেখলুম যে অভিমন্যু বারিদের কাছে নয়, কর্তব্যরত অ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে তাঁর ঘরের যন্ত্রপাতি নিয়ে আলোচনা করছে। আমাকে দেখতে পেয়েই ছুটে বেরিয়ে এল, বলল: আজ আমাকে একটাও গল্প বল নি মামা।

হেসে বললুম: খুব ভুল হয়ে গেছে।

তারপরে বিরূপাক্ষকে বারিদের কথা জিজ্ঞাসা করলুম।

বিরূপাক্ষ বললেন: অনেক কষ্টে ঠেলেঠুলে তাঁকে বাড়ি পাঠিয়েছি। ভদ্রলোক কাল থেকে বিশ্রাম করতে পারেন নি। তাই আজ বলেছি, সন্ধ্যা বেলায় একটা লম্বা ঘুম দিয়ে ডিউটিতে আসতে।

তারপরেই বললেন: আমাদের যাত্রার ব্যবস্থার জন্যে কোন চিন্তার কারণ নেই বলে গেছেন। কাল রাতের মতো ব্যবস্থা হয় নি। ওয়েটিং রুমেই রাত একটা পর্যন্ত কাটাতে হবে। নাগ্‌দা থেকে যে ট্রেন আসবে, তিনি নিজে এসে আমাদের সেই ট্রেনে তুলে শোবার ব্যবস্থা করে দেবেন। ভোর ছটায় আমরা ভোপালে পৌঁছতে পারব।

তারপর?

ভোপালে যা দেখবার আছে, তাও বলে দিয়েছেন। সময় নষ্ট না করে একখানা টাঙ্গা ধরতে হবে। সেই টাঙ্গায় বড় লেকের পাশ দিয়ে চলে যেতে হবে টি. টি. নগর পর্যন্ত। সেখানে বিড়লার নতুন মন্দির দেখে ছোট লেকের উপর পুল পেরিয়ে স্টেশনে এসে দশটার আগে পৌঁছতে পারলেই সাঁচী যাবার জন্যে একখানা ট্রেন পাওয়া যাবে।

আমি হেসে বললুম : আর দেরি হয়ে গেলে?

বিরূপাক্ষ এ প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যেও তৈরি ছিলেন, বললেন : দুপুর তিনটের পরে আর একখানা ট্রেন আছে। আর আপনার অবশ্য ভাবনা নেই। বাস যাতায়াত করে সারাক্ষণ। কিন্তু এক যাত্রায় তো পৃথক ফল হতে পারে না। তাই—

বুঝতে পেরেছি।

অভিমন্যু আমাকে তাড়া দিয়ে বলল : গল্প শুনব মামা। আজ একটা খুব ভাল গল্প বলতে হবে।

বিরূপাক্ষ আমাদের ওয়েটিং রুমে নিয়ে এলেন। সেখানে বসেই আমি অভিমন্যুকে বললুম মহাকবি কালিদাসের গল্প। কালিদাসের সাহিত্য আলোচনা নয়, তাঁর জন্মস্থান নিয়ে কোন বিতর্কের কথা নয়। কালিদাসের যে কিংবদন্তী আমরা সবাই শুনেছি আমাদের শৈশবে, সেই মহামূর্খ কালিদাসের মহাকবি হবার গল্প। কিন্তু তা বলবার আগে জেনে নিলুম, সে গল্প সে এর আগে শুনেছে কিনা। অভিমন্যু বলল, শোনে নি।

বললুম : আমাদের ভারতবর্ষ তো বিরাট দেশ। অনেক রাজ্য এই বিরাট দেশে। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে সব রাজ্যের লোকই বলে যে কালিদাসের জন্ম তাদেরই রাজ্যে। উজ্জয়িনীর লোক তো কারও কথা মানতে চায় না। বলে যে বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সভায় যখন তিনি প্রধান রত্ন ছিলেন, তখন তিনি উজ্জয়িনীরই লোক। কিন্তু আমি কী বলি জান?

অভিমন্যু বলল : কী?

আমি বলি কালিদাস ছিলেন বাঙালী।

বাধা দিয়ে মিনতি বলে উঠলেন : এ আবার কী কথা বলছেন!

বললুম : আমারও একটা যুক্তি আছে। কালিদাস নামটা যে বাঙালী তা স্বীকার করবেন। আর গুপ্ত রাজাও বাঙালী ছিলেন বলে আমার বিশ্বাস।

কেন?

বলে বিরূপাক্ষ আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললুম: নবদ্বীপের কাছে সমুদ্রগড় নামে একটা জায়গা আছে। সবার ধারণা যে সেখানেই রাজত্ব করতেন সমুদ্রগুপ্ত। এঁরাই গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে উজ্জয়িনীতে রাজধানী এনেছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত হলেন বিক্রমাদিত্য, আর কালিদাস এঁদের সঙ্গে বাঙলা থেকে এসেছিলেন।

বিরূপাক্ষ হেসে উঠলেন, বললেন: এ নিয়ে আপনি একটা প্রবন্ধ লিখে কাগজে ছাপিয়ে দিন। নাম হয়ে যাবে আপনার।

হেসে বললুম: তা দেব।

তারপরে অভিমন্যুকে বললুম: এবারে তোমাকে কালিদাসের বিয়ের গল্পটা বলি। এক ভদ্রলোকের একটি মেয়ে লেখাপড়া শিখে খুব পণ্ডিত হয়েছিল। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, যে পণ্ডিত তর্ক করে তাকে হারাতে পারবে, সে তাকেই বিয়ে করবে। কিন্তু কোন পণ্ডিত তাকে হারাতেও পারে না, আর তার বিয়েও হয় না। শেষ পর্যন্ত সেই মেয়ের বাপ বিরক্ত হয়ে ভাবল যে এক মহা মূর্খের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবে। এই ভেবে সে একজন মূর্খ খুঁজতে বেরোল। এক জায়গায় দেখতে পেল যে একটা লোক গাছের যে ডালে বসেছে, সেই ডালটাই সে কাটছে। ডালটা পুরো কাটা হয়ে গেলে যে নিজেও নিচে পড়ে গিয়ে মারা পড়বে, সে বুদ্ধিও তার নেই। মেয়ের বাবা খুশী হয়ে ভাবল যে এই লোকটাকেই নিয়ে যাওয়া যাক।

অভিমন্যুর বেশ ভাল লাগছিল এই গল্প, বলল: তারপর?

বললুম: তারপর সেই লোকটার সঙ্গে মেয়েটার তর্ক আরম্ভ হল। এবারে আর কথায় তর্ক নয়, ইঙ্গিতে তর্ক। মেয়েটি একটি আঙুল দেখাতেই, লোকটা দুটো আঙুল দেখাল। তারপর মেয়েটা তিনটি আঙুল দেখালে বাহাদুরীর জন্যে সে চার আঙুল

দেখাল। তারপর মেয়েটি যখন পাঁচ আঙুল দেখাল, তখন লোকটা ভাবল যে বোধহয় চড় মারবে বলে ভয় দেখাচ্ছে। তাই লোকটা মুঠো দেখিয়ে বোঝাল যে সে ঘুষি মেরে শিক্ষা দেবে। সেই পণ্ডিত মেয়ে কী বুঝল সেই জানে, বাপকে বলল যে আমি হেরে গিয়েছি। তার সঙ্গেই বিয়ে হয়ে গেল মেয়েটার।

অভিমন্যু বলল : এই লোকটাই কালিদাস নাকি ?

বললুম : কালিদাস ছাড়া আর কে হবে !

মহাপুলকে অভিমন্যু বলল : তারপর ?

বললুম : তারপর বিয়ের পরে সব ফাঁস হয়ে গেল। উটের ডাক শুনে কালিদাস বললেন, উট্র ডাকছে। উষ্ট্র কথাটা উচ্চারণ করতেই পারলেন না। কালিদাসের বউ তখন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বরকে বের করে দিল ঘর থেকে। কালিদাস আর কী করবেন! মনের দুঃখে ভাবলেন, এ জীবন রেখে আর লাভ কী! মরবার জন্যে একটি কুণ্ডের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু সেই কুণ্ড ছিল সরস্বতী কুণ্ড। সরস্বতী তাঁকে উদ্ধার করে বললেন, আজ রাতে যত বই তুমি আদ্যন্ত পড়বে, তার সব জ্ঞান তোমার এক রাতেই হবে। বলে তাঁকে অনেক বই পড়তে দিলেন। কালিদাস বেচারা আদ্যন্ত কথার মানে বুঝলেন আদি আর অন্ত। মানে প্রথম আর শেষ পাতা পড়তে হবে। সারা রাত জেগে তিনি সব বইএর প্রথম ও শেষ পাতা পড়ে শেষ করে ফেললেন।

অভিমন্যু বলে উঠল : ভারি মজার গল্প তো!

বললুম : তারপর শোন। সরস্বতী পড়লেন বিপদে। কালিদাস তাঁর কথা রেখেছে, এখন বিদ্যে না দিয়ে উপায় কী! বললেন, ঠিক আছে, তোমাকে আমার বরপুত্র করলাম।

তারপর ?

তারপর আর কী! কালিদাস আনন্দে লাফাতে লাফাতে চললেন শ্বশুরবাড়ি। সেখানে গিয়ে দেখলেন যে বউএর ঘরের

দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে ডাকাডাকি করতে বউ জিজ্ঞেস করল, আবার ফিরে এসেছ কেন? কালিদাস তখন সংস্কৃতে উত্তর দিলেন, অস্তি কশ্চিৎ বাগ্‌ বিশেষঃ, মানে তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে।

অভিমন্যু বলল : সংস্কৃত শুনে বউ দরজা খুলে দিল?

বললুম : উঁহু। কালিদাস ফিরে গিয়ে তিনখানি বই লিখলেন ঐ তিনটি শব্দ দিয়ে—কুমারসম্ভব মেঘদূত ও রঘুবংশ।

মিনতিও মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন, বললেন : প্রথম লাইনগুলো আপনার মনে আছে?

হেসে বললুম : আছে।

তারপরে বললুম সেই তিনটি বিখ্যাত কাব্যের শ্লোকাংশ।—অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয় নামো নগাধিরাজঃ, কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ, আর বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ—

বিরূপাক্ষ বলে উঠলেন : থাক থাক বুঝতে পেরেছি আপনার কথা।

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌ বিক্রমোর্বশী মালবিকাগ্নিমিত্র, এই তিনখানি নাটক ও শৃঙ্গার তিলক শ্রুতবোধ পুষ্পবাণ বিলাস ঋতুসংহার প্রভৃতি আরও অনেকগুলি গ্রন্থ তিনি লিখেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের সে এক স্বর্ণযুগ ছিল এই উজ্জয়িনীতে। কিন্তু সে সব কথা আমি বলবার চেষ্টা করলুম না।

অভিমন্যু কিন্তু আমার গল্পটার কথা মনে করিয়ে দিল। বলল : বউএর সঙ্গে ভাব হয়েছিল তো কালিদাসের?

বললুম : নিশ্চয়ই হয়েছিল। কালিদাসের প্রথম তিনটি কাব্য শুনেই তাঁর বউ ঝগড়া মিটিয়ে ফেলেছিল।

ওয়েটিং রূমেই আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। নির্দিষ্ট সময়ে বারিদে এসে আমাদের জাগিয়ে দিলেন, বললেন : আসুন এইবারে, গাড়ি আসছে।

বলে আমাদের ডেকে নিয়ে গিয়ে একখানা খালি গাড়িতে তুলে দিয়ে বললেন: এইবারে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোন। ভোর ছটার ঠিক পরেই পৌঁছবে ভোপালে।

মিনতি ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন: ভোপাল দেখবার ইচ্ছা আমাদের নেই। আমরা সাঁচী দেখতে পেলেই খুশী হব।

বারিদে বললেন: পৌঁছবার কিছু পরেই সাঁচীর ট্রেন পাবেন। কিন্তু ভোপাল দেখে যাবেন না কেন? মধ্যপ্রদেশের রাজধানী, সিপাহী বিদ্রোহের নেতা তাঁতিয়া টোপির নামে টি. টি. কলোনি গড়ে উঠেছে একটা পাহাড়ে, বিড়লারা মন্দির গড়ে দিয়েছেন একটা। আর পুরনো ভোপাল শহরটাও মন্দ নয়। নবাবের রাজধানী তো!

তারপরেই বললেন: আর ভোপাল থেকে সাঁচী মাত্র আটাশ মাইল। ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী হলে যে কোন ট্রেন দাঁড় করাতে পারতেন। তা পারবেন না, প্যাসেঞ্জারেই যাবেন। গাড়ি ফেল করলে বাস পেয়ে যাবেন শহরে।

মিনতি বিরূপাক্ষর দিকে তাকিয়ে বললেন: খুব নোংরা শহর বলে শুনেছি।

বিরূপাক্ষ বললেন: আমি শুনেছি ছবির মতো।

মিনতি বললেন: ছবিও বিশ্রী হয়। সব ছবিই কি আর সুন্দর!

বিরূপাক্ষ কৌতুকের সুরে বললেন: তোমাকে যখন আমি পুতুলের মতো বলি, তখন খাঁদা পুতুলের কথা আমার মনে হয়!

মিনতি লজ্জায় তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বিরূপাক্ষর মন এখন প্রসন্ন। এ সময় হয়তো তিনি আরও অশোভন রসিকতাও করতে পারেন।

বারিদে এ সব কথা বুঝতে পারেন নি, বললেন: ভোপালে একটা ভাল টাঙাওয়ালা ধরবেন। সে-ই গাইডের মতো কাজ করবে।

বলে বিদায় নিলেন আমাদের কাছে. কিন্তু বিদায় দেবার আগে

বিরূপাক্ষ সগৌরবে বললেন: আমাদের আত্মীয় সমাজটা দেখছেন তো! দেশে দেশে মোর ঘর আছে—

কথাটা হিন্দীতে বলেছিলেন বলে বারিদে হাসতে হাসতে ফিরে গেলেন।

ভোর ছটার আগেই আমাদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বিরূপাক্ষ বললেন: গাড়িতেই তৈরি হয়ে নেওয়া যাক। সকাল দশটার প্যাসেঞ্জার আমরা মিস করতে চাই নে।

তাই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আমরা তৈরি হয়ে নিয়েছিলুম। সাঁচীতে পৌঁছে স্নান খাওয়া করা যাবে। তাই শুধু চা খেয়েই আমরা ভোপাল শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লুম।

ভোপাল স্টেশনটি শহরের উল্টো দিকে। মেন গেট দিয়ে বেরিয়ে আমরা একটা ভাল টাঙ্গা ধরলুম। সেই টাঙ্গা ঘুরে রেল লাইন পেরিয়ে স্টেশনের উল্টো ধারে শহরে এল। তারপর এগিয়ে চলল। বিরূপাক্ষ তাকে মোটামুটি কিছু দেখিয়ে দশটার আগেই স্টেশনে ফিরিয়ে আনবার কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। ভাড়ার টাকাও রফা করে ফেলেছিলুম। আমি ঠিক করেছিলুম যে এই টাকা আমিই দেব। উজ্জয়িনীতে আমি সে সুযোগ পাই নি।

পথ চলতে চলতে টাঙ্গাওয়ালাই সব বুঝিয়ে দিচ্ছিল। স্টেশনের উল্টো ধার দিয়ে বেরোলেই সামনে শহরের প্রধান রাজপথ। কিন্তু আমরা সে পথে না গিয়ে সংক্ষিপ্ত পথে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চললুম। পুরনো শহরের পথ ঘাট নোংরা হয়েই থাকে, কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মূল্য না দিলে অন্যায় হবে। এই পাহাড়ী শহরে দুটি হ্রদ আছে। একটির নাম গ্রেট লেক, প্রায় সোয়া দু মাইল তার পরিধি। একটা বিশ্রি বস্তির ভিতর দিয়ে আমরা এই লেকের পাশের সুপ্রশস্ত পথে পৌঁছে গেলুম। এক ধারে সুন্দর ফুলের বাগান, অন্য ধারে বিশাল জলাশয়। তার পরপারে

ছোট বড় ঘর বাড়ি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেগুলো চিনে নেবার উপায় নেই।

টাঙ্গাওয়ালার কাছে জানলুম যে দ্বিতীয় লেকটির নাম লোয়ার লেক। ফেরার পথে সেই লেকটিও আমরা দেখতে পাব। তার আয়তন এক মাইলের চতুর্থাংশ। এই দুই লেকের মাঝখানে যে পুল, তারই উপর দিয়ে আমরা ফিরব।

বেতোয়া আর কালিয়াসত নামে দুই নদী নাকি এই ভোপাল তালের ভিতর দিয়ে বইত। বেতোয়া হল মেঘদূতের বেত্রবতী নদী। ভোজপুরের নিকটে কুমরি গ্রামে জন্ম। এখানে তার চিহ্ন দেখলুম না। দেখলুম শিমলা পাহাড়, আর হ্রদের জলে তার ছায়া। হ্রদের এক কোণে সূর্যাস্তের সময় নাকি এই পাহাড় থেকে শহরের অপরূপ দৃশ্য দেখা যায়। তারপরে অন্ধকার নামলে আরও সুন্দর। হ্রদের ধারে বাড়িতে বাড়িতে জ্বলে আলো। সেই আলোর প্রতিবিম্ব পড়ে নীল জল স্বপ্নময় হয়ে ওঠে।

মিনতি স্বীকার করলেন যে এ জায়গার সম্বন্ধে যা শুনেছিলেম তা সত্য নয়। শহরটি তাঁর ভালই লাগছে।

টাঙ্গাওয়ালা বলল : সুন্দর বাগান এখানে অনেক আছে। তাদের মধ্যে প্রধান হল অ্যাশ বাগ। আমরা আয়েস বলি, কিন্তু মানে আরাম নয়, আনন্দ। নুর বাগ, নুর মানে আলো। ফরহাতফ্জা বাগ, এই কঠিন শব্দটার মানে আনন্দ বর্ধন। কমলা পার্কও আছে।

শহরে মসজিদ আছে তিনটে। জামা মসজিদ, মতি মসজিদ আর তাজ-উল মসজিদ। এই সব মসজিদের নির্মাতাদের নাম শুনে আমরা আশ্চর্য হলুম। নবাব বাদশাহরা এ সব নির্মাণ করেন নি। করেছেন বেগমরা, মা মেয়ে ও নাতনি। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কুদসিয়া বেগম জামা মসজিদ নির্মাণ করেন, তাঁর কন্যা সিকান্দারা বেগম নির্মাণ করেন মতি মসজিদ, আর তাজ-উল মসজিদ নির্মাণ করেন সিকান্দারা বেগমের কন্যা শাহজাহান বেগম।

একাদশ শতাব্দীতে রাজা ভোজ এই স্থানে যে শহর পত্তন করেন, তার নিদর্শন এখন পাওয়া যায় না। সেই প্রাচীন শহর এখন শুধু প্রবাদের জোরেই বেঁচে আছে। রাজা ভোজ নাকি ছশো পঞ্চাশ মাইল জুড়ে এক বিরাট হ্রদ খনন করিয়েছিলেন এই শহরের নিকটে। মালবের হোসঙ্গ শাহ তার বাঁধ কেটে সমস্ত জল বার করে দিয়েছিলেন। এখন সেই হ্রদের বুকে ফসল ফলছে সোনার মতো।

আজ যে ভোপাল আমরা দেখছি, তার পত্তন করেন দোস্ত্ মহম্মদ খান অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। প্রথমে তিনি ফতেগড় দুর্গ নির্মাণ করেন। বৃটিশ আমলে এই শহরেই ভোপাল রাজ্যের রাজধানী ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পরে হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। এখন মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত হয়েছে, আর এই শহরই হয়েছে মধ্যপ্রদেশের রাজধানী।

টাঙ্গাওয়ালা আমাদের আমেদাবাদ প্যালেসের সাদা বাড়ি, আর পাহাড়ের চূড়ার উপরে নবাবের বিরাট প্রাসাদ চিনিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। তারপরে সোজা এগিয়ে গিয়েছিল তাঁতিয়া টোপি কলোনির দিকে।

এখানকার আবহাওয়া বেশ মনোরম। ইন্দোর-উজ্জয়িনীর মতো এও সমুদ্রতল থেকে দেড় হাজার ফুটের বেশি উঁচুতে অবস্থিত। টি. টি. কলোনি কিন্তু অন্য একটি পাহাড়ের উপরে। পথ নিচু হয়ে আরও উপরের দিকে উঠতে লাগল। এ সব জায়গায় বাস যাতায়াত করে। নতুন ঘর বাড়ি হয়েছে, নতুন বাজার হাট, বসতি ঘন হয়ে উঠেছে। এই সব দেখতে দেখতেই আমরা সব চেয়ে উঁচু স্থানে বিড়লা মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

এ মন্দির দিল্লীর মতো বড় ও জমকালো নয়। কিন্তু সুন্দর পরিবেশে বেশ আনন্দদায়ক মনে হল। মন্দিরের দেবতার দর্শন করে আমরা পিছনের দিকে গিয়ে শহরটা দেখতে পেলুম। অনেক

দূরে দুটো লেকই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পাশাপাশি। শহরের সমস্ত ঘর বাড়িও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটি পাহাড়ী শহরের মতো। কিন্তু বিরূপাক্ষ আমাদের বেশিক্ষণ এখানে দাঁড়াতে দিলেন না। বললেন: চলুন তাড়াতাড়ি। স্টেশনে ফিরতে কত সময় লাগবে বোঝা যাচ্ছে না।

এবারে আমাদের পাহাড় থেকে নামার পালা। কোন্‌টি বিধান সভা, আর কোন্‌গুলি তার সদস্যদের আবাস, টাঙ্গাওয়ালা তা দেখিয়ে দিতে লাগল। তারপরে সেই ছোট লেকের উপরের ছোট পুল পেরিয়ে পুরনো শহরে আমাদের ফিরিয়ে আনল।

স্টেশনে আসবার পথে টাঙ্গাওয়ালা বলল: এখান থেকে আপনারা তো সাঁচী যাচ্ছেন! কিন্তু ভোপাল থেকে দেখবার মতো আর একটা ভাল জায়গা ছিল।

জিজ্ঞাসা করলুম: কী জায়গা বল তো!

টাঙ্গাওয়ালা বলল: ভোজপুর। এখান থেকে চব্বিশ মাইল দূরে ভোপাল-ওবেদুল্লাগঞ্জ রোডের উপরে।

তারপরে ভোজপুরে দ্রষ্টব্য বস্তুরও সংবাদ দিল। সেখানকার শিবের মন্দির নাকি এ মুলুকে বিখ্যাত। মন্দিরটি অসম্পূর্ণ, কিন্তু পরিকল্পনা অভূতপূর্ব। লাল বালিপাথরের এক একখানি বিরাট খণ্ড দিয়ে মন্দিরটি তৈরি হচ্ছিল। তার গায়ে অদ্ভুত কারুকার্য। সাত ফুটেরও বেশি উঁচু শিবলিঙ্গ, তার ব্যাসার্ধ সতের ফুটেরও বেশি। এই বিশাল শিবলিঙ্গ ধারণের উপযুক্ত করেই মন্দিরটি নির্মিত হচ্ছিল। তার আকার ও গাম্ভীর্য দেখে সকলকে স্তম্ভিত হতে হয়।

কিন্তু সময়ের অভাবে এ সব স্থানে যাবার কথা আমরা ভাবতেই পারি নে। কিন্তু মিনতি অন্য কথা বললেন: নিজের চোখে না দেখলে এই শহরের সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা থেকে যেত।

বিরূপাক্ষ বললেন: অনেক পাহাড়ী শহরে হ্রদের কথা শুনেছি—

কাশ্মীর নৈনিতাল আবু কোদাইকানাল, এমন কি উটিতেও নাকি লেক আছে। কিন্তু ভোপালেও যে এমন সুন্দর দুটো লেক আছে, তা জানতুম না।

মিনতি বললেন : ভোপাল সম্বন্ধে সত্যিই আমাদের ধারণা বদলে গেল।

ঘড়ির দিকে চেয়ে বিরূপাক্ষর মন প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। বললেন : না দেখে ধারণা করেছিলে বলেই বদলাল। দেখে করলে বদলাত না।

তাও অনেক সময় বদলায়।

বলে মিনতি আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললুম : আপনি কি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কথা বলছেন। দি ইয়ারো আন্‌ভিজিটেড, ভিজিটেড আর রিভিজিটেড। ইয়ারো নদী দেখবার পরে ও পুনর্বার দেখবার পরে প্রতিবারেই তাঁর ধারণা যে বদলেছে, তা কবিতাগুলি পড়লেই বোঝা যায়।

বিরূপাক্ষ বললেন : সর্বনেশে কথা।

বললুম : সর্বনেশে নয়। সত্যি কথা। বদলায় বলেই তা ধারণা বা মত। সত্যের একই রূপ, তার কোন পরিবর্তন নেই।

বিরূপাক্ষ বললেন : আপাতত জীবনের সব চেয়ে বড় সত্যের কথা মনে পড়েছে।

মিনতি হেসে বললেন : সে কি তোমার ক্ষিধের কথা ?

বিরূপাক্ষ বললেন : সাঁচীতে কী পাওয়া যাবে তা জানি নে তো, তাই ভাবছিলুম—

আমি অভিমন্যুর দিকে তাকালুম।

কিন্তু সে বীরের মতো বলে উঠল : আমার এখন ক্ষিদে পায় নি।

সে জানে যে ক্ষুধার কথা আগে বললেই সে সবার ছোট হয়ে যাবে, সবার সঙ্গে সমান ভাবে সোজা হয়ে আর দাঁড়াতে পারবে না। তাই এই প্রতিবাদ। বললুম : তুমি যে বীর অভিমন্যু, তুমি শত্রুঞ্জয়!

বিরূপাক্ষ বললেন: মৃত্যুঞ্জয় বলুন। এই নাম রাখবার সময় তার মায়ের বড় আপত্তি ছিল। কতকটা জোর করেই আমি এই নাম রেখেছি।

বললুম: সংস্কারে আমাদের আস্থা না রাখাই উচিত।

মিনতি বললেন: কুসংস্কারে বিশ্বাস নয়, ভয় আছে।

কুসংস্কারকে অগ্রাহ্য করেই ভয় ভাঙতে হয়।

আমাদের টাঙ্গা তখন ভোপাল স্টেশনে এসে ঢুকছে। ট্রেনের সময়ের আগেই ফিরে আসতে পেরেছি। সামনের সিট থেকে লাফিয়ে নামবার আগেই আমি টাঙ্গাওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে দিলুম। বিরূপাক্ষ আপত্তি করবার অবকাশ পেলেন না।

২৫

সাঁচীর পথে আমার হিউএন চাঙের কথা মনে পড়ল। সেই চীনা পরিব্রাজকের কথা। হাতে লাঠি ও পিঠে ঝোলা নিয়ে সেই নির্ভীক পুরুষ চীন থেকে ভারতে এসেছিলেন তিব্বতের উপর দিয়ে হিমালয় ডিঙিয়ে। ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত দেখেছেন, সমস্ত বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে সযত্নে শাস্ত্রাধ্যয়ন সম্পূর্ণ করেছেন, তারপর লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণ বৃত্তান্ত। ইতিহাসের ইতিহাস রচনা করতে হলে হিউএন চাঙের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

শুনে বিস্ময় জাগে, হিউএন চাঙ সাঁচীতে আসেন নি। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে সাঁচীর নাম নেই। বৌদ্ধদের তীর্থস্থান ছিল, অথচ তিনি আসেন নি, এ কথা সত্য হতে পারে না। ফা হিয়েনও এখানে আসেন নি। এমন কি কোন বৌদ্ধ শাস্ত্রে নাকি সাঁচীর নাম নেই। এর থেকে এই কথাই ধরে নেওয়া উচিত যে সাঁচী সে যুগে বৌদ্ধ তীর্থ ছিল না। বড় আশ্চর্য কথা। অশোক এই সব নির্মাণ করেছিলেন হিউএন চাঙ ও ফা হিয়েন এ দেশে আসবার কয়েক শো বছর আগে। এ সমস্ত কীর্তিই সেখানে বর্তমান ছিল, তবু কেন এরা উপেক্ষিত হল!

শুনেছি, অশোক বিদিশার এক বণিকের কন্যা দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। সেই রক্তাক্ত কলিঙ্গ যুদ্ধের পর যখন তিনি অস্ত্র ত্যাগ করে বুদ্ধের বাণীকে দেশে দেশে প্রচারের ব্যবস্থা করলেন, সেই যুগেই ভারতের নানা স্থানে নানা কীর্তি গড়ে উঠল। সাঁচীতে বুদ্ধের পদক্ষেপ হয়তো হয় নি। সাঁচীর স্তূপ বোধ হয় অশোক-পত্নী দেবীর সম্মানার্থে নির্মিত। তাঁদের পুত্রের নাম মহেন্দ্র। এই মহেন্দ্র সিংহলে গিয়েছিলেন ধর্ম প্রচারে। যাবার পথে এইখানে

কিছু সময় অতিবাহিত করে যান। সে সময় এখানে একটি বিহারও নির্মিত হয়েছিল। আজ তার ধ্বংসাবশেষ আছে।

এই গল্প সিংহলীদের ধর্মগ্রন্থে আছে। তারা বিশ্বাস করে যে কোন পূর্ণিমার রাত্রে সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়ে মহেন্দ্র সাঁচীর আকাশে উত্থিত হন, তারপর সুবর্ণ হংসীর মতো উড়ে গিয়ে সিংহলের মিহিণ্টেল পর্বত শীর্ষে অবতরণ করেন। শুধু রাজাকে নয়, সিংহলের অধিবাসীদেরও তিনি ধর্মান্তরিত করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মেনে নিতে হয়। অশোকের পূর্বে সাঁচীতে কিছু ছিল না। আজ যা কিছু আমরা দেখতে যাচ্ছি, তা অশোকের সময় বা তারও পরে নির্মিত হয়েছে। সত্য ঘটনা যখন আমাদের জানা নেই, তখন এমনই কিছু ধরে নিলে ইতিহাস রচনা করতে সুবিধা হয়।

আমাদের ট্রেন ভোপাল ছেড়েছিল সাড়ে দশটার কিছু আগে। আর সাঁচীতে পৌঁছল সাড়ে এগারটার পরেই। ছোট স্টেশন। কিন্তু ওয়েটিং রুম আর রিটায়ারিং রুম আছে। চায়ের দোকানও আছে। কিন্তু রিফ্রেশমেণ্ট রুম নেই।

বিরূপাক্ষ নিজের পরিচয় দিয়ে ওয়েটিং রুমে ঢুকলেন। ছোট ঘর হলেও ব্যবস্থা ভাল। বিরূপাক্ষ আরও খবর সংগ্রহ করে এনেছিলেন। এখানে যানবাহন কিছু নেই। পায়ে হেঁটেই পাহাড়ে উঠতে হবে। তবে পথের ধারে দু একটা দোকানে ভাত তরকারী খেতে পাওয়া যাবে। একজন লোকের নামও বলে দিয়েছেন। যত্ন করে তারা গরম গরম ভাত রুটি খাওয়াবে।

কাজেই ওয়েটিং রুমে আমরা স্নান সেরে জিনিসপত্র সেখানে রেখেই স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়লুম। একটি মাত্র পথ সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। বাঁ হাতে একটি বৌদ্ধ মঠ আছে। তাঁরা এখন পাহাড়ের উপরে নব নির্মিত একটি বিহারের রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। এই বিহারে কিছু দিন আগে সারিপুত্ত ও

মহামোগ্গলায়নের স্মৃতি রক্ষা করা হয়েছে।

মিনতি ও অভিমন্যুকে নিয়ে পাহাড়ে উঠতে হবে। এ একটা সমস্যার ব্যাপার। বিরূপাক্ষ তাই কোন একটা যানবাহনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। স্টেশনে খবর পাওয়া গিয়েছিল যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের একখানা মোটর গাড়ি আছে। তাতেই তাঁরা পাহাড়ে ওঠেন। যাত্রীরা চাইলে অনেক সময় রাজী হয়ে যান। কিন্তু মিনতি এতে রাজী হলেন না। বললেন: সবাই যদি পায়ে হেঁটেই উঠতে পারে তো আমরাও উঠব।

অভিমন্যু বলে উঠল: আমি সকলের আগে উঠব।

কাজেই আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলুম। খানিকটা পথ অতিক্রম করেই একটা চৌমাথা পাওয়া গেল। তারই কাছাকাছি সব দোকান পাট ও হোটেল। ভোপাল থেকে মোটরের পথ ভিল্‌সায় গেছে। আমাদের পথ এই পথ পেরিয়ে সাঁচীর পাহাড়ে উঠবে। বিরূপাক্ষর কথা মতো আমরা এইখানেই খেয়ে নিলুম। তাঁর মতে, খালি পেটে হাঁটতে কষ্ট হয়, কিন্তু ভরা পেটে ধীরে হাঁটলেই চলে।

আজকের দিনটি আমাদের কাছে বড় আশ্চর্যের বোধ হচ্ছিল। আকাশে মেঘ করেছিল কখন, তা খেয়াল করি নি। উত্তাপ নেই কেন বোঝবার চেষ্টা করেই দেখতে পেলুম যে বৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এখনই সে ভয় না থাকলেও পরে বৃষ্টি নামতে পারে।

খেয়ে দেয়ে আমরা একটুখানি এগোতেই দেখতে পেলুম যে পথের বাঁ ধারে একটি অফিস আছে। সেখানে টিকিট কেটে সাঁচীর পাহাড়ে উঠতে হয়। এই পাহাড়টি আমরা ট্রেন থেকেও দেখতে পেয়েছিলুম। স্তূপও দেখেছিলুম। কিন্তু পাহাড়ের উচ্চতা অনুমান করতে পারি নি।

টিকিট কেটে জানলুম যে এই টিকিট ঘরের পিছনেই সাঁচীর জাদুঘর। তা দেখবার জন্যে অতিরিক্ত পয়সা লাগে না। তাই

আমরা এক নজরে এই জাদুঘরটিও দেখে এলুম। সময় ব্যয় করার মতো বিশেষ কোন দ্রষ্টব্য এখানে নেই।

আরও একটি খবর এখানে পেলুম। টুরিস্টদের জন্যে একটি বাংলো বোধহয় আছে। সেখানে থাকলে খাবার ব্যবস্থাও হয়। কিন্তু আমাদের আর এ সবের কোন দরকার ছিল না। দরকার হল একটি সিদ্ধান্ত নেবার। মোটরের পথ একটু ঘুরে উপরে উঠেছে। আর এক জায়গায় আমরা পাথরের অনেকগুলো ধাপ দেখেই বুঝতে পারলুম যে সেই ধাপ বেয়ে উপরে উঠলে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারব।

বিরূপাক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন : কী করা যায় বল তো?

মিনতি আমার দিকে তাকালেন।

কিন্তু আমি দেখলুম যে অভিমন্যুই সব সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে। মনের আনন্দে সে অনেকগুলো ধাপ উঠে গিয়ে আমাদের ডাকছে উপর থেকে। কাজেই আর কোন দ্বিধার কারণ রইল না। আমরাও তাকে অনুসরণ করে উপরে উঠতে লাগলুম।

যতটা কষ্টকর ভেবেছিলুম, ততটা নয়। অল্প আয়াসেই উপরে পৌঁছে গেলুম। মোটরের পথও এসে এইখানে পৌঁছেছে। আর একজন রক্ষী দাঁড়িয়ে আছে গেটের সামনে। আমাদের টিকিট দেখে সে ভিতরে যাবার অনুমতি দিল।

বাঁ হাতে সেই নূতন বিহারের দিকে না এগিয়ে আমরা পুরনো স্তূপের দিকে এগিয়ে গেলুম। পাহাড়ের মাথায় এ জায়গাটা বেশ সমতল। খোলা আকাশের নিচে সেই বিরাট স্তূপটি জলে ঝড়ে খানিকটা নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে। তার সামনের কারুকার্যময় গেটও আমরা দেখতে পাচ্ছি।

এই স্তূপের দিকে খানিকটা এগিয়েই অভিমন্যু প্রশ্ন করল : ওটা কী মা?

মিনতি বললেন : ওটা স্তূপ।

স্তূপ মানে কী?

মিনতি বিরূপাক্ষের দিকে ফিরে তাকালেন।

বিরূপাক্ষ সংক্ষেপে বললেন: ঢিপি।

এত সংক্ষিপ্ত উত্তরে অভিমন্যুর কৌতূহল নিবৃত্তি হল না। বলল: আমরা কি ওই ঢিপি দেখতে এসেছি!

সহাস্যে মিনতি বললেন: সামলাও এবারে।

বিরূপাক্ষ তখনি বললেন: তোমার মা জানে।

মিনতি আমাকে বললেন: দেখেছেন কাণ্ড!

কাণ্ড আবার কী! তোমরা মায়ে-মামায় সামলাও।

অভিমন্যুর হাত ধরে বললুম: আমি তোমায় বুঝিয়ে দেব।

বিরূপাক্ষ বললেন: একটু জোরে জোরে বোঝাবেন।

হেসে বললুম: আচ্ছা।

তারপরে অভিমন্যুকে জিজ্ঞাসা করলুম: তাজমহল দেখেছ?

আগ্রার তাজমহল?

হ্যাঁ।

দেখেছি বইকি!

আমি জানতুম, তুমি দেখেছ। কী দেখেছ বল তো?

মা কিছুতেই জলে নামতে দেয় নি।

বিরূপাক্ষ বললেন: মা ভারি দুষ্টু।

আমি বললুম: তাজমহলের ভেতরে ঢুকে কিছু দেখেছ?

মিনতি উত্তর দিলেন: সে তো কবর!

মুসলমানের কবর, খ্রীষ্টানদেরও হয় কবর। কিন্তু হিন্দুর মৃতদেহ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। শুধু রাজা মহারাজাদের ছাইএর ওপর স্মৃতি স্তম্ভ নির্মিত হয়। মহাত্মাজীরও হয়েছে গান্ধীঘাটে, রাজঘাটে, নানা জায়গায় ছাইএর ওপরে স্মৃতি মন্দির।

মিনতি বললেন: এই স্তূপগুলিও বুঝি তাই?

ঠিক তাই। বুদ্ধের ও বড় বড় বৌদ্ধ শ্রমণদের অস্থির ওপরে

এই রকম স্তূপ তৈরি হয়েছে। চলতি কথায় এদের বলে তুমিলি। চন্দন কাঠের চিতায় মৃতদেহ পুড়িয়ে অস্থি নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিভিন্ন তীর্থে। তার ওপরে ছোট বড় নানা আকারের স্তূপ। আর শুধু ভস্ম ও অস্থির উপরে নয়, দাঁতের উপরেও ব্রহ্মদেশে এই রকম মন্দির হয়েছে। স্তূপের নাম প্যাগোডা, সিংহলে নাম ড্যাগোবা। সিংহলের ক্যাণ্ডি শহরে দন্তমন্দির খুব বিখ্যাত।

বিরূপাক্ষ অকপটে বললেন : একটা নতুন কথা শিখলুম।

কিন্তু আমি লজ্জা পেলুম তাঁর কথা শুনে।

আমরা বড় স্তূপের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলুম। এইটিই সব চেয়ে বিরাট ব্যাপার। না দেখলে এর আকার ধারণা করা যায় না। বইএ এর আকারের হিসেব দেখেছি—বিয়াল্লিশ ফুট উঁচু, কিন্তু ব্যাস একশো ছ ফুট। একটা বিরাট বলের আধখানা যেন উপুড় করে রাখা হয়েছে। উপরটা একেবারে অক্ষত নয়। মনে হবে কেউ ছুরি দিয়ে চেঁচে সমান করে দিয়েছে। তার উপর রেলিঙ দিয়ে ঘেরা একটা ছাতা।

অভিমন্যু সেই দিকে তাকিয়ে বলল : ওটা কী?

বললুম : ছাতা।

ওইটুকু!

সত্যিই সেটা দেখতে ওইটুকু। কিন্তু একটি নয়, পর পর তিনটি, একটির পর আর একটি।

অভিমন্যু বলল : চারি দিকেই যে রোদ লাগছে।

এ ছাতা যে রৌদ্রের জন্য নয়, তা বলতে হল। এ ধর্মের ছাতা, রাজছত্রের মতো। ধর্ম যে সকলের উপরে, এই ছাতা সেই কথা প্রচার করছে।

স্তূপের চার দিক রেলিঙে ঘেরা। আর চার দিকে চারটি তোরণ। পার্সি ব্রাউন সাহেব তাঁর ইণ্ডিয়ান আর্কিটেকচার বইএ এই তোরণের একটু ইতিহাস লিখে গেছেন। বৌদ্ধ যুগের বেড়া ও তোরণ কোথা

থেকে এল, তিনি তার খোঁজ করেছিলেন। দেখতে পেয়েছিলেন যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে বনের ভিতর অবস্থিত গ্রামগুলি বেড়া দিয়ে ঘেরা হত। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, বুনো জানোয়ারের হাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা। কিসের বেড়া হত, সে খোঁজও তিনি পেয়েছিলেন। বেড়া হত বাঁশের। অল্প দূরে দূরে বাঁশের খুঁটি পুঁতে মাটির সমান্তরাল বাঁশ বাঁধা হত তিন সারি। দরজাও থাকত, সে খানিকটা সামনে এসে। ক্রমে ক্রমে এই বেড়া সুরক্ষার প্রতীক হয়ে দাঁড়াল। শুধু গ্রাম নয়, ক্ষেতের চারি দিকেও বেড়া দেওয়া হল। শেষ পর্যন্ত বিশেষ জায়গা বা পবিত্র জিনিসের চার দিকেই এই বেড়া দেবার প্রচলন হল। ব্রাউন সাহেব নিশ্চিন্ত হয়েছেন যে বৌদ্ধদের তোরণ এসেছে এই বাঁশের প্রাচীন তোরণ থেকে। আর ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে এই তোরণও পূর্ব দেশে গেছে। জাপানের তোরাই আর চীনের পিউ-লু ভারতীয় তোরণেরই সগোত্র।

আমরা পশ্চিম দরজার কাছাকাছি এসেছিলুম। বিরূপাক্ষ বললেন : এ রকম তোরণ আমরা আর কোথাও দেখি নি।

সত্যিই তাই। দুটি স্তম্ভের উপরে তিনটি সমান্তরাল ফলক সেই বাঁশের বেড়ারই নকশা। কিন্তু বাঁশের তৈরি নয়, তৈরি পাথরের। আর চাঁচাছোলা পাথরও নয়, কারুকর্মে কণ্টকিত স্থাপত্য শিল্পের অপরূপ নমুনা। ভারতের নানা স্থানে নানা বৌদ্ধ নিদর্শন দেখেছি। কিন্তু এত সূক্ষ্ম শিল্প কর্ম আর কোথাও দেখি নি। এই তোরণের উপর জাতকের কাহিনী উৎকীর্ণ করা হয়েছে। অশোকের জীবনের কাহিনীও আছে। আর তার পিছনে আছে পঞ্চম শতাব্দীতে তৈরি বিরাট বুদ্ধ মূর্তি। প্রথম যুগে প্রতীক দিয়ে বুদ্ধকে আঁকা হত। পদ্ম তাঁর জন্মের প্রতীক, অশ্বত্থ বৃক্ষ তাঁর বুদ্ধ হবার প্রতীক, চক্র তাঁর প্রথম বাণীর প্রতীক, আর স্তূপ তাঁর মৃত্যুর প্রতীক। অনেক জায়গায় একটি সিংহাসন ও এক জোড়া পা দেখেছি। তা দেখে বুঝতে হবে যে বুদ্ধ সেখানে এসেছিলেন।

তোরণের কাছে এসে আমরা ভাল করে দেখতে লাগলুম। সম্মুখের প্রথম সারিতে বুদ্ধের সাতটি জন্মের চিত্র ক্ষোদিত—চারটি গাছের প্রতীক দিয়ে, আর তিনটি স্তূপের সাহায্যে। মাঝখানের সারিতে সারনাথে বুদ্ধের প্রথম বাণী প্রচারের চিত্র। নিচের সারিতে বোধিসত্ত্বের সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী। গৌতম বুদ্ধ হবার আগে বোধিসত্ত্ব ছিলেন। বোধি মানে জ্ঞান, আর সত্ত্ব মানে প্রকৃতি। জ্ঞান যাঁর লক্ষ্য ও প্রকৃতি, তিনিই বোধিসত্ত্ব। জন্ম জন্ম বোধিসত্ত্ব হবার পর গৌতম তাঁর শেষ জন্মে বুদ্ধ হয়েছিলেন। এখানে সেই বোধিসত্ত্বের গল্প। মহাযান বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন যে গৌতম ছাড়া আরও অনেক বোধিসত্ত্ব ছিলেন এবং শেষ বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়র জন্ম হতে এখনও বিলম্ব আছে।

শুধু সম্মুখে নয়, তোরণের পিছনেও অজস্র চিত্র ক্ষোদিত। তপস্যারত বুদ্ধের নানা প্রলোভন। মারাসুর বুদ্ধকে টেনে নাকি তপোভ্রষ্ট করতে চাইছে, কিন্তু সানুচর অসুরকে বুদ্ধ পরাজিত করলেন। মাঝখানে বুদ্ধগয়ার মন্দির, সেই বটবৃক্ষ ও সিংহাসন। তার এক দিকে অসুর সৈন্য পলায়মান, অন্য দিকে দেবদূতেরা বুদ্ধের জয়লাভে আনন্দমত্ত।

ধীরে ধীরে আমরা দক্ষিণের দিকে ঘুরে গেলুম। সেদিকেও একটি সুন্দর তোরণ। তার উপরের সারিতে একটি ঘরোয়া দৃশ্য। গৌতমের মা মায়া একটি পদ্মের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। দক্ষিণে বামে দুটি হাতী তাঁর মাথায় জল সিঞ্চন করছে। এই মূর্তি আমাদের দেবী মূর্তির সঙ্গে তুলনীয়। নিচের সারিতে কিচক নামে পরিচিত কতকগুলি বামন মূর্তি। পিছনে জাতকের কাহিনী চিত্রিত।

এই তোরণের কাছেই একটি অশোক স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ। একদা এটি বিয়াল্লিশ ফুট উঁচু ছিল। আর শিলালিপি ক্ষোদিত ছিল ব্রাহ্মী অক্ষরে। অদ্ভুত সুন্দর এক পাথরের ঝকঝকে স্তম্ভ। অশোক এই রকমের স্তম্ভ সারা ভারতে গোটা তিরিশেক নির্মাণ করেছিলেন।

বুদ্ধ যেখানে গিয়েছিলেন বা সেই যাত্রা পথের নিশানা স্বরূপ এই-গুলি নির্মিত হয়েছিল। আজ এমনি একটি স্তম্ভের মূর্তি স্বাধীন ভারতের রাজচিহ্ন রূপে গৃহীত হয়েছে।

উত্তরের তোরণটি মনে হল সব চেয়ে ভাল ভাবে রক্ষিত হয়েছে। এমন মনোহর কারুকার্যও কম দেখা যায়। এ এক দিনের কাজ নয়। অনেক শিল্পী অনেক দিন ধরে প্রাণের আবেগ মিলিয়ে এই পাথরে প্রাণের সঞ্চার করেছে। এই সব কীর্তির পিছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না, ছিল ধর্মের মহিমা প্রচারের প্রেরণা। এই মনোভাব নিয়েই সে যুগের শিল্পীরা খেটেছে। শুধু পেটের দায়ে খাটলে মিশরের পিরামিডের মতো বিস্ময়কর হত আকারে, শিল্প চেতনায় সুন্দর হত না স্বপ্নের মতো।

পূর্বের তোরণেও আমরা দুটি সুন্দর চিত্র দেখলুম। একটি গৌতমের গৃহ ত্যাগের দৃশ্য, আর দ্বিতীয়টি মায়ার স্বপ্ন—সেই চাঁদ হাতীর গল্প। স্তম্ভের গায়ে একটি অলৌকিক কাহিনী আছে—জলের উপর দিয়ে বুদ্ধ হেঁটে যাচ্ছেন!

ছোট ছোট স্তূপ সাঁচীতে অনেক আছে। তিন নম্বর স্তূপ তাদের মধ্যে প্রধান। আকারে নিতান্ত ছোট নয়। সাতাশ ফুট উঁচু, কিন্তু ব্যাস হবে পঞ্চাশ ফুট। বড় স্তূপ থেকে দূরত্ব এক শো হাতের বেশি হবে না। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি এই স্তূপটি ভেঙে পড়েছিল। জেনারেল কানিংহাম তার ভিতর থেকে দুটি পাথরের বাক্স খুঁজে পান। এরই ভিতর বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদ্বয় সারিপুত্ত ও মহামোগ্‌গলায়নের অস্থি ছিল। তখনই তা বিলাতের জাদুঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় স্তূপটির সংস্কার সাধন করা হয়েছিল, আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেই অস্থি প্রাচ্যের বৌদ্ধ দেশগুলিতে ঘোরানো হয়েছিল। তারপর সাঁচীতে একটি নূতন বিহার নির্মাণ করে ১৯৫২ সনে তা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আড়ম্বরের কথা খবরের কাগজে পড়েছিলুম। ভারতের প্রধান

মন্ত্রীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী, সিংহলের মন্ত্রী ও নেপাল কম্বোডিয়া থাইল্যাণ্ড জাপান প্রভৃতি নানা দেশের প্রতিনিধি। মৃত সাঁচী এখন একটি জীবন্ত বৌদ্ধ তীর্থে পরিণত হয়েছে।

বড় স্তূপের দক্ষিণ দরজার সামনে আঠারো নম্বরের মন্দির একটি চৈত্য। চৈত্য মানে প্রার্থনার মন্দির। ইতিহাসের প্রথম যুগে একেবারে খোলা আকাশের নিচে মানুষ দেবতার আরাধনা করত। তারপর পাহাড়ের গায়ে যখন গুহা-মন্দির নির্মিত হল, তখন একটি ঘর প্রার্থনার জন্য নির্দিষ্ট হল। অজন্তা ও ইলোরার গুহায় আমরা সুন্দর চৈত্য দেখেছি। এই চৈত্য নির্মাণের একটা বিশেষ পন্থা লক্ষণীয়। তার ছাদ সমতল হবে না, হবে খিলানের মতো অর্ধবৃত্তাকৃতি, ঘরের ভিতর দু সারি থাম থাকবে এক মাথা থেকে আর এক মাথা পর্যন্ত। সকলের পিছনে একটি স্তূপ। পাথর দিয়ে বিহার ও চৈত্য নির্মাণ বোধ হয় গুহা-মন্দিরের পরবর্তী যুগে হয়েছে। সাঁচীর চৈত্যে কিছু প্রতীচ্যের ছাপ আছে, এথেন্সের প্রাচীন গির্জার মতো। যিশু খ্রীষ্ট বুদ্ধের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, প্রায় সাড়ে চারশো বছর পরে জন্মেছিলেন। কাজেই আমাদের বলা উচিত যে এথেন্সের প্রাচীন গির্জায় সাঁচীর চৈত্যের ছাপ আছে। এই মন্তব্যই বেশি সঙ্গত হবে।

সতের নম্বর মন্দির ঠিক এই রকমই, তার নাম গুপ্ত মন্দির।

উপর থেকে আরও খানিকটা নেমে এসে দু নম্বর স্তূপ। তিন নম্বর স্তূপের চেয়েও ছোট, কিন্তু কারুকার্যে নূতনত্ব আছে। অনেক দেবীর মূর্তি, প্রকৃত ও পৌরাণিক জীব জন্তু, পাখাযুক্ত সিংহ, মৎস্য ও অশ্বমুখ মানুষ, অশ্বারোহী পুরুষ।

মিনতির বোধ হয় চলতে কষ্ট হচ্ছিল, একই রকমের জিনিস দেখে দেখে ক্লান্তিও বোধ হচ্ছিল খানিকটা। বললেন: এইবারে ফেরা যাক।

বিরূপাক্ষ আমার দিকে চেয়ে বললেন: দেখবার আর কিছু রইল কি?

চল্লিশ আর পঁয়তাল্লিশ নম্বরের মন্দির আমরা দেখেছি। অশোকের মহিষী দেবীর প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ নারীদের মঠও দেখেছি। নূতন বিহারের বাহির ও ভিতর দেখেও মুগ্ধ হয়েছি। তাতেই সাহস করে বললুম: চারি দিকে চেয়ে আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

কিন্তু দ্রষ্টব্য আরও আছে। সোনারি সাতধারা পিপালিয়া আর আন্ধের।

বললুম: এ সব নাম আমার জানা নেই।

আমারই কি জানা ছিল! বই পড়ে শিখেছি।

আমাদের সামনে পিছনে আরও অনেক যাত্রী ফিরছিলেন। তাঁদেরই একজন বললেন: ও সব জায়গা দেখার অসুবিধাও আছে।

বিরূপাক্ষ বললেন: তাই নাকি?

কোন জায়গাই খুব কাছে নয়। ছ সাত মাইল দূরে দূরে। কয়েকটা করে স্তূপ আছে।

আর একজন বললেন: সোনারিতে আটটি, সাতধারায় ছুটি।

পিপালিয়া আর আন্ধেরে?

প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ।

বইএ বুঝি এর বেশি আর কিছু লেখা নেই?

না।

অনেকেই হেসে উঠলেন।

২৬

বিদিশার প্রসঙ্গ উঠল সাঁচী ত্যাগের প্রাক্কালে। আজ আর বিদিশার নাম নেই, আজ সেই স্থান ভিল্‌সা নামে পরিচিত। বেত্রবতীর নাম হয়েছে বেতোয়া। বিদিশা বেত্রবতীর নামে যে কবিতার ধ্বনি ছিল, আজকের ভিল্‌সা ও বেতোয়া নামে সে ধ্বনি মুছে গেছে। কবিতার চেয়ে খবরের দাম আজকাল বেশি। কালিদাসের কবিতা তাই একটা খবর হয়ে বেঁচে আছে।

মহাবংশে লেখা আছে যে সম্রাট অশোক এখানে এসেছিলেন। নিকটে কোথাও ছিল বেসনগর, কিন্তু এখন তা শ্রীহীন অনাদৃত। বিদিশার সমৃদ্ধি ধীরে ধীরে জেগে উঠল। এ এক নিভৃত পার্বত্য প্রদেশ। একটি দুর্গ ও অনেকগুলি বৌদ্ধ কীর্তি নিয়ে অনেক দিন বেঁচে ছিল। শত্রুর ধ্বংসের হাত বিদিশার উপর পড়ে নি। যা গেছে, তা কালধর্মে গেছে, যা আছে তাই দেখবার জন্য যাত্রীর আজও শেষ নেই। বৌদ্ধ কীর্তির পরিসীমা এখন সতের মাইল। দ্রষ্টব্য বস্তুর সংখ্যা হবে পঁয়ষট্টি। সাঁচী পাঁচ মাইল দূরে, সেখানে দশটি স্তূপ। ছ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সোনারি, সেখানে আটটি স্তূপ। পশ্চিমে সাড়ে ছ মাইল দূরে সাতধারা, সেখানে দুটি। সাত মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ভোজপুর বা পিপালিয়া এবং আরও চার মাইল দূরে আন্ধের। সেখানে সর্বসমেত আটত্রিশটি স্তূপ। এ সমস্তই অশোকের আমলে তৃতীয় পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত বলে লোকের বিশ্বাস। শুধু সাঁচীর স্তূপ আরও প্রাচীন, বোধ হয় আরও দুই শতাব্দীর পুরনো।

বিদিশার নাম কেন ভিল্‌সা হল, তার একটি সূত্র পাওয়া যায়। একটা শিলালিপিতে নাম পাওয়া গিয়েছিল ভৈলাস বা ঐ ধরনের

কিছু। ভিল্‌সা বোধ হয় এরই সংক্ষিপ্ত রূপ। এই স্টেশনে নেমে লোকে আজকাল উদয়গিরির গুহা আর খাম্বা বাবা দেখে।

উদয়গিরির গুহা স্টেশন থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে উদয়গিরি পাহাড়ের কোলে। পাকা রাস্তার উপর দিয়ে মোটর ও টাঙ্গা চলে সারাক্ষণ। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর কুড়িটি গুহা আছে। তার মধ্যে আঠারটি হিন্দু ও তুটি জৈন গুহা। শিলালিপিতে গুপ্ত যুগের অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য গুহার মতো এই গুহাগুলিরও নম্বর আছে। এক নম্বর ও কুড়ি নম্বর গুহা হল জৈনদের, বাকিগুলি হিন্দুদের। পাঁচ নম্বর গুহাটিই সব চেয়ে বিশিষ্ট। তার একটি ছবি দেখেছিলুম, তা পরিষ্কার মনে আছে। দেওয়ালের গায়ে বিরাট বরাহ মূর্তি, মানুষের দেহ ও মুখ বরাহের। বরাহরূপী বিষ্ণু সমুদ্র থেকে উত্থিত হচ্ছেন। পিছনে তরঙ্গায়িত রেখা দিয়ে সমুদ্রের বিস্তার দেখানো হয়েছে। বরাহের দক্ষিণ দন্তে শীর্ণ দেহ পৃথিবী, এবং বাম পদের নিচে তুরন্ত নাগরাজ। সারিবদ্ধ দেবাসুর তু ধার থেকে বরাহকে দেখছেন। এ বরাহ অবতারের এক গল্প। পৃথিবীকে চুরি করে দৈত্য সমুদ্রের নিচে লুকিয়ে রেখেছে। বিষ্ণু বরাহ রূপ নিয়ে দৈত্যকে সংহার করে পৃথিবীকে উদ্ধার করলেন। অপূর্ব পরিকল্পনা! বরাহ অবতারের এমন বিরাট ও সুন্দর মূর্তি ভারতের আর কোথাও নেই।

তারপর খাম্বা বাবা—ইংরেজী নাম হেলিওডোরস পিলার। স্টেশন থেকে মাইল তুয়েক দূরে বেতোয়া ও বেস নদীর সঙ্গম। স্থানের নাম বেসনগর। হেলিওডোরস নামে এক গ্রীক ভদ্রলোক এখানে এই স্তম্ভটি প্রতিষ্ঠা করেন। হেলিওডোরস তক্ষশীলার গ্রীক রাজা অ্যান্টিয়ালকিডাসের রাজদূত ছিলেন বিদিশার রাজা ভগভদ্রের রাজসভায়। স্তম্ভগাত্রের ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ লিপি পড়ে জানা যায় যে হেলিওডোরস হিন্দু হয়েছিলেন, আর স্তম্ভটি নির্মাণ করেন বাসুদেবের নামে নব্বই কিংবা একশো পঞ্চাশ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দে। এই

শিলালিপির একটা বিশেষ মূল্য আছে। প্রাচীন যুগে হিন্দু ধর্মে যে সংকীর্ণতা ছিল না, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। হিন্দুরা তখন ভিন্ন ধর্মের মানুষকে গ্রহণ করেছেন সাদরে। সে দ্বার আজ রুদ্ধ হয়ে গেছে। নিজেদের মধ্যেই অস্পৃশ্য সৃষ্টি করে সংকীর্ণতাকে আমরা প্রশ্রয় দিচ্ছি।

মিনতি প্রশ্ন করলেন: বিদিশা কি আমরা দেখব না?

এ কথার উত্তর না দিয়ে বিরূপাক্ষ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: বিদিশায় কি কিছু দেখবার আছে?

বোধহয় না।

না!

মিনতি যেন চমকে উঠলেন।

বললুম: বিদিশার নাম তো মানচিত্র থেকে মুছে গেছে!

বিরূপাক্ষ বললেন: আমার গাইড বইএ এ নাম নেই। ভিল্‌সার সম্বন্ধেও কিছু লেখে নি।

ভিল্‌সা নাকি এখন একটি জেলা শহর। পুরাতত্ত্বের চেয়ে পুরাকালের প্রয়োজনেই তার আদর বেশি। তবু আমার মেঘদূতের কথা মনে পড়ল। মেঘদূতে বিদিশার অপূর্ব বর্ণনা আছে।

সাঁচী থেকে আমরা সোজা ঝাঁসি যাব, ভিল্‌সায় নামব না। হাতে যথেষ্ট সময় ও পকেটে অঢেল পয়সা থাকলে আমারও অনির্দিষ্ট কাল ঘুরে বেড়াতে আপত্তির কারণ থাকত না। আমি জানি, কলকাতায় ফিরে অফিসে আমাকে অনুপস্থিতির জন্যে কৈফিয়ত দিতে হবে। কর্তৃপক্ষ অনেকবার আমাকে সতর্ক করেছেন, এবারে তাড়িয়ে না দিলে শেষ বারের মতো সতর্ক হতে বলবেন। এ সবের জন্য আমার আপসোস নেই। জীবনের জমার খাতায় মোটা জমা পড়েছে। সে সম্পদ ধরে রাখতে না পারলেও স্মৃতিটুকু অক্ষয় হয়ে থাকবে।

ওয়েটিং রুমে আমরা গাড়ির অপেক্ষা করছিলুম। মিনতি

চুপিচুপি কখন পাশে এসে বসেছিলেন জানতে পারি নি। হঠাৎ বললেন: স্বাতির সঙ্গে আমার ভাব করতে ইচ্ছে হয়েছিল।

আমি চমকে উঠেছিলুম। তাই দেখে মিনতি বললেন: ভয় পেলেন নাকি! আমি তো পুরুষ মানুষ নই!

হেসে বললুম: আপনি পুরুষ মানুষ হলেও ভয় পেতুম না। স্বাতি আমল দিত না। আমি আপনাকে এত কাছে দেখে চমকেছি।

তা হলে কি আমাকে আপনি ভয় পান?

তাও না।

তবে?

গেল গেল!

বলে আমি চেঁচিয়ে উঠতেই মিনতি চমকে উঠে বললেন: কী গেল?

হেসে বললুম: আপনিও চমকে উঠলেন তো! ভয় না পেলেও মানুষ চমকায়।

উত্তরে মিনতিও হাসলেন। তারপরে বললেন: দুর্ভাবনায় আপনি যে কাতর হয়ে পড়েছেন, তাতে আমার সন্দেহ নেই।

গম্ভীর ভাবে বললুম: খাঁটি কথা।

খুশী হয়ে মিনতি বললেন: দেখেছেন তো, ঠিক ধরে ফেলেছি।

আপনার বাহাদুরী আছে।

এর পরে মিনতি সরাসরি প্রশ্ন করলেন: এবারে আপনার দুর্ভাবনার কথা বলুন, দেখি কোন সাহায্য করতে পারি কিনা।

কী সাহায্য করবেন?

অন্য কিছু না পারি, পরামর্শ দিতে পারব তো!

আরও গম্ভীর হয়ে বললুম: পরামর্শে নিস্তার পাব না।

মিনতি এবারে জোর করলেন: বলুন না শুনি।

আমি আর দেরী না করে বললুম: এত দিন পালিয়ে আছি

যে চাকরিটা আর বাঁচানো যাবে না।

চোখের উপর হাত রেখে বিরূপাক্ষ ঝিমচ্ছিলেন, হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠলেন। মিনতি অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে উঠে গেলেন। আমিও যেন লজ্জা পেলুম মিনতির লজ্জা দেখে। মিথ্যা বলে আমি তাঁকে ঠকিয়েছি। নিজের দুর্বলতা গোপনের জন্যই আমাকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে।

সত্যিই আমি স্বাতির কথা ভাবছিলুম, ভাবছিলুম তার আচরণের কথা। তাকে আমি চিনেও যেন চিনি নি, জেনেও জানি নি তাকে। সবই বড় দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে। হবারই কথা। যে কোন মানুষের হবে।

গোয়া থেকে যখন আমরা বম্বে ফিরে এলুম, জো রায় স্টেশনে এসেছিলেন আমাদের অভ্যর্থনা করতে। মামা মামী প্রথম শ্রেণী থেকে নামলেন, আর আমরা নামলুম অন্য শ্রেণী থেকে। স্বাতি আমার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে রইল যে মামীর চোখে তা অশোভন মনে হল। তিনি মাঝখানে আসবার আগেই আমি তফাতে সরে গেলুম।

জো রায় হেঁট হয়ে মামা মামীর পায়ের ধুলো নিলেন। কথা মামীই প্রথমে কইলেন : পুনা যাওয়া হঠাৎ স্থির হল, তাই তোমাকে জানাতে পারলাম না।

জো রায় যে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, তা তাঁর উত্তরেই ধরা পড়ল। বললেন : তাতে কী হয়েছে!

মামী বললেন : কী হয়েছে মানে, তোমাকে বললে তুমিও হয়তো সঙ্গে যেতে পারতে!

তা পারতুম। আপনাদের জন্যে আমি দু দিন ছুটি নিয়েছিলুম।

তাই নাকি! দেখলে তো!

বলে মামী তাঁর অভিযোগ জানালেন মামাকে।

মামা কিছুই বললেন না।

জো রায় বললেন : আসুন।

পা বাড়াবার আগে স্বাতি আমার দিকে তাকিয়েছিল। তার দৃষ্টিতে আমি কি দেখেছিলুম মনে পড়ছে না। তখন আমি নিজের মনের রঙে স্বাতিকে রাঙা দেখছিলুম। ভেবেছিলুম, জো রায়ের কথায় সে কৌতুক বোধ করছে। তখন আমার এতটুকু সন্দেহ হয় নি যে স্বাতি অন্য কিছু ভাবতে পারে, কিংবা অন্য কিছু ভাবা তার পক্ষে সম্ভব। এখন আমি অনেক চেষ্টা করেও তার দৃষ্টিটা মনে করতে পারছি না। মনে পড়ছে না, সে হেসেছিল না লজ্জিত হয়েছিল। দুইই তো সম্ভব! তবে কেন আমি মনে করেছিলুম যে স্বাতি কৌতুক বোধ করছে!

বিরূপাক্ষের ঝাঁকানিতে আমার তন্দ্রা হঠাৎ ছুটে গেল। ভদ্রলোক পাশে দাঁড়িয়ে বলছিলেন : ঘুমলেন নাকি মশাই, ঝাঁসির গাড়ি যে এসে গেল!

তাই তো, বাহিরের প্ল্যাটফর্মে যে কোলাহল শুরু হয়ে গেছে! সাঁচীতে ট্রেন বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না।

রাতের ট্রেন। সকাল দশটার পরে ঝাঁসি পৌছবে। মিনতির জায়গা পেতে অসুবিধা হল না, অভিমন্যুকে নিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন। বিরূপাক্ষ সিগারেট ধরালেন, আর আমি এক ভদ্রলোকের পাশে বসে ঢুলতে লাগলুম। বিনায় এ গাড়ি থেকে অনেক যাত্রী নেমে গেলে নাকি তখন শুয়েই ঘুমনো যাবে। হঠাৎ আমার পাশের ভদ্রলোক বললেন: আপনারা এ গাড়িতে কেন উঠলেন?

বললুম: উপায় ছিল না।

আপনারা তো টুরিস্ট দেখছি!

আজ্ঞে।

সাঁচীর বদলে ভিল্‌সায় এলে যে কোন ট্রেন ধরতে পারতেন। ভিল্‌সায় সব ট্রেন দাঁড়ায়।

ঠেকে ঠেকে শিখছি।

খানিকক্ষণ পরে ভদ্রলোক বললেন: আপনারা কি কলকাতা থেকে আসছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি?

শিবপুরী থেকে।

সে আবার কোথায়?

শিবপুরী জানেন না!

ভদ্রলোক ভারী আশ্চর্য হলেন। তাঁর বিস্ময় দেখে মনে হল যে সে স্থান সাঁচী বা ঝাঁসির চেয়েও বিখ্যাত। তবু আমি নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করে বললুম: জানি নে।

রাত এমন কিছু বেশি হয় নি। বিনা অবশ্য পৌছবে আড়াইটের

পর। ভদ্রলোক ঘড়িতে একবার সময় দেখে বললেন: গোয়ালিয়র রাজ্যের গ্রীষ্মাবাস।

শৈলাবাস?

আপনাদের দার্জিলিঙের মতো শৈলাবাস নয়, নিচু মালভূমির ওপর গ্রীষ্মাবাস। সমুদ্রতল থেকে চৌদ্দশো ফুট উঁচু। বিহারের হাজারিবাগ রাঁচীর মতো হতে পারে।

ভদ্রলোক আগ্রহ করে আমাকে শিবপুরীর গল্প শোনালেন। বম্বে থেকে আগ্রা যাবার বড় সড়কের উপর শিবপুরী, গোয়ালিয়র থেকে তিয়াত্তর মাইল দূরে। অরণ্যময় পরিবেশ, কয়েকটি হ্রদও আছে দূরে দূরে। দু ধারে সবুজ পাহাড়, মাঝখানে রাজপথ। পলাশে পলাশে পাগল হয়ে বসন্তের ছোঁয়ায় মনে হবে পৃথিবীটাই যেন জ্বলছে। পলাশ নয়, ও রঙ বুঝি আগুনের। খেলনার মতো একটা রেলের লাইন কখনও পাশে পাশে কখনও এ পাশ থেকে ও পাশে গেছে, আবার ফিরে এসেছে এ পাশে। গোয়ালিয়র রাজার নিজের রেল ছিল। এখন ভারত সরকারের সম্পত্তি হয়েছে।

চল্লিশ মাইল পৌঁছবার আগেই পথ একটু ঘুরে সুলতানগড় ফল্‌সে পৌঁছেছে। অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য। বড় বড় পাথরের উপর দিয়ে পার্বতী নদী লাফিয়ে নেমেছে নিচের প্রশস্ত উপত্যকায়। পরিবেশ মুখর হয়ে থাকে গম্ভীর কলধ্বনিতে।

বাঘের গর্জনও শোনা যায়। দু-ধারের গভীর বনে বাঘ নেকড়ে চিতা সব রকম জানোয়ারই আছে। এ রাজ্যের আটান্ন মাইল জোড়া ন্যাশনাল পার্ক। কোন কোন দিন পথের মাঝখানেই বাঘের দর্শন মেলে। শিবপুরী পৌঁছবার মাইল ছয়েক আগে কুয়াত্‌ বাবা নামে একটা সুন্দর জায়গা আছে। সেখানে ঘন লতা-গুল্মের ভিতর দিয়ে একটা ঝরণার মতো বয়ে গেছে। এই নদীতে নিয়মিত বাঘ আসে তৃষ্ণা নিবারণে।

শিবপুরী থেকে চার মাইল দূরে চাঁদপথ নামে একটি বিরাট হ্রদ।

সাত মাইল তার পরিধি। লোকে একে সাখ্যসাগরও বলে। পারে একটি বোট ক্লাব আছে। নৌকোয় চড়বার জন্য অসংখ্য লোক আসে। চার দিকে মনোরম পাহাড়, পাথরের রঙ যেন লাল, আর গাছের পাতার রঙে হালকা বেগনি ছায়া। নিচের নীল জল আর উপরের নীল আকাশে মিশে একটি মায়াময় পরিবেশ। একটি ভাল সঙ্গী পেলে উঠে আসতে ইচ্ছা হবে না।

এই সাখ্যসাগরেই একটা সুন্দর কুণ্ড আছে। তার নাম ভাদাইয়া কুণ্ড। বর্ষায় ও তার পরেও জলের তোড় দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। জায়গাটা বাঁধিয়ে এমন সুন্দর করা হয়েছে যে নীরস মানুষেরও তা ভাল লাগবে।

তারপরে রাজাদের ছত্রিগুলো। বর্তমান মহারাজার পিতা মাধো রাও তাঁর মাতা মহারাণী সাখ্য রাজা সিন্ধিয়ার একটি ছত্রি নির্মাণ করেছিলেন। চমৎকার একটি বাগানের ভিতর হলদে বালি পাথরে তৈরি এই ছত্রি। এরই সামনে মহারাজা মাধো রাওএর ছত্রি। প্রচুর অর্থ ব্যয়ে এই ছত্রি নির্মিত হয়েছে। শুধু মার্বল পাথর নয়, ভিতরে অন্য দামী পাথরও আছে।

তাঁতিয়া তোপেকে মনে পড়ে?

ভদ্রলোক হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন।

আপনি কি সিপাহী বিদ্রোহের কথা বলছেন?

হ্যাঁ।

ভারতবর্ষ তাঁকে কোন দিন ভুলবে না।

তাঁর চবুতরা আছে শহরে। সার্কিট হাউসের কাছে একটা জায়গায় ইংরেজ সেই দেশপ্রেমিক বীরকে ফাঁসি দিয়ে মেরেছিল। এক শো বছর পরে সেই রক্তাক্ত স্থানের উপর স্বাধীন সরকার তাঁর চবুতরা নির্মাণ করেছে।

ভদ্রলোকের বুক থেকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়েছিল। আমার মন চলে গিয়েছিল সেই অতীতের দিকে।

স্বাধীনতার সংগ্রামকে ইংরেজ বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেছে। ইতিহাসে আজও আমরা সিপাহী বিদ্রোহের কথা পড়ি। আজও এই ঘটনা একটা সম্মানের নাম পায় নি। তাঁতিয়া তোপে আজও একজন বিদ্রোহী নেতা, বীর দেশপ্রেমিক নন। স্বাধীন ভারতের সত্য ইতিহাস এখনও রচিত হয় নি।

কানপুরে তাঁতিয়া তোপে নানা সাহেবের সেনাপতি ছিলেন। পেশোয়া বাজীরাওএর দত্তক পুত্র নানা সাহেব কানপুর অধিকার করে নিজেকে পেশোয়া বলে প্রচার করেছিলেন। হ্যাভলকের হাতে পরাজিত হয়ে দুজনেই পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন। নানা সাহেব নেপালে হিমালয়ের অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর আর খবর পাওয়া যায় নি। তাঁতিয়া তোপে যোগ দিয়েছিলেন ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈএর সঙ্গে। ধরা পড়ে তাঁর ফাঁসি হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল গুরুতর। কানপুরে একটা কাঁচা দেওয়ালের আড়ালে প্রায় এক হাজার ইংরেজ সৈন্য ও নাগরিক কোন রকমে আত্মরক্ষা করছিল। নানা সাহেব নাকি তাদের নির্বিঘ্নে এলাহাবাদ যাবার ভরসা দিয়ে গঙ্গা তীরে তাদের হত্যা করেন। শ দুয়েক নারী ও শিশু হত্যা করে একটা কূপে নিক্ষেপ করেছিলেন। কানপুরে সেই কূপ আজও আছে। একটা কাঁচা দেওয়ালের পিছনে দাঁড়িয়ে বেশিক্ষণ আত্মরক্ষা করা যায় না। নানা সাহেব সেইখানেই তাদের হত্যা করতে পারতেন, তার জন্য নৌকোয় তুলে এলাহাবাদ পাঠাবার ভরসা দেবার দরকার ছিল না। নারী ও শিশু হত্যার কাহিনীটা অমানুষিক বটে, কিন্তু সত্য কিনা তা যাচাই হয় নি। তাঁতিয়া তোপে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলেই শিবপুরীতে তাঁর ফাঁসি হয়েছিল। হত না। ভারতবাসীর সেই স্বাধীন হবার চেষ্টাও সেদিন ব্যর্থ হত না। সিপাহীদের সঙ্গে শুধু দেশপ্রেমিকরাই যোগ দিয়েছিলেন। সাধারণ জনতা এগিয়ে আসে নি। জনতাকে জাগাতে যে রকম নেতার প্রয়োজন, সে

নেতার অভাব ছিল দেশে। স্বাধীন রাজারা তো বিশ্বাসঘাতকতাই করেছিলেন। নিজামের মন্ত্রী সার সালার জঙ্গ ও গোয়ালিয়রের মন্ত্রী সার দিনকর রাও প্রাণপণে ইংরেজদের সাহায্য করেছিলেন। তাঁতিয়া তোপের জীবনাবসান এই গোয়ালিয়র রাজ্যে।

খানিকক্ষণ পরে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন: আপনারা কি এখন ঝাঁসি যাচ্ছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঝাঁসির দুর্গটা দেখে নেবেন। আর—

একটু থেমে বললেন: জেনে নেবেন লক্ষ্মীবাঈএর কথা।

বলতে পারতুম আপনি বলুন। তা না বলে বললুম: আচ্ছা।

গোয়ালিয়র দেখবেন না?

বললুম: সময় নেই।

একটা দিনও নেই!

ঝাঁসি থেকে আমরা খাজুরাহো দেখতে যাব, সেখান থেকে সোজা কলকাতা।

ভদ্রলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: ও।

মনে হল, ভদ্রলোক যেন মর্মাহত হলেন। তাড়াতাড়ি বললুম: গোয়ালিয়র বুঝি খুব সুন্দর শহর?

সুন্দর নয়! গোয়ালিয়র দুর্গকে কি বলা হয় জানেন? A pearl in the necklace of the castles in India—ভারতবর্ষে দুর্গের কণ্ঠহারে একটি মুক্তার মতো। পাহাড়ের উপর একটি অপরূপ সুন্দর দুর্গ।

এই দুর্গ নির্মাণের সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত গল্প আছে। এই অঞ্চলে সুরয সেন নামে একজন সর্দার ছিলেন। তাঁর কুষ্ঠ হয়েছিল। অনেক চিকিৎসা করিয়েও তিনি কোন ফল পান নি। মনের দুঃখে তিনি দিন কাটাচ্ছিলেন। এক দিন এক হরিণের পিছনে ছুটতে ছুটতে একটা পাহাড়ের উপর উঠে যান। খুব ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত

হয়ে পড়েন। হঠাৎ একজন তপস্বীকে দেখতে পেয়ে তিনি অত্যন্ত বিনীত ভাবে তাঁর কাছে জল খেতে চান। সাধু তাঁর বিনয় ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে নিকটের এক জলাশয় থেকে জল এনে মন্ত্রপূত করে সুরয সেনকে খেতে দেন। জলের কী আশ্চর্য গুণ! সেই জলের স্পর্শেই কুষ্ঠ তাঁর সেরে গেল। সুরয সেন সাধুর পুজো করলেন। সাধু খুশী হয়ে বললেন, তুমি এই পাহাড়ে একটি দুর্গ নির্মাণ কর, আর এই জলাশয়কে বড় কর। তোমার নাম দিলাম সুরয পাল। যত দিন তোমরা এই পাল পদবী রক্ষা করবে, তত দিন তোমরা সুখে রাজত্ব করবে। এই আদেশ পেয়েই সুরয পাল পাহাড়ের উপর দুর্গ নির্মাণ করলেন। সাধুর নাম ছিল গোয়ালিপা, তাঁর নামেই দুর্গের গোয়ালিয়র নাম হল, আর জলাশয়ের নাম হল সুরয কুণ্ড।

তারপর সুরয পালের বংশের কী হল জানতে চাইছেন তো? তারও একটা গল্প আছে। সবাই সাধুর আদেশ মানতেন, এবং নির্বিঘ্নে রাজত্ব করে গেছেন। পাল উপাধি ছাড়তে কেউ সাহস করেন নি। অনেক দিন পরে তেজকরণ নামে একজন রাজা বললেন, আমি এ সব মানি নে। এবং পাল উপাধি বর্জন করলেন। এক বছর রাজত্ব করার পরে তিনি পরমল দেও প্রতিহার নামে একজন সম্ভ্রান্ত লোকের হাতে রাজধানীর ভার দিয়ে প্রতিবেশী দেওসা রাজ্যের রাজকন্যাকে বিবাহ করতে গেলেন। বছর খানেক পরে ফিরে এসে দেখলেন যে রাজ্যে তাঁর আর অধিকার নেই। প্রতিহার তাঁকে তাড়িয়ে দিল। পাল বংশের শেষ হল এইখানে।

মানসিংহের সঙ্গে গোয়ালিয়র দুর্গের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। এই মানসিংহ আকবর বাদশাহর সেনাপতি জয়পুররাজ মানসিংহ নন। ইনি তোমর বংশের প্রায় শেষ রাজা। মানসিংহের পরে এই বংশের একজন মাত্র রাজা রাজত্ব করেছিলেন। তোমর

বংশের কথা বলতে গেলে তৈমুর লঙের কথা বলতে হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে এই খোঁড়া তৈমুর ভারতবর্ষের মাটিতে রক্তের স্রোত বইয়ে গিয়েছিলেন। ঠিক এই সময় বীর সিংহ দেও নামে তোমর জাতের একজন বীর গোয়ালিয়র অধিকার করে বসেন। শিল্প প্রতিভায় এ বংশের অনেক দান। মানসিংহ রাজত্ব করেছিলেন ১৪৮৬ থেকে ১৫১৬ পর্যন্ত। দুর্গের ভিতর মানমন্দির নামে প্রাসাদটি তিনিই নির্মাণ করেন। এর চেয়ে ভাল গৃহ নির্মাণের নমুনা হিন্দু স্থাপত্যে আর নেই।

গুজরি মহল মানসিংহের আর একটি অপরূপ কীর্তি। এর সঙ্গে একটি প্রেমের কাহিনী যুক্ত হয়ে আছে। একদা এক রাজা এক গ্রামে গিয়েছিলেন শিকারে। সেখানে শিকারের বদলে সাক্ষাৎ পেলেন এক সুন্দরী কন্যার, নাম তাঁর মৃগনয়না। যত তাঁর রূপের খ্যাতি, তত তাঁর শক্তির বাহাদুরি। এক দিন নাকি এক বুনো মহিষকে একা কাবু করেছিলেন। এই সব কাহিনী শুনে রাজা তাঁর পাণিপ্রার্থী হলেন। মৃগনয়না বললেন, তাঁর শক্তির উৎস হল রাই নদীর জল। সেই জল তিনি রোজ পান করেন। রাজা যদি রাই নদীকে দুর্গের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করতে পারেন, তা হলে তাঁর বিবাহে সম্মতি আছে। রাজা বললেন, তথাস্তু। মানসিংহ তারপর গুজরি মহল তৈরি করলেন, তার ভিতরে এল রাই নদীর একটি ধারা।

মোগল আমলে গোয়ালিয়র দুর্গ অনেক ধাক্কা সামলেছে। শেষ তোমর রাজা পানিপথের যুদ্ধে বাবরের কাছে হেরে গেলেন। বাবরের পুত্র হুমায়ুনকে হটিয়ে শের শাহ এই দুর্গ অধিকার করেছিলেন। তারপর আকবর বাদশাহ লড়েছিলেন মানসিংহের নাতির সঙ্গে। সিন্ধিয়ারা এই দুর্গ অধিকার করেন ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে।

ভদ্রলোক বললেন: একবার না দেখলে এই দুর্গের সম্বন্ধে আপনার সঠিক ধারণা হবে না। পাহাড়টা শ তিনেক ফুট

আর লম্বায় মাইল দেড়েক। চওড়া কোথাও ছশো ফুট, কোথাও বা আটশো। তিরিশ ফুট উঁচু একটা প্রাচীরে চারি দিক ঘেরা। একটা দুটো নয়, পাঁচ পাঁচটা ফটক পেরিয়ে দুর্গে ঢুকতে হয়। আলমগীর গেটের পর হিন্দোলা গেট পেরিয়ে গুজরি মহল। এর কথা আমি আপনাকে আগেই বলেছি। মৃগনয়না গুজর জাতের মেয়ে, তাঁর জন্যে তৈরি মহল বলে নাম গুজরি মহল। দোতলা বাড়ি, মাঝখানের উঠোনের চারি দিকে ছোট ছোট অনেকগুলো ঘর। এখন এই বাড়িতে হয়েছে সরকারী জাদুঘর।

গণেশ গেটের বাইরে ছিল গোয়ালিপার মন্দির। মুসলমানেরা এই মন্দির ভেঙে মসজিদ করে দিয়েছিল। লক্ষ্মণ গেটের বাইরে একটি ছোট মন্দির এখনও আছে। চতুর্ভুজ মন্দির নামে বিষ্ণুর মন্দির। হাতী গেট শেষ গেটের নাম। এক সময় নাকি একটি প্রমাণ আকারের হাতী ছিল গেটের পাশে। এখান থেকে মানমন্দির প্রাসাদে ঢুকতে হয়। সাহেবরা একে পেইণ্টেড প্যালেসও বলেছেন। রঙীন টালি আর মোজেকে নীল সবুজ আর সোনালী রঙের হাঁস ময়ূর আর হাতীর ছবিতে বড় বড় দেওয়ালগুলো চিত্রিত। ওপরে গম্বুজের সারি, নিচে বড় বড় অঙ্গন ঘিরে ঘর। প্রাসাদটি ওপরে দোতলা। নিচেও দুটো তলা আছে, মানসিংহ গ্রীষ্মাবাস হিসেবে ব্যবহার করতেন, আর মোগলরা রাখত বন্দীদের। খানিকটা দূরে পাহাড়ী পরিবেশে দুটি মন্দির আছে। বড় মন্দিরটিতে বিষ্ণুর মূর্তি। একটি সংস্কৃত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে একাদশ শতাব্দীর শেষে মহীপাল এটি নির্মাণ করেছিলেন। দরজাগুলো অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত। এক জায়গায় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনজনের মূর্তি আছে। ছোট মন্দিরটিতেও বিষ্ণুর মূর্তি। এক জায়গায় এক দল নৃত্যপরা নারীমূর্তি দেখে শিল্পীর প্রশংসা আপনাকে করতেই হবে।

তেলি কা মন্দিরের ছবি বোধ হয় গাইড বইএ দেখেছেন।

এটি দুর্গের পশ্চিম প্রান্তে। সব চেয়ে প্রাচীন মন্দির—নবম শতাব্দীর। তেলেঙ্গানার অপভ্রংশ তেলি, তেলেঙ্গানাদের মন্দির বলে নাম তেলি কা মন্দির। দুর্গের ভিতর এই মন্দিরটিই সব চেয়ে উঁচু, প্রায় একশো ফুট। দ্রাবিড় শৈলীর একটি নিখুঁত নিদর্শন।

সূরয পালের সূর্যকুণ্ডের কথা বলেছি। দুর্গের মাঝখানে তা অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে।

ভদ্রলোক হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি নিশ্চয়ই জৈন নন?

বললুম: না।

ভদ্রলোক বললেন: আমার প্রশ্ন করাই ভুল হয়েছে। বাঙালী জৈন আমি আজও পর্যন্ত দেখি নি।

কিন্তু হঠাৎ ধর্মের কথা কেন?

ধর্মের কথা ঠিক নয়। বলছিলাম যে জৈন স্থাপত্যের অনেক নমুনা আছে এই দুর্গে। পাঁচটি জায়গায় সব শুদ্ধ চব্বিশ তীর্থঙ্করেরই মূর্তি আছে। তার মধ্যে অনাদিনাথের দাঁড়ানো মূর্তিটিই সব চেয়ে বড়। কম করেও সাতান্ন ফুট উঁচু, পায়ের মাপই ন ফুট লম্বা হবে। এক জায়গায় একুশটি বিরাট মূর্তি আছে। এগুলো নাকি পঞ্চদশ শতাব্দীতে ডোঙ্গর সিংএর রাজত্বকালে নির্মিত।

এ সবই দুর্গের ভিতরে?

দুর্গ থেকে নামবার পথে এই সব পাবেন।

বললুম: আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে গোয়ালিয়রে যা কিছু দেখবার আছে, তা সবই ওই দুর্গে। গোয়ালিয়রে চিনেমাটির যে বাসন তৈরি হয়, সেই কারখানাটি নিশ্চয়ই শহরে।

ভদ্রলোক হেসে বললেন: কারখানা ছাড়াও আরও কিছু আছে। তানসেন আর মুহম্মদ গাউসের কবর।

মুহম্মদ গাউস কে?

একজন ফকির। আকবরের ঠাকুরদা বাবরও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন।

তারপরেই জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি গায়ক?

রক্ষে করুন।

আপনার সঙ্গী কেউ?

কেন বলুন তো?

গানের শখ থাকলে তানসেনের কবর আপনাকে দেখতেই হবে। কবরের পাশে তেঁতুল গাছ আছে, তার পাতা চিবিয়ে খেলে নাকি কণ্ঠস্বর হয় তানসেনের মতো। এই বিশ্বাস এমন গভীর যে হবু গায়কেরা কবরে ভিড় করেই আছে।

বলেই ভদ্রলোক হেসে উঠলেন।

গাড়ির অনেকেই তখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। যাঁরা শোবার জায়গা পান নি, তাঁরা বসে বসেই ঢুলছিলেন। এই হাসির শব্দে কেউ কেউ চমকে উঠলেন। ভদ্রলোক এই চমকানি দেখে বোধ হয় লজ্জিত হলেন। আস্তে আস্তে বললেন: আর নয়, রাত অনেক হল। নতুন শহর লস্করের কথা পরে বলব। আর বলবারই বা কী আছে! জয়বিলাস আর মতিমহল নামে দুটি প্রাসাদ, জয়াজি চক আর সরাফা। যদি সময় পান স্টেশনের ধারে জাদুঘরটা একবার দেখে নেবেন।

ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। ঘুমের আর দোষ কী! রাতের ঘুম তো স্বাস্থ্যের লক্ষণ, তার সঙ্গে ক্লান্তি আছে। কখন আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, টের পাই নি।

১৮

অনেক রাতে শোবার খানিকটা জায়গা পেয়েছিলুম। বোধ হয় বিনায়। যখন ট্রেন ছেড়েছিল, তখন আমরা ঘুমে অচেতন। ভোর বেলায় জেগে দেখি, আমার পাশের ভদ্রলোক তখনও ঘুমচ্ছেন। ওধারে অভিমন্যুকে নিয়ে মিনতিও ঘুমে কাতর। শুধু বিরূপাক্ষ আর কয়েক জনের মতো উঠে বসেছেন। মুখের সিগারেট দেখে মনে হচ্ছে যে বেশিক্ষণ তাঁর ঘুম ভাঙে নি। আমাকে উঠে বসতে দেখে বলে উঠলেন : গুড মর্নিং সার!

গুড মর্নিং।

বাংলায় আমরা সুপ্রভাত বলি না, নমস্কারও বলি না। দেখা হলে গুরুজনকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি, উপরওয়ালাকে বা স্বল্প-পরিচিত ভদ্রলোককে বলি নমস্কার। বন্ধুকে বা স্ত্রী পুত্র পরিবারকে সম্বোধন করবার রেওয়াজ নেই আমাদের। একটা কিছু থাকলে ভাল হত। মন ভরত।

বিরূপাক্ষ বললেন : ঘুম কেমন হল?

বললুম : যতটুকু না হলে নয়, ততটুকু হয়েছে। মানে সারা দিন ধকল দেওয়া সম্ভব হবে।

একটা আশার কথা আছে।

কী রকম?

হরপালপুরে আমরা রাত বারোটার আগেই পৌঁছব। সারা রাত টেনে ঘুমনো যাবে।

বললুম : কিন্তু উঠতে হবে রাত থাকতেই। বাস নাকি শেষ রাতে ছাড়ে। অন্ধকার থাকতেই।

বলেন কি!

আমার এক বন্ধু গিয়েছিল সাতনা হয়ে। ভোর ছটায় বাস ছাড়বার কথা, পাঁচটাতেই সব জায়গা দখল হয়ে যায়।

তবু ভাল।

কেন?

রাত চারটেয় বলেন নি। কিংবা তারও আগে।

তাতেই বা কী! কষ্টের দিন তো ফুরিয়ে এসেছে।

ঠিক মনে পড়ছে না, আমরা কষ্ট করতে বেরিয়েছিলুম, না আনন্দ করতে।

মনে পড়ার দরকার নেই।

কেন?

গরিবের ভ্রমণ হল বৌদ্ধদের নির্বাণের মতো।

একটু বুঝিয়ে বলুন।

ভিক্ষু নাগসেন গ্রীসের রাজা মিলিন্দকে এই নির্বাণের মানে বুঝিয়েছিলেন। তাই একটু সরল করে বলি। রাজার রাজ্য শাসন যদি সাধারণ জীবন যাত্রা হয় তো নির্বাণ হল রাজ্যসুখ। আমাদের এই কষ্ট সুখের ভূমিকা মাত্র।

বিরূপাক্ষ বললেন: গরিবের কেন বলছেন?

বড়লোকদের এই ভূমিকার দরকার নেই। পয়সার জোর থাকলে রাজ্য শাসন করবে মন্ত্রী ও সেনাপতি, রাজার রাজ্যসুখ হবে সারাক্ষণের। এই গাড়িরই প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে তাঁরা নামবেন। মুখ হাত ধুয়ে ছোট হাজরি করবেন, তারপর মোটরে চেপে চলে যাবেন খাজুরাহো।

ভুল হল, এই গাড়ি থেকে আমরা ঝাঁসিতে নামব, হরপালপুরে নয়।

পয়সা যথেষ্ট থাকলে গাড়িতে ওঠা নামাও করতে হয় না। যথেচ্ছ কেটে জুড়ে যত্র তত্র যাওয়া যায়।

ভাগ্য থাকলে পয়সারও দরকার হয় না।

কী রকম ?

বিরূপাক্ষ বললেন : আমাদের কর্তাদের দেখুন, আর দেখুন মন্ত্রী আর মোড়লদের।

হাতের সিগারেটটা তাঁর শেষ হয়ে এসেছিল। পরপর কয়েকটা লম্বা টান দিয়ে পোড়া টুকরোটা জানালা দিয়ে ফেলে দিলেন।

ইতিমধ্যে আমার পাশের সেই ভদ্রলোক জেগে উঠেছেন। প্রথমে গাড়ির ভিতরে পরে বাহিরে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: আমরা কত দূরে এসেছি ?

বললুম : জানি নে।

সে কি মশাই, আপনারাও কি এখুনি উঠলেন নাকি।

তা নয়। যে সব স্টেশনে দাঁড়াচ্ছে, তার একটারও নাম জানি নে, দেখেও মনে রাখতে পারছি নে।

আমরা কি ঝাঁসি পেরিয়ে গেছি ?

আজ্ঞে না। গাড়িতে আমাদের না দেখলে সেই আশঙ্কা করবেন। আমরা ঝাঁসিতে নামছি। কাল রাতেই বোধ হয় বলেছি।

তা হবে। ঘুমিয়ে ওঠার পর সব ঠাওর করতে আমার একটু সময় লাগে। কিছু মনে করবেন না।

বললুম : আমি অন্য কথা মনে করেছি। আপনার তো দূরের পাল্লা, আপনি কেন এই গরুর গাড়িতে উঠেছেন ?

তার কারণ কি আমি বলি নি ?

বলে থাকলেও মনে নেই।

ভদ্রলোক বললেন : দুটো কারণ। প্রথমটা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ভাড়া কম। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে, রাতের গাড়িতে উঠে হোটেল খরচটা বাঁচালাম।

আপনি যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তার প্রমাণ দিলেন।

কিন্তু নির্বুদ্ধিতা বুঝতে পারেন নি।

কী রকম ?

ভদ্রলোক বললেন : ভেবেছিলাম, আপনি গোড়াতেই সব বুঝে ফেলেছিলেন।

বললুম : আপনার গল্প শুনে কোন নির্বুদ্ধিতার কথা আমার সন্দেহ হয় নি।

ভদ্রলোক বললেন : গল্প কি এমনি করেছি! ক্ষিধেয় ঘুম আসছিল না। দেখতে পান না, দেশের ভিখিরিরা কত চেঁচায় যার পেটে যত ক্ষিধে, তার চিৎকার তত তীক্ষ্ণ।

হেসে বললুম : শাস্ত্রেও তাই বলে—শূন্য কলসীর আওয়াজ বেশি।

ভদ্রলোক বললেন : খুব ঠিক কথা। পেট ভরলেই গুপগুপ আওয়াজ। সবটাতেই হুঁ হুঁ, না কিছুতেই না। ঝাঁসিতে গাড়ি বদল করবার আগে পেট ভরে খেয়ে নিতে হবে।

বিরূপাক্ষ বাহিরের দিকে চেয়ে ছিলেন। আমাদের কথা বোধ হয় শোনা যাচ্ছিল না, তাই তাঁর কান এ দিকে ছিল না। হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : ঝাঁসিতে দেখবার কী আছে?

বললুম : রাণী লক্ষ্মীবাঈএর দুর্গ।

আর কিছু?

জানি নে।

ভদ্রলোক আমাদের কথা বুঝতে পেরেছিলেন, বললেন : আর কিছুই নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এই শহর পত্তন করেছিলেন বুন্দেলা রাজা বীরসিং দেও। রাণী লক্ষ্মীবাঈ না জন্মালে এ শহরের নাম ভারত বিখ্যাত হত না।

আমাদের কথাবার্তায় মিনতিরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। উঠে বসতে গিয়ে অভিমন্যুকে জাগিয়ে দিলেন। বোধ হয় হাতের ছোঁয়া লেগেছিল। বললুম : লক্ষ্মীবাঈএর গল্প অভিমন্যুর ভাল লাগবে।

ভদ্রলোক বললেন : আমি তো বাংলায় বলতে পারব না।

অভিমন্যু চোখ রগড়ে উঠে বসেছিল, বলল : কিসের গল্প?

বললুম : ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈএর।

গম্ভীর ভাবে সে বলল : হিন্দী আমি বুঝি।

ভদ্রলোক বললেন : ভারতীয় নাগরিক তো!

মিনতি হেসে বললেন : আমাদের পাশের কোয়ার্টারে থাকেন ওঁরা। তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ওর ভারি ভাব।

তাই বুঝি!

বললুম : বলুন এবারে।

ভদ্রলোক বললেন : লক্ষ্মীবাঈএর গল্প বলতে হলে নানা সাহেবের কথাও বলতে হয়।

তাই বলুন।

তা হলে গোড়া থেকেই শুরু করি। মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে বাজীরাও হচ্ছে শ্রেষ্ঠ নাম। শিবাজীর পর প্রথম বাজীরাও শ্রেষ্ঠ মারাঠা বীর ছিলেন, আর শেষ বাজীরাও আট লক্ষ টাকায় পেশোয়ার রাজ্য ইংরেজের কাছে বিক্রি করে কানপুরে এসে বসবাস করছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহ নেই, বিদ্রোহ প্রজা শাসন নেই, নিশ্চিন্ত বিলাসে ভদ্রলোকের মতো জীবন। বাজীরাও মহা খুশী, শুয়ে বসে গড়িয়ে তাঁর সময় সুখে কাটছিল। শুধু একটা ক্ষোভ, তাঁর কোন সন্তান ছিল না।

এমনই সময়ে নানাকে তিনি পেলেন। নানার পিতার নাম মাধব রাও নারায়ণ ভট, আর মাতার নাম গঙ্গাবাঈ। বাস করতেন মহারাষ্ট্রের বেণু গ্রামে। সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মেও তাঁরা অভাবে কষ্ট পাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত কানপুরে এলেন পেশোয়ার দরবারে কোন চাকরির আশায়।

নানাকে দেখে বাজীরাও মুগ্ধ হলেন। শুধু চাকরিই দিলেন না, নানাকে নিলেন দত্তক পুত্র রূপে। রাজার প্রাসাদে নানা রাজপুত্রের মতো বড় হতে লাগলেন।

এ দিকে এক ছোট মেয়ে হল নানার খেলার সাথী। নাম তার

ছাবেলী। যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনিই সুন্দর ব্যবহার। তার সাহসেরও তুলনা নেই। তার বাবা মোরাপন্ত তাম্বে, আর মা ভাগীরথী বাঈ। তাঁরাও সম্ভ্রান্ত মারাঠা পরিবার, কানপুরে এসে বাজীরাওএর দরবারে চাকরি পেয়েছিলেন।

নানা ও ছাবেলী এক সঙ্গে পড়লেন, এক সঙ্গে খেললেন। ঘোড়ায় চড়লেন, তলোয়ার চালানো শিখলেন। কিন্তু জীবনের অঙ্গনে তাঁরা মিলিত হলেন না, হলেন যুদ্ধের অঙ্গনে। ছাবেলীর বিবাহ হল ঝাঁসির রাজার সঙ্গে, কিন্তু তিনি অপুত্রক মারা যেতেই ইংরেজ সে রাজ্য অধিকার করল। কানপুরেও তাই হল। বাজীরাওএর মৃত্যুর পর নানাকে ইংরেজ অস্বীকার করল। কিন্তু নানা হলেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ। ইংরেজের বিধান এত সহজে তিনি মানবেন কেন! কিন্তু ইংরেজের শক্তি তিনি জানতেন, মানতেনও। তাই নিজের মনের আগুন তিনি ধীরে ধীরে সমস্ত ভারতে সঞ্চারিত করলেন। স্বাধীনতার আগুন। আঠারো শো সাতান্ন খ্রীষ্টাব্দে সেই আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল, আর আমরা সেই আগুনের আলোয় আবার দেখলাম নানা ও ছাবেলীকে। সিপাহী যুদ্ধের দুই নেতা নানা সাহেব আর ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ। বিধবা লক্ষ্মীবাঈএর বয়স তখন কুড়ি বছর।

অভিমন্যু তার মাকে কী একটা প্রশ্ন করেছিল। আমি শুনতে পাই নি। মিনতির জবাবটা কানে এল: হ্যাঁ।

তবে?

তবে কী?

দুজনেরই একজন মা?

এইবারে মিনতি হেসে উঠলেন।

বিরূপাক্ষ বললেন: হাসছ কেন?

তোমার ছেলের কথা শোন। নানা সাহেবের মায়ের নাম গঙ্গা, আর ভাগীরথী নাম লক্ষ্মীবাঈএর মায়ের। ভাগীরথী মানে যখন গঙ্গা, তখন দুজনেরই মা এক।

এবারে বিরূপাক্ষও হাসলেন।

অভিমন্যু বোধহয় লজ্জা পাচ্ছিল। আমি বললুম: তুমি ঠিক বলেছ অভিমন্যু। সমস্ত বীরের মায়েরই এক নাম। নেপোলিয়নের মায়ের নাম তুমি সুরধুনী বলতে পার। ওই স্বর্গের জল দিয়ে স্নান না করালে কি অমন ছেলেমেয়ে হয়!

মিনতি এবারে গম্ভীর হলেন। বিরূপাক্ষ ধরালেন আর একটা সিগারেট। আমি আমার পাশের ভদ্রলোককে বললুম: সিপাহী যুদ্ধের গল্পটাও তা হলে শোনান। অভিমন্যুর ভাল লাগছে।

ভদ্রলোক আবার গল্প শুরু করলেন: সারা ভারতব্যাপী বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তোলাটাই নানা সাহেবের সব চেয়ে বড় কীর্তি। এই কাজে তিনি যার সাহায্য পেয়েছিলেন, তার নাম ভারতের ইতিহাস থেকে মুছে গেছে। আজিমুদ্দিন নামে একটি গরিব মুসলমান ছেলে পেটের দায়ে ইংরেজদের কাছে বয়বাবুর্চির কাজ করত। ইংরেজী আর ফরাসী ভাষা শিখেছিল সাহেবদের কাছে। তারপর কিছু টাকা জমলে স্কুলে পড়ে একটা স্কুলের মাস্টার হল। নানা সাহেব তার সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তাকে নিজের কাছে টেনে নিলেন। এই দুজনে মিলে বিপ্লবের আয়োজন শুরু করলেন। আজিমুদ্দিন দু বছর ধরে বিলেত ও ইউরোপ ঘুরে ইংরেজের অবস্থা দেখে এল। কোন্ দেশের কাছে সাহায্য পাওয়া যাবে, তাও ঠিক করে এল। তারপর দেশে তাদের প্রচার শুরু হল। জনসাধারণের কাছে তো আর অস্ত্র-শস্ত্র নেই, শিক্ষিত সৈন্যও নয় তারা। প্রথমে তাই সিপাহীদের মধ্যে প্রচার শুরু হল। সাধু আর ফকির সেজে দলে দলে লোক ভারতব্যাপী প্রচার চালাতে লাগল। ঠিক হল, ১৮৫৭ সনের জুন মাসে বিপ্লব শুরু হবে। একশো বছর আগে যেদিন পলাশীর যুদ্ধে বাঙলা পরাধীন হয়েছিল, সেই দিনই পরাধীনতার শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হবে বিপ্লব ঘোষণা করে।

সিপাহীদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। অনেক দিন ধরে তারা

বোধ হয় এই রকমই কিছু চাইছিল। উৎসাহের তাদের অন্ত নেই, তারা অধীর হয়ে পড়ল। এমনি সময়ে ছোটখাট দুর্ঘটনা ঘটতে লাগল অপ্রত্যাশিত ভাবে। এত বড় একটা বিপ্লবের প্রস্তুতির কথা ভারতবর্ষের কোন ইংরেজ কোনখানে জানতে পারে নি। ঘুণাক্ষরে সন্দেহও করে নি কোন দিন। ছোট ছোট দুর্ঘটনা দেখে চর নিয়োগ করেও কোন হদিস পায় নি। স্থানীয় একটা গোলযোগ মনে করে নিশ্চিন্ত থেকেছে।

বিপ্লবের নেতারা তখন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। দিল্লীতে বাদশাহ বাহাদুর শাহ, কানপুরে নানা সাহেব নিজে, লক্ষ্ণৌতে মৌলভী আহমদ শাহ, বিহারে জগদীশপুরের জমিদার কুমার সিং, কলকাতায় অযোধ্যার উজীর নকৃকি খান এবং দাক্ষিণাত্যে রঙ্গ বাপুজী। তাঁতিয়া তোপে আর লক্ষ্মীবাঈ পরে যোগ দিয়েছিলেন।

এমন সময় এল সেই বিখ্যাত টোটা। দাঁত দিয়ে কেটে তা বন্দুকে ভরতে হয়। প্রচার হয়ে গেল যে তার ভিতর গরুর চর্বি আর শুয়োরের চর্বি দুই আছে। এক সঙ্গে হিন্দু মুসলমানের জাত নেবার ব্যবস্থা করেছে ইংরেজ সরকার। ব্যারাকপুরের এক দল সৈন্য বলল, মানি নে হুকুম। আর এক দলকে বলা হল, ছিনিয়ে নাও ওদের অস্ত্র ও পোশাক, তারপর তাড়িয়ে দাও। তারা বলল, না, তাও করব না। বিপ্লবের দিন তখনও আসে নি। কলকাতা থেকে নকৃকি খানের হুকুম এল, সবুর সবুর। কিন্তু মঙ্গল পাণ্ডে নামে একটি যুবক সৈন্যের তর সইল না, বন্দুক নিয়ে সে একে ওকে মেরে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে চারি দিক সামলাল।

মীরাটের ঘটনা একটু অন্য রকম হল। একই অপরাধে যখন এক দল সিপাহীর উপর হুকুম হল আর এক দলের অস্ত্র ও পোশাক ছিনিয়ে নেবার, তখন প্রাণের ভয়ে তারা না বলতে পারল না। ইংরেজ গোলন্দাজ সৈন্য কামান উচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সহকর্মীদের পোশাক কেড়ে নিয়ে তাদের অন্য বিপদ হল। পথে বেরোতেই

মেয়েরাও তাদের টিটকিরি দিল বীর পুরুষ বলে। কত দিন তারা সহ্য করবে! এক দিন জ্বলে উঠল বারুদের মতো, বেপরোয়া ইংরেজদের হত্যা করে দিল্লীর দিকে রওনা হয়ে গেল।

দিল্লীতে আগুন লাগল এর পর। সারা ভারতে সেই আগুন ছড়াতে একটুও সময় লাগল না। বিপ্লব ঘোষণা করবার আগেই বিপ্লব শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু আমাদের দেশেই শত্রু ছিল। পাঞ্জাব থেকে রণজিৎ সিংহের বংশধররা দিল্লীতে এল ইংরেজকে সাহায্য করতে। গুর্খা এল। এল অনেক দেশীয় রাজা। কিন্তু জনগণ সংঘবদ্ধ ভাবে এল না সিপাহীদের পাশে। বিপ্লব আর কিছু দিন পরে শুরু হলে হয়তো আসত। নানা সাহেব পালিয়ে গেলেন, তাঁর আর খোঁজ পাওয়া গেল না। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ বন্দী হয়ে নির্বাসিত হলেন। তাঁতিয়া তোপের ফাঁসি হল। কিন্তু ঝাঁসির রাণী ধরা দিলেন না, শত্রু তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে নি। শত্রু নিপাত করতে করতে রক্তাক্ত রণাঙ্গনে তিনি জীবন বিসর্জন দিলেন। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে ঝাঁসির রাণীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে গেল।

ঝাঁসি স্টেশনে আমরা ওয়েটিং রুমে উঠেছিলুম। ট্রেন পৌঁছেছিল সকাল দশটার পরে। তাই পথেই আমরা মুখ হাত ধুয়ে ভাঁড়ের চা খেয়ে নিয়েছিলুম।

শিবপুরীর সেই ভদ্রলোকের নাম আমার জানা হয়নি। নামবার সময় সৌজন্য বিনিময়টাও ঠিক আন্তরিক হয় নি। সচরাচর আমার এমন হয় না। নিজের কথা ভাবতে ভাবতেই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গয়েছিলুম। ঝাঁসি পৌঁছে গেছি শুনেই তাড়াহুড়ো করে নেমে পড়েছিলুম। এখন টাঙ্গায় বসে আমার এই কথা মনে পড়ল।

বিরূপাক্ষ বললেন: দুর্গ দেখতে হলে শুনেছি অনুমতির দরকার। কোন্ এক স্টেশন স্টাফ অফিসার অনুমতি দেবেন।

বললুম: রাণীর প্রাসাদ হয়েছে শহরের কোতোয়ালি। সেখানেই বোধ হয় অনুমতি পাওয়া যাবে।

মিনতি বললেন: কী দরকার ভেতরে যাবার। দুর্গ আমাদের অনেক দেখা আছে।

সাবাস সাবাস! আপনি কী বলেন?

বলে বিরূপাক্ষ আমার দিকে তাকালেন।

বললুম: এত দিন যথেষ্ট ঘোরাঘুরি হয়েছে, বিশ্রাম সে পরিমাণে হয় নি। টাঙ্গায় বসেই শহর পরিক্রমা ভাল লাগবে।

যা বলেছেন।

বলে বিরূপাক্ষ আমাকে সর্বতোভাবে সমর্থন করলেন।

কাজেই আমরা আর টাঙ্গা থেকে নামলুম না। বসে বসেই শহরটা দেখলুম। দেখবার আর কীই বা আছে। এক দিকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে পাহাড়ের উপরে পাথরের দুর্গ। অন্য

দিকে পরিচ্ছন্ন শহর এলাকা। বড় বড় দোকানপাট। শহর সম্বন্ধে মোটামুটি একটু ধারণা করে আমরা আবার স্টেশনে ফিরে এলুম।

মিনতি বললেন : আজ আর একটা ভুল ভাঙল।

কী ভুল?

এত দিন ভাবতাম, ঝাঁসিতে অনেক কিছু দেখবার আছে।

বললুম : এ আমাদের সকলেরই ধারণা।

বিরূপাক্ষ বললেন : কেন এমন ধারণা হল বলতে পারেন?

বললুম : ঝাঁসির রাণীর জন্যে। ঝাঁসির কোন রাজার নাম আমরা জানি নে। ইতিহাসে শুধু একটি নামই আছে—ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ। লক্ষ্মীবাঈ না জন্মালে ঝাঁসির কথা কেউ জানত না।

এত বড় একটা দুর্গ!

এমন দুর্গ এ দেশে অসংখ্য আছে।

অভিমন্যু জিজ্ঞাসা করল : দুর্গের ভেতরে কী থাকে মা?

মিনতি বললেন : ঘর বাড়ি, সৈন্য সামন্ত—

আর আমি বললুম : মাণ্ডুর দুর্গ তো আমরা দেখেছি!

সে তো একটা শহর!

চিতোরের দুর্গও অমনি একটা শহরের মতো, দুর্গের মধ্যেই রাজার রাজধানী।

মিনতি বললেন : কিন্তু ঝাঁসির দুর্গ সে রকম মনে হল না।

দেশে এই রকম দুর্গই বেশি। যুদ্ধের সময় এখানে রাজা থাকেন সৈন্য সামন্ত নিয়ে। প্রজারা পালিয়ে যায়।

ওয়েটিং রুমের এক কোণে এক ভদ্রলোককে দেখতে পাচ্ছিলুম, আমাদের দিকে পিছন ফিরে বসেছেন। তাঁর আড়ালে এক মহিলা। বয়সে দুজনেই তরুণ। বোধ হয় স্বামী-স্ত্রী। স্বামীর কোন কাজে স্ত্রী বাধা দিচ্ছেন বলে মনে হল। তাই কৌতূহল হল। বাথ রুমে যাবার ছল করে আমি তাঁদের দেখে এলুম। ভদ্রলোক

তাঁর স্ত্রীর পায়ে ওরিয়েন্টাল বাম মালিশ করে দিচ্ছেন। স্ত্রী বাধা দিচ্ছেন না, আস্তে আস্তে কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন।

মিনতি আমার মতলব যে বুঝতে পেরেছিলেন, তা তাঁর চোখের দিকে চেয়েই টের পেলুম। নিজের জায়গায় ফিরে আসতেই চোখ নামিয়ে তাঁর প্রশ্ন জানালেন।

চেয়ার টেনে আমি তাঁর কাছে সরে এলুম। তারপর ফিসফিস করে বললুম : দম্পতি।

তা তো বুঝতেই পারছি।

মনে হচ্ছে, নতুন বিয়ে হয়েছে।

তাও সন্দেহ করছি। কিন্তু কী করছে দেখলেন?

স্ত্রীর পদসেবা।

বিরূপাক্ষ শুনতে পান নি। মিনতি চোখ কপালে তুলে বললেন : সত্যি!

যদি মিথ্যে মনে হয়, উঠে দেখে আসুন। কোলের ওপর স্ত্রীর একখানা পা তুলে নিয়ে বলছেন, দেহি পদপল্লবমুদারম্।

মিনতি আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে আঁচলটা সামলে নিয়েই বাথ রুমের দিকে চললেন। চোখ দুটো এখনও বাথ রুমের দরজার দিকে স্থির থাকলেও আমি জানি যে ঠিক সময় মতো আড় চোখে ব্যাপারটা দেখে নেবেন।

সিগারেট ধরিয়ে বিরূপাক্ষ কী ভাবছিলেন তিনিই জানেন। কিন্তু কিছু যে সন্দেহ করেছিলেন, তা তাঁর প্রশ্ন শুনেই বুঝতে পারলুম। বললেন : ব্যাপার কী?

আমি ঠোঁটের উপর তর্জনী চেপে তাঁকে থামতে বললুম।

মিনতি পাশ দিয়ে যাবার পরেই আমি বউটিকে নড়ে চড়ে বসতে দেখলুম। মনে হল যে নিজের পা তিনি স্বামীর চেয়ার থেকে নামিয়ে নিলেন।

মিনতি ইচ্ছে করে দেরি করে ফিরলেন। দুজনে তখন সোজা

হয়ে বসেছেন। বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন যে আমরা তাঁদের লক্ষ্য করছি। বিরূপাক্ষকে ব্যাপারটা আমি বললুম।

ফিরে এসে মিনতি বললেন : দেখলে তো! স্ত্রীকে যত্ন করতে শেখ।

বিরূপাক্ষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন : ওসব খেয়াল পড়বার বয়স যে পেরিয়ে গেছে!

সে বয়স কি কোন দিন ছিল না!

তখন স্বামী-সেবার রীতি ছিল।

মিনতি এবারে আমাকে বললেন : শুনছেন তো, উনি যেন সত্য যুগের ঋষি।

মিনতির বয়স এমন কিছু বেশি নয়। ওই কোণের বউটির চেয়ে হয় তো কয়েক বছরের বড়। সঙ্গে ছেলে আছে বলেই একটু ভারিক্কি দেখায়। হেসে বললুম : তা আপনার কিছু দাবি আছে বইকি!

ওই রকম পদসেবা নেবার?

নিলে দোষের কী আছে! অনেক ঘোরাঘুরি করে হয়তো পায়ে বেশ ব্যথা হয়েছে। মাথা ব্যথার ওষুধটা পায়ে একটু ঘষে দিচ্ছেন।

মিনতি বললেন : ছি ছি, আমার পায়ে কেউ হাত দিলে আমি শুইতে পারব না।

অভ্যেস হলেই পারবেন।

মিনতি ঠোঁট উলটে বললেন : আমার দরকার নেই।

এবারে দেখলুম যে ওঁরাই আমাদের লক্ষ্য করছেন। আমরা খুবই সাবধানে কথা বলছি। তবু মনে হল যে আমাদের কথাবার্তাও বোধ হয় শুনতে পেয়েছেন। তাই একটু জোরে জোরে জিজ্ঞাসা করলুম : আপনারা কি কলকাতা থেকে আসছেন?

ভদ্রলোক মুখ ফিরিয়ে বললেন : আমাকে বলছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন: আপাতত জব্বলপুর থেকে।

মিনতি সোজা হয়ে বসে বললেন: জব্বলপুর আমরা দেখব না, তাই না?

বিরূপাক্ষ বললেন: পয়সা খরচ করলে দেখা যায়।

মিনতির সে কথা মনে পড়েছে। তাঁরা রেলের পাসে যাচ্ছেন। তাতে এঁকে বেঁকে যাবার অধিকার নেই। সরল সোজা পথে গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে হবে।

আমি বললুম: বেশ হয়েছে। জব্বলপুরের গল্পটা তা হলে আপনার কাছেই শোনা যাক। ক দিন ছিলেন সেখানে?

দু দিন।

দু দিনেই সব দেখে নিলেন?

রয়ে বসে দেখতে গেলেই তো খরচ!

হেসে বললুম: আর তাড়াতাড়ি করলেই মালিশ।

ভদ্রলোক লজ্জা পেয়ে বললেন: তা যা বলেছেন। একটা চলবে দাদা?

বলে পকেট থেকে সিগারেট বার করে আমার দিকে উঠে এলেন।

কথার ভঙ্গিটি আমার খুব চেনা লাগল। ভদ্রলোকও আমাকে চিনে ফেললেন। বললেন: আরে, দাদা যে!

বলে কী করবেন, তা ভেবে পেলেন না।

দত্তকে আমিও তখন চিনে ফেলেছি। নাগপুরের টিকিট কালেক্টার দত্তবাবু। সেবারে দক্ষিণ ভারতে ট্রেনের একটা কামরায় দেখা হয়েছিল। আমি উঠেছিলুম চিঙ্গলপুট স্টেশনে, আর এই দত্ত-পরিবার নাগপুর থেকে কোডাইকানাল যাচ্ছিলেন। ভিলুপুরমে নেমেছিলেন পণ্ডিচেরী যাবার জন্যে। সেবারেও আমাকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়েছিলেন। অভ্যস্ত নই

বলে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে হাত গুটিয়ে নিয়েছিলুম। এবারেও তাই করলুম।

সে বারে তিনি গোটাকয়েক দেশলাইএর কাঠি নষ্ট করে সিগারেট ধরিয়েছিলেন। এক মুখ ধোঁয়া নিয়ে খানিকটা কেশে বলেছিলেন, আমিও আগে খেতুম না। সম্প্রতি খাওয়া ধরেছি।

তারপর গলাটা আরও একটু নামিয়ে বলেছিলেন, সিগারেটের গন্ধটা বউএর ভাল লাগে কিনা, তাই ধরতে হল। কড়া সিগারেট এখনও টানতে পারি নে। তাই এই ছোট সিগারেট খাই। বন্ধুরা বলে, এ নাকি লেডিজ্ স্মোক।

এবারে আর সেই ছোট মেপোল দেখলুম না, দেখলুম চার মিনার। একটা কাঠি জেলেই ধরিয়ে ফেললেন। খুব দীর্ঘ একটা টান মেরে নাক দিয়ে ধোঁয়া বার করলেন।

জিজ্ঞাসা করলুম: আপনার সেই ছোট সিগারেট কী হল?

ওতে আর শানায় না দাদা। বড় সাহেবদের দেখে এই ফোর কাসল্স্ ধরেছি। বুঝতে পারলেন না তো?

বলে খানিকক্ষণ হাসলেন হা হা করে। তার পরে বললেন: বড় সাহেবদের দেওয়া নাম। থ্রি কাসল্স্ খাবার পয়সা নেই বলে এই ফোর কাসল্স্ খাওয়া। বুঝলেন না, বিড়ি টানতে যে তাঁদের লজ্জা করে!

এই কথাটি আর কার কাছে শুনেছি, মনে করতে পারলুম না।

বললুম: বসুন।

বসবার আর জায়গা ছিল না। দত্ত বললেন: আসুন না দাদা, আমার বউএর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

সেবারে তাঁর বউএর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন নি। ভদ্রমহিলা একখানা শতরঞ্চির উপরে শুয়ে ছিলেন, আর দত্তর প্রগল্‌ভতায় দৃষ্টি দিয়ে ভর্ৎসনা করেছিলেন। বললুম: থাক্ না, ওঁকে আবার কেন কষ্ট দিচ্ছেন!

কষ্ট কিসের! আলাপ করতেও কি কষ্ট হয় নাকি! আসুন।

বলে আমায় এক রকম টেনেই নিয়ে গেলেন। স্ত্রীকে বললেন: দেখেছ, দাদা এখানে লুকিয়ে বসে ছিলেন!

ভদ্রমহিলা নিস্পৃহ ভাবে বললেন: দাদা!

আমার নমস্কারের উত্তর দিলেন হাত জোড় করে। কিন্তু দত্ত খুবই বিপদে পড়লেন। বললেন: মনে নেই! সেবারে—

আমার পরিচয় তাঁর জানা নেই। তাঁকে রক্ষা করবার জন্যেই বললুম: আমার নাম গোপাল, আপনাদের মতোই একজন যাত্রী।

দত্ত তাড়াতাড়ি বললেন: তুমি এত ভুলে যাও! নিন দাদা, বসুন।

বলে একখানা চেয়ার টেনে এনে আমাকে বসতে বললেন। নিজেও বসলেন তাঁর আগের চেয়ারে।

বললুম: এবারে কোন্ পাহাড়ে যাচ্ছেন?

দত্ত হা হা করে হাসলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন: দাদা পাহাড়ে আর বড় একটা যাই নে।

কেন?

হাত দিয়ে দত্ত তাঁর স্ত্রীর পা দেখালেন, বললেন: ওঁর এখন পায়া ভারি। জব্বলপুর শহরে একটা পাহাড় আছে, তাতে উঠতে পারলেন না। নিচে থেকেই মদনমহল দেখলুম।

ভদ্রমহিলার শরীরও কিছু ভারি হয়েছে দেখলুম। কিন্তু দত্ত ঠিক সেই রকমই আছেন। অত্যন্ত মৃদু স্বরে বললেন: পাঁচমারির নাম করে এবারে খাজুরাহো দেখতে বেরিয়েছিলুম, কিন্তু আপনাদের জব্বলপুর বললুম।

তারপর স্ত্রীর দিকে এক বার আড় চোখে দেখে আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন: ওই সব মূর্তি দেখতে গিয়েছিলুম। বুঝলেন তো!

বুঝেছি।

আপনারা দেখবেন না?

হেসে বললুম : ও সব না দেখে কি ফেরা যায়।

তা যা বলেছেন।

হঠাৎ গলা নামিয়ে বললেন : ওঁরা কে ?

বললুম : আপনাদের মতোই বেড়াতে বেরিয়েছেন। খাজুরাহো দেখে দেশে ফিরবেন।

আপনার সঙ্গে ?

বললুম : আপনাদের মতোই পথের বন্ধুতা।

তার পরেই অনুরোধ করলুম : বলুন এবারে জব্বলপুরের গল্প।

দত্ত বললেন : জব্বলপুরের গল্প আর কী বলব ? এক দিন ঘুরেছি বাজারে, আর এক দিন গিয়েছিলুম ভেরাঘাট।

মার্বল রক্‌স্ দেখেন নি ?

তারই নাম ভেরাঘাট। স্টেশন থেকে মাইল তেরো দূরে। বাস যাতায়াত করে। সকালে সাড়ে সাতটায় স্টেশন থেকে ছেড়ে সব কিছু দেখিয়ে আবার ঘুরিয়ে আনে বোধ হয় সাড়ে এগারোটায়। ট্যাক্সিও আছে, আর সম্প্রতি দিল্লীর মতো তিন চাকার গাড়ি এসেছে খানকয়েক। টাঙা রিক্‌শাও বোধ হয় যায়। কাজেই দূরত্ব শুনে জব্বলপুরে না নেমে ভেরাঘাট স্টেশনে গিয়ে যেন নামবেন না। তা হলেই অসুবিধেয় পড়বেন। তিন মাইল পথ আপনাকে হাঁটতে হবে। নাগপুর থেকে জব্বলপুর আমি সেওনি হয়ে বাসে আসতে পারতুম, কিন্তু রেলে চাকরি করে বাসে কেন পয়সা গুনি বলুন ! আর তা ছাড়া পিপারিয়ায় নেমেই তো পাঁচমারি যেতে হয় !

বললুম : খাঁটি কথা। আমার জাহাজে চাকরি হলে আমি জাহাজেই আসতুম।

সে কি দাদা, এখানে সমুদ্র কোথায় যে জাহাজে আসবেন !

উড়ো জাহাজ ?

হ্যাঁ, উড়ো জাহাজ আছে।

বললুম : তার পরে আপনার ভেরাঘাটের গল্প বলুন।

দত্ত বললেন : জব্বলপুরে শুধু ওই একটিই দেখবার জিনিস। সাড়ে চার মাইল এগিয়ে একটি পাহাড় দেখবেন, তার ওপরে গোঁড় রাজাদের দুর্গ, নাম মদনমহল। কেঁদে ককিয়ে কোন রকমে একবার সেখানে উঠলে জব্বলপুরের দৃশ্য নাকি অপূর্ব দেখা যায়। আমাদের ভাগ্যে তা ঘটে নি। খানিকটা উঠেই আমাদের নেমে আসতে হয়েছে।

স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়েই ভদ্রলোক বললেন : আপনারা সোজা চলে যাবেন ধুঁয়াধার। নর্মদার জলপ্রপাতের নাম ধুঁয়াধার—মানে ধোঁয়ার আধার। নর্মদা বয়ে আসতে আসতে হঠাৎ তিরিশ ফুট নিচে গড়িয়ে পড়েছে, ধোঁয়ার মতো ফেনায় ও জলকণায় সেই স্থানটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। গাড়ি আপনাকে নদীর কাছাকাছি নিয়ে যাবে। বালির উপর দিয়ে আপনি নদীর তীরে আসবেন। রাস্তার ধারে কয়েকটা ছোট ছোট কুঁড়ে দেখতে পাবেন, তার নিচে পাথরের জিনিস বিক্রি হচ্ছে। এই পাথর ওঠে মাটির নিচে থেকে। কয়লার খনির মতো খুঁড়ে খুঁড়ে বার করে রাস্তার ধারে টাল করা হচ্ছে। লরিতে করে চালান যায়। কুলিরা বলে, গুঁড়ো করে নাকি পাউডারও হয়। কিন্তু সে পাউডার কী কাজে লাগে, তা বলতে পারে না।

সেখান থেকে ফিরে এসে পঞ্চবটীতে নামবেন। বাস এই পর্যন্ত আসে। কাছেই আছে চৌষট যোগিনী মন্দির। একশো সাতটা সিঁড়ি ভেঙে এই মন্দিরে উঠতে হয়। একাশিটা দেবদেবীর মূর্তি। দশম শতাব্দীর মূর্তি বলে লোকের বিশ্বাস। কিন্তু এই মন্দির দেখতে মানুষ এখানে আসে না। একশো পঁয়ত্রিশটা ধাপ ভেঙে তারা নর্মদার তীরে নামে। সেখানে সরকারী নৌকো আছে, মোটর লঞ্চ আর হাতে-বাওয়া নৌকো দুইই। সেই নৌকোয় চড়ে মার্বল রক্স্ দেখতে যাবেন। পারেন তো পূর্ণিমার রাতেই যাবেন। একটা অভিজ্ঞতা হবে।

আমি বললুম : ডিমরুলের উৎপাত আছে শুনেছি। সিগারেট ধরালেই নাকি ছেঁকে ধরে।

দত্ত বললেন : এবারে তো কিছু দেখলুম না। বরং কুমীর একটা দেখেছিলুম। দু দিকে পাহাড়। আমরা মার্বল পাথর বলি, কিন্তু আসলে ম্যাগ্‌নেসিয়াম লাইম স্টোন আলোয় একেবারে ঝকঝক করছে। এক জায়গায় দু দিকের পাহাড় প্রায় সমান উঁচু। এই জায়গাটাকে মাঙ্কিস্ লীপ বলে। জল এখানে দেড়শো ফিট গভীর। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল, তার ওপর পাহাড়ের প্রতিবিম্ব। আরও এগিয়ে দুটি পাথর। একটির নাম এলিফ্যান্ট্‌স্ ফিট, আর একটির নাম হর্সেস্ ফিট। তারপরেই ধুঁয়াধার জলপ্রপাত। পাথরের রং শুধু সাদা নয়, গোলাপী হলদে ও নীলের ছোঁয়াও আছে। বর্ণনা করে এর রূপ বোঝাতে পারি, এমন বিদ্যে আমার পেটে নেই।

বললুম : যথেষ্ট বুঝিয়েছেন। আপনার বর্ণনা শুনে আমার এখুনি যেতে ইচ্ছে করছে।

দত্ত তাঁর স্ত্রীর দিকে চেয়ে যেন কৃতিত্বের দাবী জানালেন। তারপরে বললেন : নদীর মধ্যে রানী অহল্যাবাঈএর শিব মন্দির আছে। আর এক জায়গায় আছে দত্তাত্রেয় মুনির গুহা। তীর্থ-যাত্রীর জন্যে ধর্মশালাও আছে নিকটে।

সহসা আমার অমরকণ্টকের কথা মনে পড়ল। নর্মদার উৎপত্তি হয়েছে অমরকণ্টকে। আর সে জায়গাটিও খুব মনোরম বলে শুনেছি। দত্তকে জিজ্ঞাসা করলুম : নর্মদার উৎপত্তি স্থলও তো আপনি দেখেছেন?

আপনি অমরকণ্টকের কথা বলছেন তো! তা দেখেছি বৈকি।

বলে দত্ত সগৌরবে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললুম : এ সব জায়গা আমাদের ভাগ্যে দেখা হবে না।

কেন?

বললুম : বাঙলা থেকে এত দূরে কি বার বার আসা সম্ভব!

দত্ত বললেন : বেশি দূর আর কোথায়! কলকাতা থেকে যদি আসতে চান তো বম্বে মেলে উঠে বসবেন, নামবেন বিলাসপুরে। তার পর বিলাসপুর-কাটনি লাইনে কিছু দূর এগোলেই পাবেন পেণ্ড্রা রোড। এলাহাবাদের দিক থেকেও আসতে পারেন। তাহলে কাটনিতে নেমে বিলাসপুরের ট্রেন ধরবেন। আসল কথা হল পেণ্ড্রা রোডে আপনাকে নামতে হবে। তারপরে আপনাকে বাসে চেপে আটাশ মাইল যেতে হবে। আর বনের মধ্য দিয়ে যদি হাঁটতে পারেন তো সতেরো মাইল হাঁটলেই অমরকণ্টক। কিন্তু মনে রাখবেন, বর্ষাকালে এলে বাস পাবেন না, তখন হাঁটা ছাড়া আর অন্য গতি নেই। এখন শুনছি যে এই লাইনের অনুপপুর জংশন থেকেও যাতায়াত করা যায়।

আমি বললুম : এইবারে কী দেখবার আছে তাই বলুন।

দত্ত বললেন : কালিদাসের মেঘদূত পড়েছেন তো! সংস্কৃতে না হলেও বাঙলা অনুবাদ নিশ্চয়ই পড়েছেন! কালিদাস যা বলে গেছেন, তারপরে আর কিছু বলবার নেই।

বললুম : কালিদাসের কথা তো মনে নেই, আপনি যা দেখেছেন তাই বলুন।

দত্ত বললেন : প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচু একটা উপত্যকার ওপরে হল অমরকণ্টক। এই মালভূমির নাম মাইকাল। পুরাণে নাকি তীর্থরত্ন বলে—সর্বতীর্থ নায়কম্। কিন্তু অমরকণ্টকের মানে বোঝেন তো! অন্তহীন বাধা। কোন সময় বোধহয় খুবই দুর্গম ছিল, তাই এই নাম হয়েছে। এখন এর নাম বদলানো দরকার। পেণ্ড্রা রোডে ট্রেন থেকে নেমে বাসে উঠে বসুন, আর নামুন গিয়ে অমরকণ্টকে। অজ্ঞাতবাসের সময় পাণ্ডবরাও নাকি এখানে এসেছিলেন।

তারপর?

দত্ত বললেন : অমরকণ্টক কিন্তু বড় জায়গা বলে মনে করবেন

না। এ হল ছোট একটি গ্রাম। নর্মদা কুণ্ড আর নর্মদা মাইএর মন্দিরের নিকট কয়েক শো লোকের বাস। যাত্রীর সংখ্যাও বেশি নয়। তবে শিবরাত্রি সংক্রান্তি আর পূর্ণিমায় বেশি যাত্রী আসে।

জিজ্ঞাসা করলুম: নর্মদার উৎস দেখতে পাওয়া যায়?

উৎস আবার কোথায়!

বলে দত্ত আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপরে বললেন: নর্মদা কুণ্ডেই নর্মদার উৎস। আর নর্মদা মাইএর মন্দির হল প্রায় হাজার বছরের পুরনো। এরই কাছে মাই কা হাতী নামে একটি সুন্দর জায়গা দেখে মাইল চারেক দূরে কপিলধারায় চলে গিয়ে নর্মদার জলপ্রপাত দেখবেন। ওপর থেকে ছুটো ধারা প্রায় এক শো ফুট নিচে পড়ছে। দৃশ্য দেখে মন ভুলে যাবে। তারপরে আরও ছুশো গজ এগিয়ে দেখবেন ছুগ্ধধারা জলপ্রপাত। আঁকা বাঁকা পথে সেখানে পৌঁছে দেখবেন যে নর্মদা দেখা দিয়েই পাহাড়ের পেছনে গেছে হারিয়ে।

দত্ত থামলেন না, বললেন: অমরকণ্টকে গেলে আর একটা কথাও মনে রাখবেন।

কী কথা?

শোন নদেরও জন্ম হয়েছে এইখানে। শোনমুণ্ডা নামে একটা জায়গায় যেতে হবে। প্রথমে ঝরণার মতো ঝরে পড়তে দেখবেন, তারপরে হারিয়ে গেছে তার স্রোত। কয়েক মাইল দূরে গিয়ে পেণ্ড্রার কাছে আবার তাকে দেখতে পাবেন। যদি সময় নিয়ে যান তো দিন কয়েক থাকবেন কোন ডাকবাংলো বা ধর্মশালায়। মাই-কা-বাগিয়া, জুহিলা নদীর উৎস, কবির চবুতরা—এ সবও দেখবেন। আর যদি আদিবাসী গোঁদ আর বইগাদের সঙ্গে ভাব করতে পারেন তো তাদের নাচ গানও দেখতে পাবেন।

সন্ধ্যা নামতে খুব বেশি দেরি ছিল না। আমাদের গাড়ি ছাড়বে রাত প্রায় সাড়ে নটায়। কিন্তু দত্তরা যাবেন উল্টো দিকে

জনতা এক্সপ্রেসে। সে ট্রেন সাতটার পরেই আসবে। আমি তাই সময় নষ্ট না করে পাঁচমারির কথাও তুলে ফেললুম। বললুম : পাঁচমারি আপনাদের কেমন লাগল ?

দত্ত কতকটা নির্বিকার ভাবে বললেন : ঐ এক রকম।

মানে ?

পিপারিয়া রেল স্টেশন থেকে বত্রিশ মাইল বাসে ঠেঙিয়ে উঠেছিলুম সেই সাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ে।

তারপর ?

'তারপর কোথায় পাহাড়, কোথায় ঝরণা, কোথা থেকে পাহাড়ের দৃশ্য ভাল, কোথায় গেলে সমতলের দৃশ্য দেখা যায়— এই সব খুঁজে বেড়ান। আবহাওয়াটা ভাল, তাই মন্দ লাগে না।

বুঝতে পারলুম যে স্ত্রীর হাঁটার কষ্টের জন্যই বোধহয় দত্ত এই স্থানটি মন খুলে ভাল বলতে পারছেন না। তাই জিজ্ঞাসা করলুম : দেখবার বুঝি কিছুই নেই ?

দত্ত বললেন : কিছু আছে বৈকি। পঞ্চপাণ্ডবের গুহা দেখলুম পাঁচটা। তাঁরা নাকি অজ্ঞাতবাসের সময় এখানেও কিছু কাল কাটিয়ে ছিলেন। মাঢ়ি মানে কুঁড়ে, পঞ্চমাঢ়ি থেকে পাঁচমারি নাম।

আমি বললুম : পঞ্চপাণ্ডব কি সত্যিই এ দিকে এসেছিলেন ?

দত্ত বললেন : খাজুরাহোর পথেও তো পাণ্ডব গুহা দেখলুম। কিন্তু আমার বিদ্যে অত দূর পৌঁছয় না। বৌদ্ধ কি জৈনরা এখানে বসবাস করেছে বললে আমি সহজেই বিশ্বাস করতে পারতুম।

আরও কিছু কথা হতে পারত। কিন্তু বাহিরে হঠাৎ কলরব শোনা গেল। জনতা এক্সপ্রেস নাকি আসছে। ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বামীর প্রতি একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করলেন। দত্ত বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দরজায় কুলিকে দেখে ফিরে এসে বললেন : জল্‌দি উঠাও।

আমার দিকে চেয়ে বললেন : চললুম দাদা। কাল আবার ডিউটি আছে।

আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলুম। এগিয়েও দিলুম।

যাবার সময় দত্ত বলে গেলেন : নাগপুরে এলে দাদা আমার কাছে উঠবেন। দত্ত বাবু নাম বললে যে কেউ আপনাকে পৌঁছে দেবে।

তাঁর ট্রেন আসতে আর দেরি নেই দেখে আমার উত্তরের অপেক্ষা করলেন না। তাঁর পিছনে আবার এক জোড়া চোখে আছে ভর্ৎসনার তাড়া।

আমাদের হরপালপুরের গাড়ি ছাড়ল আরও ঘণ্টা দুয়েক পরে, প্রায় সাড়ে নটায়। এইটুকু সময় আমরা চোখ বুজে কাটিয়ে দিয়েছিলুম। আজ বড় নিশ্চিন্ত বোধ হচ্ছে। রাত বারোটার আগেই এই গাড়ি হরপালপুরে পৌঁছবে, ওয়েটিং রুমে আমরা ঘুমতে পারব। খাজুরাহোর বাস ধরব ভোর বেলায়। গত রাত্রির ক্লান্তি আমাদের দূর হবে, এই আশায় মনটা প্রফুল্ল আছে।

খাজুরাহো যাবার পথের সম্বন্ধে নানা কথা শুনতে পেলুম। পথ নাকি তিনটে আছে। এক এক জন এক এক পথ ভাল বলছেন, আর সব পথ নাকি ভারি কষ্টের। মানুষ দু রকমের আছে। এক জন যে পথে গেছেন, সেই পথকে ভাল বলেন, অন্য সব দুর্গম পথ। আর একজন যে পথে গেছেন, সেই পথকেই দুর্গম বলেন, অন্য পথ সবই ভাল। জানবার চেষ্টা করলুম, খাজুরাহো কেউ গেছেন কিনা। এ প্রশ্নের উত্তর সবাই সযত্নে এড়িয়ে গেলেন।

খাজুরাহো যাবার এতগুলো পথ কেন হল?

এক দিক থেকে তো তিনটে পথ নয়, তিন দিক থেকে তিনটে পথ। একটা পথ ঝাঁসি থেকে হলে যেন বেশ সুবিধে হত। এলাহাবাদ থেকে যাঁরা বম্বে যাচ্ছেন, তাঁরা সাতনায় নামবেন। সাতনা থেকে খাজুরাহো বাহাত্তর মাইল, পান্না হয়ে বাস চলে। এই লাইনেই সাতনা পৌঁছবার আগে মানিকপুর জংশন। ঝাঁসি স্টেশন দিল্লী-বম্বে লাইনে। ঝাঁসি-মানিকপুর একটা শাখা লাইন আছে। সেই লাইনে আমরা এখন যাচ্ছি। হরপালপুর স্টেশন তিপ্পান্ন মাইল পূর্বে, সেখানে নেমে আমরা খাজুরাহো যাব। পথ তেষট্টি মাইল, ছাতারপুর হয়ে এই পথ গেছে। এই লাইনে মাহোবাতেও

আমরা নামতে পারি, সে মানিকপুরের কাছাকাছি। সেখান থেকে খাজুরাহো মাত্র চল্লিশ মাইল।

ছাতারপুর পান্না এ সব দেশীয় রাজ্য। রেল লাইন নেই, আছে প্রশস্ত পথ আর প্রচুর বাস। এলাহাবাদ থেকে বাসেই সরাসরি আসা যায়। আর রাজারা নিজেদের সুবিধে মতো কাছের রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত ভাল রাস্তা নির্মাণ করে নিয়েছেন। পরে আমার এই পথের একটা মোটামুটি ধারণা হয়েছিল। হরপালপুর থেকে নওগঙ্গ ছাতারপুর হয়ে যে পথ গেছে, সেই পথ পান্না হয়ে সাতনা পৌঁছবে। মাহোবার পথ খাজুরাহোর উপর দিয়ে গিয়ে এই পথে মিলিত হয়েছে। এই ত্রিবেণীর নাম বামিঠা। সমস্ত বাস বামিঠার থানার সামনে দাঁড়ায়। নেমে দেখলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। পূর্বের পথ পান্না হয়ে সাতনা গেছে, পশ্চিমে ছাতারপুর নওগঙ্গ হরপালপুর। উত্তরে খাজুরাহো মাহোবা। বামিঠা থেকে খাজুরাহোর দূরত্ব মাত্র সাত মাইল। সঙ্গে একখানা রোড ম্যাপ থাকলে এ মুলুকটা ভাল করে জেনে নেওয়া যেত। মধ্য প্রদেশ হবার আগে এ জায়গার নাম ছিল বিন্ধ্য প্রদেশ।

খাজুরাহোয় যাত্রী আকর্ষণের জন্য কিছু দিন থেকে সরকারী প্রচার কার্য পুরো দমে শুরু হয়ে গেছে। চলচ্চিত্রে খাজুরাহোর ছবি দেখানো হচ্ছে। বন্ধুদের কাছে শুনেছি যে দীর্ঘ দিনের অনাদৃত মন্দিরগুলোর সংস্কার হচ্ছে। যে জায়গায় এই মন্দিরগুলো ছড়িয়ে আছে, সেই জায়গায় উদ্যান রচনার চেষ্টা চলছে। রেস্ট হাউস হয়েছে। এবং বিদেশী যাত্রীর সুবিধার জন্য প্রতি রবিবার দিল্লী থেকে পান্নায় উড়ো জাহাজ আসছে। পান্না থেকে খাজুরাহো যাতায়াত করে লাকসারি মোটর বাস। এই সঙ্গেই সাধারণ যাত্রীর অসুবিধার কথা কাগজে পড়েছি। হরপালপুর মাহোবা বা সাতনা—কোনও স্টেশনে রিটায়ারিং রুম নেই। অথচ রাত্রিবাস এখানে অপরিহার্য। তিন জায়গা থেকেই বাস অতি প্রত্যুষে

ছাড়ে, কিন্তু স্টেশনে ট্রেন আসে রাতে কিংবা বিকালে। শহরে নাকি ভাল হোটেলও নেই। কাজেই যাত্রীদের ওয়েটিং রুম ছাড়া গতি নেই। এ কথা মানি যে ভাল হোটেল চালানো দুষ্কর। যা দরকার তা সরকারী টুরিস্ট বাংলো বা রেস্ট হাউস, কিংবা রেলের রিটায়ারিং রুম। খাজুরাহোয় রাত্রিবাস এড়ানো যায়, কিন্তু কোন না কোন স্টেশনে এক রাত্রি কাটাতেই হবে।

বিরূপাক্ষ আমার কাছেই ছিলেন, বললেন: গোপালবাবুকে আজ বড় গম্ভীর দেখাচ্ছে।

বললুম: তার কারণ আছে।

সত্যি নাকি!

ভাড়া দিয়ে দিয়ে পকেটের পয়সা এসেছে ফুরিয়ে, দেশে ফিরে খাব কী তাই ভাবছি।

এখানে খাবার পয়সা আছে তো?

তা আছে।

মিনতি বললেন: দেশে ফিরলে আপনার ভাবনা কী?

আমার জমিদারী নেই, সেইজন্যে ভাবনা।

জমিদারী তো আমাদেরও নেই, মাস গেলে মজুরি আছে।

একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বললুম: আমার বরখাস্তের নোটিস তৈরি হয়ে আছে।

কেন?

গত বছর পুজোর ছুটিতে বেরিয়ে দেরি করে ফিরেছিলুম। কর্তৃপক্ষ ক্ষমা করেছিলেন। বসন্ত কালে পালিয়ে গিয়েছিলুম, তাঁরা সতর্ক করে দিয়েছেন। এ পুজোয় আবার গোলমাল হল।

ব্যস্ত ভাবে মিনতি বললেন: আমাদের জন্যেই কি হল?

হেসে বললুম: আমার নিজের জন্যে। অর্থাৎ একটানা অনেক দিন অফিস করতে পারি নে।

মিনতি আশ্বস্ত হয়ে বললেন: তবু ভাল।

তাল মানে, চাকরিটা যাক বলছেন।

না না, তা কেন! আমরা দায়ী হলে আরও খারাপ লাগত।

বিরূপাক্ষ প্রশ্ন করলেন: সংসারে কি ভায়ার কোন টান নেই?

সংসার থাকলে তো সংসারের টান।

কেউ কোথাও নেই?

এখনও তো কাউকে খুঁজে পাই নি।

আহা, হিংসে করতে ইচ্ছে করছে।

মিনতি ধমকের সুরে বললেন: তা তো করবেই। নিজে কোন দায়িত্ব নিতে চাও না তো, পরের দুঃখ তুমি কী বুঝবে!

বিরূপাক্ষ বললেন: নিজের দুঃখই কি বুঝতে পারি!

দিন রাত রেলের লাইন দেখে দেখে মন ওই রকম কঠিন হয়েছে।

বিরূপাক্ষ হেসে বললেন: শুনেছেন তো, সংসার থাকলে রাগ-রাগিণীও শুনতে হত। এই জন্যেই বলছিলুম, আপনি বেশ আছেন।

শুধু কি রাগ-রাগিণীই শুনতে হয়!

উত্তর না দিয়ে বিরূপাক্ষ সিগারেট বার করলেন। কিন্তু মিনতি থামলেন না, বললেন: বিছানায় এক দিন শুয়ে থাকলে তো চোখে অন্ধকার দেখ। তখন কেন একা থাকার সুখের কথা মনে হয় না!

তখন যে রুগীর সেবা করতে হয়, আর ছেলের ঝামেলা।

ছেলে আমার একার কিনা!

আমি হাসছিলুম। স্বামী স্ত্রীর এই কলহে তিক্ততা নেই এতটুকু। প্রয়োজন যে পারস্পরিক এঁরা তারই প্রমাণ করছেন। কিন্তু এই ভাবে বেশি দূর অগ্রসর হলেই তিক্ততা এসে পড়ে। এক জন যখন আর এক জনের অক্ষমতার কথা টেনে আনেন, তখনই ছন্দ পতন হয়। পরিমিত উপার্জনই পুরুষের সব চেয়ে বড় অক্ষমতা। স্ত্রী যখন সেই অক্ষমতার খোঁটা দেন, স্বামী তখন মরিয়া হয়ে আক্রমণ করেন। নিঃশব্দে থাকলেও সে খোঁটা হজম হয় না। ভিতরে ভিতরে একটা হিংস্র বন্য ভাব ক্রমেই তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

সংসারের ভারসাম্য অস্থির হয়। স্বামী স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক দোলে ছোট নৌকোর মতো, একটা হাওয়ার ঝাপটাতেই অতলে তলিয়ে যাবার ভয় হয়।

কিন্তু কেন এমন হয়! বই পড়ে আমি একটা মন গড়া কারণ নির্ণয় করেছি। উপার্জনের অক্ষমতার কোন প্রতিবিধান নেই। মানুষ ইচ্ছে করে কম রোজগার করে না। রোজগার বাড়াবার জন্য প্রত্যেকটি লোকেরই চেষ্টার অন্ত নেই। কিন্তু কটা লোক সফল হয়! যারা ব্যর্থ হয়েছে আর ব্যর্থ হচ্ছে প্রতি দিন, তাদের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার উপর অসীম আক্রোশ। নিজেকে তারা দায়ী করে না কোন ব্যক্তিগত অক্ষমতার জন্য। কেউ করলে হিংস্র হয়ে ওঠে।

আমার অন্তরাত্মায় এই আতঙ্ক আছে প্রচ্ছন্ন হয়ে। নিজের প্রয়োজনকে স্বীকার না করলে অভাব মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু অপরের প্রয়োজন মেটাতে না পারলে আছে বেদনা বোধ। সেই অপর যত আপন হয়, এই বেদনা তত তীব্র। যে মানুষ অভাব-সচেতন বেদনা-কাতর ও কর্মনিষ্ঠ, সে মানুষ হিংস্র। একটু খোঁচাতেই বন্য হয়ে ওঠে। এ সবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার নেই, কিন্তু মনে মনে আমি এক ভয়ের জগৎ রচনা করে বসে আছি।

আমি বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। মিনতি আমায় জাগিয়ে দিয়ে বললেন: কী ভাবছেন বলুন তো?

নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম: আপনাদের কথা।

সে কি!

আপনাদের কথা শুনে বুঝতে পারছি না, সংসার করাটা ভাল কি মন্দ।

বিরূপাক্ষ হা হা করে হেসে উঠলেন, বললেন: ও সেই পুরনো কথা ভায়া—দিল্লীর লাড্ডুর কথা। খেলে বিপদ, না খেলে অশান্তি।

বিপদের চেয়ে অশান্তি ভাল।

সারা জীবন অশান্তিও তো বিপদের কথা।

মিনতি হাসছিলেন।

বললুম: হাসছেন যে?

এ সব শাস্ত্র কথা কি এখন আর ভাল লাগবে ভাই!

বিরূপাক্ষ বললেন: এই তো শাস্ত্রালোচনার বয়স।

তোমার চোখ নেই, তুমি এর মধ্যে কথা বলতে এস না।

বল কি গো, তুমি আবার কী দেখতে পেলে?

এখানে আর কী দেখব, দেখেছি যখন দেখবার দরকার ছিল।

বিরূপাক্ষ সোজা হয়ে বসলেন।

আমি বললুম: সবটুকু দেখতে পান নি।

তা হয়তো পাই নি। কিন্তু যতটুকু দেখেছি, তাতে সবটুকু বুঝে নিতে কষ্ট হয় নি।

বিরূপাক্ষ বলে উঠলেন: কথাগুলো বড়ই হেঁয়ালি ধরনের হচ্ছে। একটু সর্বসাধারণের বোঝার উপযোগী হোক।

তা হলে সাহিত্য হবে কী করে?

বিরূপাক্ষ আরও বিব্রত হলেন।

বললুম: সর্বসাধারণ যদি সব বুঝেই ফেলে, তা হলে খবরের কাগজকে আমরা সাহিত্য বলতে পারি। যত দুর্বোধ্য, ততই তো উঁচু দরের সাহিত্য!

সর্বনাশ! আপনারা কি সাহিত্য আলোচনা করছেন!

আজ্ঞে না, আমরা জীবনের আলোচনা করছি। জীবনে জীবন যোগ করা মানেই তো সাহিত্য।

মিনতি হাসছিলেন।

বিরূপাক্ষ বললেন: হাসছ যে?

নিজের প্রসঙ্গটা কেমন কায়দায় এড়িয়ে যাচ্ছেন দেখ।

যেতে দিচ্ছি কিনা!

বলে বিরূপাক্ষ আমাকে ধরলেন: বলুন এবারে, সাদা সরল কথায় বলুন।

কী বলব?

মিনতি যা দেখেছে, সেই কথা বলুন।

তিনি আমার মামা মামীকে দেখেছেন, আর দেখেছেন তাঁদের কন্যাকে।

মিনতি বলে উঠলেন: সম্বন্ধটা যে পাতানো, সে কথাটাও বলুন।

সত্যি কথা। কিন্তু যার সঙ্গে সেই মেয়ের বিয়ে হবে, তাকে দেখেন নি।

মিনতি যেন আঁতকে উঠলেন।

বললুম: আমি চলে যাচ্ছি জানলে জো রায় নিশ্চয়ই স্টেশনে আসতেন। তিনি আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেন না। বরং দু হাত জড়িয়ে ধরে আর একবার তাঁকে সাহায্য করতে অনুরোধ করতেন।

কী সাহায্য?

তাঁদের বিয়েটা যেন তাড়াতাড়ি হয়।

মনে হল যে মিনতি যেন একটা দীর্ঘ শ্বাস লুকোলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দুজনে কোন কথা কইলেন না।

রেল লাইনের দু ধারে তখন অন্ধকার আছে। শূন্য প্রান্তরে প্রাণের কোন সঙ্কেত নেই। চলতি ট্রেনের কামরায় বিদ্যুতের আলোর নিচে আমরা ক্লান্ত পৃথিবীকে জাগিয়ে রেখেছি। মায়ের কোলে মাথা রেখে অভিমন্যু ঘুমিয়ে পড়েছে। মিনতিও চোখ বুজে আছেন। জানালার দিকে তাকিয়ে বিরূপাক্ষ সিগারেট টানছেন। আমি এক সহযাত্রী ভদ্রলোককে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করছি। তিনি তাঁর সঙ্গীর সঙ্গে নানা গল্প করছেন। বলছিলেন: এ লাইনে এখন খাজুরাহোর যাত্রী বেশী। কিন্তু কিছু দিন আগে আমরা অন্য রকম দেখেছি।

কী রকম?

বলে সঙ্গীটি তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

দু ধার থেকে মানুষ চিত্রকূট দেখতে আসত। চিত্রকূট জান? রামায়ণ পড়েছ? তা পড়বে কেন! নবেল নাটক পড়ে আর সময় পাও না। তা তোমার দোষ নেই ভাই, কারও দোষ নেই। রামায়ণ পড়ে আর কী করবে! তার চেয়ে ক্রিস্টি পড়, গার্ডিনার পড়, সময় ভাল কাটবে।

ভদ্রলোক বয়সে নবীন নন, প্রাচীনও নন। কিন্তু কথার ধরনে তাঁকে প্রাচীন বলেই মনে হচ্ছে। বললেন: রামায়ণে এই চিত্রকূটের নাম পাবে।—

সুরম্যমাসাদ্য তু চিত্রকূটং
নদীং চ তাং মাল্যবতীং সুতীর্থাম্।
ননন্দ হৃষ্টো মৃগপক্ষিজুষ্টাং
জহৌ চ দুঃখং পুরবিপ্রবাসাৎ॥

মানে বুঝলে না তো? বুঝবে না তা জানি। সংস্কৃতের চর্চাও তো দেশ থেকে উঠে গেছে! একটা সুযোগ এসেছিল, সরকার তাও নিলেন না। ভারতবর্ষের সর্বত্র—উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে—এই ভাষার পঠন পাঠন ছিল। সরকারের একটা হুকুমে এই সংস্কৃতই দেশের রাষ্ট্রভাষা হতে পারত। কিন্তু তা না করে হিন্দীকে গ্রহণ করা হল। তার জন্যে বিক্ষোভ তো দেখতেই পাচ্ছ! কুমীরের সঙ্গে লড়াই করে জলে বাস করা যায় না, তাই লোকে মেনে নিচ্ছে। দেখা যাক।

সঙ্গী ভদ্রলোক বললেন: আপনার শ্লোকের মানেটা কী হল?

শ্লোক আমার নয়, বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডের শ্লোক এটি। এমন শোভিত পবিত্র নদীর কাছে এসে রাম এই সুন্দর চিত্রকূট পর্বতে বিশ্রাম নিলেন। মৃগপক্ষীপূর্ণ এই স্থানে তাঁর এমন আনন্দ হল যে তিনি অযোধ্যা থেকে নির্বাসনের কথা ভুলে গেলেন। রাম এখানে কী করে এলেন, সে কথা নিশ্চয়ই জান

না। অযোধ্যা পরিত্যাগ করে তিনি গঙ্গা পার হয়ে শৃঙ্গবেরপুর এসেছিলেন, এইখানে তাঁর গুহের সঙ্গে মিলন। তারপর এলেন প্রয়াগে ভরদ্বাজের আশ্রমে। ভরদ্বাজই তাঁকে চিত্রকূটে যাবার পরামর্শ দিলেন যমুনার তীরেতীরে, নৌকোয় অংশুমতী নদী পার হয়ে, বটবৃক্ষের এক ক্রোশ দূরে নীলকাননের পথে। চিত্রকূটে ছিল বাল্মীকির আশ্রম। রাম এখানে এসে কুটীর নির্মাণ করলেন।

চিত্রকূট অক্ষয় হয়ে আছে রামের অমর সঙ্কল্পের জন্য। দশরথের মৃত্যুর পর ভরত বেরিয়েছিলেন রামকে ফেরাবার জন্য। তাঁর সঙ্গে অযোধ্যার সেনাদল। ভরত এসে ভরদ্বাজের আশ্রমে পৌঁছলেন। মুনি বললেন, তোমার মায়ের কথা বল। অপূর্ব ভরতের বর্ণনা। পরম শ্রদ্ধায় বললেন কৌশল্যা ও সুমিত্রার কথা। কিন্তু নিজের মায়ের কথা বলতে তাঁর কণ্ঠ রোধ হল। বললেন, দেখতে আর্যের মতো, কিন্তু স্বভাবে অনার্য আমার মা। দাম্ভিক নির্বোধ রাগী স্নেহান্ধ রানী, তাঁরই জন্য আমার পিতার মৃত্যু হল, আর বিচ্ছেদ হল ভ্রাতাদের সঙ্গে। ভরত কাঁদতে লাগলেন। ঋষি বললেন, দুঃখ করো না। রামের এই নির্বাসনে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ হবে।

ভরত চিত্রকূটের দিকে এগোলেন। সঙ্গে সেনাদল। ভয়ে বনের পশু পক্ষী রামের আশ্রমের দিকে ছুটল। লক্ষ্মণ এক গাছে আরোহণ করে ভরতের সেনাদল দেখতে পেলেন। নেমে এসে বললেন, দাদা, ভরতের নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে, তাকে সায়েস্তা করবার অনুমতি দাও। রাম বললেন, না ভাই, তা হয় না।—

যদ্ বিনা ভরতং ত্বাং চ শত্রুঘ্নং বাঽপি মানদ।
ভবেন্মম সুখং কিঞ্চিদ্ ভস্ম তৎকুরুতাং শিখী॥

তোমাকে বা ভরত শত্রুঘ্নকে বাদ দিয়ে আমি যদি কোন সুখ চাই তো সে সুখ আমার আগুনের শিখায় ভস্ম হোক।

রাম বললেন, তুমি জান না লক্ষ্মণ, আমি আদেশ করলে ভরত তোমায় সমস্ত রাজ্য দান করবে। লক্ষ্মণ শান্ত হলেন।

তারপর এলেন ভরত। 'আর্য' বলে রামের চরণে আছড়ে পড়লেন। আর কোন কথা কইতে পারলেন না। উচ্চ কণ্ঠে শত্রুঘ্ন উঠলেন কেঁদে। রাম ভরতকে তুলে ধরলেন, জড়িয়ে চুমু খেলেন, শান্ত হতে বললেন। ভরত পিতার মৃত্যু সংবাদ দিলেন, বললেন, পিতার স্থান এখন রামকে নিতে হবে। রাম বললেন, রাজ্যের ভার এবারে তুমি নাও। বশিষ্ঠ ও জাবালা মুনিও ভারতের মতো রামকে রাজ্যভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাতে লাগলেন। রাম বললেন—

লক্ষ্মীশ্চন্দ্রাদপেয়াদ্ বা হিমবান্ বা হিমং ত্যজেৎ।
অতীয়াৎ সাগরো বেলাং ন প্রতিজ্ঞাং অহং পিতুঃ॥

চন্দ্র তাঁর রূপ পরিহার করতে পারেন, হিমালয় পারে তুষার ত্যাগ করতে, সমুদ্র পারে বেলাভূমিতে গড়াতে, কিন্তু পিতৃসত্য আমি পালন করবই। আরও বললেন, তোমার মা যা করেছেন, সে তোমারই ভালর জন্যে। সে সব কথা তুমি ভুলে যাও, মাকে আবার ভক্তি কর, ভালবাস। তোমার কাছে সীতার ও আমার এই প্রার্থনা।

রামের পাদুকা নিয়ে ভরত ফিরে গেলেন। রাম এগিয়ে গেলেন অত্রি অনসূয়ার আশ্রমে। সতী অনসূয়া গঙ্গাকে তাঁর আশ্রমের পাশ দিয়ে প্রবাহিত করেছিলেন। গঙ্গার নাম সেখানে মন্দাকিনী। এই চিত্রকূটকে লোকে পিতৃতীর্থও বলে। কিন্তু কালিদাস তাঁর মেঘদূতে বলেছেন রামগিরি।

সঙ্গী ভদ্রলোকটি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন: এখানে দেখবার কী আছে?

কোটি তীর্থ, দেবাঙ্গন, হনুমান ধারা, স্ফটিক শিলা, গুপ্ত গোদাবরী, ভরতকূপ, অনসূয়া। পাহাড়ের ধারে কোটি তীর্থ একটি

পবিত্র কুণ্ড। অসংখ্য ঋষি এখানে তপস্যা করেছেন। হনুমান ধারায় একটি বিরাট হনুমানের মূর্তি, তার এক হাতে একটি জলের ধারা পড়ছে। একটি বড় পাথরের উপর আছে পদচিহ্ন, তার নাম স্ফটিক শিলা। লোকে বলে, ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত কাকের রূপ নিয়ে এখানে সীতার পায়ে ঠুকরেছিল। রেবার মহারাজা নির্মাণ করেছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির। অত্রি অনসূয়ার আশ্রমের নিকট গুপ্ত গোদাবরী। আর সীতা কুণ্ড। ভরত কূপের সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। ভরতের রাজ্যাভিষেকের জন্য রাম অনেক তীর্থের জল সংগ্রহ করেছিলেন। ভরত রাজী না হওয়ায় সেই জল যে কূপে নিক্ষেপ করেছিলেন, এখন তারই নাম ভরত কূপ।

আর একটি জায়গার নাম না করলে চিত্রকূটের গল্প অসমাপ্ত থাকবে। তুলসীদাসজী সেখানে বসে একখানা পাথরে চন্দন ঘষতেন, আর রামের কপালে তা লেপন করতেন। এই ভক্তকে রাম দেখা দিয়েছিলেন।—

চিত্রকূট কে ঘাট পৈ ভই সন্তন কী ভীর।
তুলসীদাস চন্দন ঘসে তিলক দেত রঘুবীর॥

তুলসীদাসের জীবনের সঙ্গে কালিদাসের একটা মিল আছে। জনশ্রুতি যদি সত্য হয় তো দু জনই কবি হয়েছিলেন স্ত্রীর কাছে ধাক্কা খেয়ে। তুলসীদাস জন্মেছিলেন ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর বাবার নাম ছিল আত্মারাম দুবে, আর মায়ের নাম হুলসি। চিত্রকূট থেকে কুড়ি মাইল দূরে রাজপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। অপয়া মূলা-নক্ষত্রে জন্ম বলে পিতা তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলেন। নরহরি-দাসজী তাঁকে মানুষ করেন, তিনিই তাঁর গুরু। গুরু তাঁকে বারাণসীর পঞ্চগঙ্গা ঘাটে রামানন্দী মঠে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর পরিচয় হয় শেষ সনাতনজী নামে এক পণ্ডিতের সঙ্গে।

তুলসীদাসজী দীনবন্ধু পাঠকের কন্যা রত্নাবলীকে বিবাহ করে

তাঁরই মোহে মত্ত হয়েছিলেন। সেই মহিলা এক দিন তাঁকে বিদ্রূপ করে বললেন—

অস্থিচরমময় দেহ মন তামেঁ জৈসী প্রীতি।
তৈসী জো শ্রীরাম মেঁ হোতি ন তো ভবভীতি ॥

আমার অস্থি চর্মে তোমার প্রীতি ক্ষয় না করে শ্রীরামে মনোনিবেশ করলে তোমার পুনর্জন্মের ভয় দূর হত।

এই বিদ্রূপ তুলসীদাসজীর জীবনে পরিবর্তন আনল। গৃহত্যাগ করে তিনি বিশ বৎসর তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ালেন। অযোধ্যায় তিনি তাঁর বিখ্যাত রামচরিতমানস রচনা শুরু করেন ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ মঙ্গলবার।

তিনি যে রামের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে একটি অলৌকিক গল্প আছে। তুলসীদাসজী একটি আমগাছের গোড়ায় জলসেচন করতেন। সেই গাছে এক ভূত থাকে। এক দিন খুশী হয়ে ভূত বলল, তুমি বর নাও। তুলসীদাসজী বললেন, রামের দর্শন চাই। ভূত বলল, বেশ, ওই মন্দিরে রামায়ণ গান শুনতে হনুমান রোজ আসেন, তাঁকে ধর। হনুমানকে ধরে তুলসীদাসজী রামকে দেখলেন।

এই সময়ে আর এক জন কবি ছিলেন ভারত-বিখ্যাত। তাঁর নাম সুরদাস। সুরদাসের বন্ধুত্ব হয়েছিল তুলসীদাসজীর সঙ্গে। তুলসীদাস বলতেন—

সব্‌সে বসিয়ে সব্‌সে রসিয়ে
সব্‌সে লিজিয়ে নাম।
হাঁ-জী হাঁ-জী করতে রহিয়ে
বৈঠে আপন ঠাম।

এর চেয়ে বড় উপদেশ আর কী হতে পারে!

হরপালপুর স্টেশনের ওয়েটিং রূমে আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিলুম। যাঁরা আরাম চান, তাঁদের অভিযোগের অন্ত ছিল না। মেঝেয় চাদর বিছিয়ে ঘুমতে সবাই অভ্যস্ত নন। যাঁদের হোল্ডঅল আছে, তাঁরাও মেঝেতে শুতে ইতস্তত করেন। কিন্তু উপায় নেই। স্টেশনে রিটায়ারিং রূম নেই, কাছে কোন হোটেল বা ডাক বাংলো নেই। মাহোবা ও সাতনা স্টেশনেরও নাকি এই অবস্থা। খবরের কাগজেও এ নিয়ে অনেক চিঠিপত্র বেরিয়েছে। রেল কোম্পানি কিছু করে নি, গভর্ণমেণ্টও বধির হয়ে আছে। অথচ গত কয়েক বছর ধরে খাজুরাহোকে জনপ্রিয় করবার সব রকম চেষ্টা চলছে।

শুনলুম, সার্কিট হাউস আছে ছাতারপুর নওগঙ্গ ও পান্নায়। ছাতারপুরে ডাক বাংলোও আছে। খাজুরাহোতে রেস্ট হাউস ও হোটেল দুইই আছে। কিন্তু যাত্রীদের সুবিধা তাতে হয় নি। ঝাঁসির দিক থেকে যাঁরা আসেন, হরপালপুরে তাঁদের রাত কাটাতে হয়। যাঁরা আসেন এলাহাবাদের দিক থেকে, তাঁরা শেষ রাতে মাহোবায় পৌঁছোন। যাঁরা সাতনায় নামেন, তাঁরা চেষ্টা করলে পান্নায় রাত কাটাতে পারেন। তাতে অন্য সমস্যার উদ্ভব হবে। পান্না থেকে খাজুরাহোর বাস নেই। রবিবার যে বাসখানি ছাড়ে, তা বিদেশী টুরিস্টদের জন্য—যাঁরা উড়োজাহাজে দিল্লী থেকে পান্নায় এসে নামেন। অন্য দিন পান্নার যাত্রীদের সাতনার বাসেই উঠতে হবে, জায়গা না পেলে কেলেঙ্কারি। আরও একটু অসুবিধা আছে। এই সব বাসে সীট রিজার্ভ হয় না। রাতে গিয়ে টিকিট কিনে রাখবারও ব্যবস্থা নেই। ভোর বেলা মানে শেষ রাতে এসে ভাগ্য পরীক্ষা করতে হয়। এ অসুবিধা শুধু খাজুরাহোতে নয়, এ প্রায়

ভারতের সর্বত্রই। হাতে যাঁরা নির্দিষ্ট সময় নিয়ে বেরোন, আর পরিমিত পয়সা, তাঁদের দুর্ভাবনার অন্ত নেই। রাগ করে বিরূপাক্ষ টুরিস্ট ডিপার্টমেণ্টকে দায়ী করলেন: ওরা শুধু ছবি আর বই ছেপেই খালাস, যাত্রীদের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করা কারও দায়িত্ব নয়।

এ সব ব্যবস্থা যদি সহজ ব্যাপার হত, তা হলে সরকার করতেন।

কঠিন কেন?

ধনী যাঁরা তাঁরা মোটর হাঁকিয়ে আসছেন। চমৎকার বাঁধানো রাস্তা। হরপালপুর মাহোবা বা সাতনার কথা তাঁদের ভাবতে হয় না। আমার মতো দরিদ্র যারা, তাদের জন্য বিনি পয়সায় ওয়েটিং রুমই ভাল।

বিরূপাক্ষ বললেন: সমাজে মধ্যবিত্ত বলে আর একটা জাত আছে, যারা দুটো পয়সার বদলে খানিকটা আরাম চায়।

বললুম: তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। কাজেই আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় তাদের আরামের অধিকার নেই।

খাজুরাহোর বাসগুলো খারাপ নয়। শেষ রাতে উঠে কোন রকমে মুখ হাত ধুয়ে আমরা বাস ধরেছি। অন্ধকার থাকতেই বাস ছেড়েছে। শোনা যাচ্ছে, নওগঙ্গ ছাতারপুর প্রভৃতি কয়েকটি জায়গায় বাস দাঁড়াবে। যাত্রীরা চা জলখাবার খাবে, বিশ্রাম করবে। এতেও নাকি অনেক সময় নষ্ট হয়।

অভিমন্যুকে নিয়ে মিনতি সামনে বসেছেন। আমি বিরূপাক্ষর পাশে বসেছি। বিরূপাক্ষ চটে উঠলেন: এ গভীর অন্যায়ের কথা। সকল মানুষের সমান অধিকার থাকা উচিত।

হেসে বললুম: আজকের পৃথিবী তো এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছে।

মানে?

মানে, মানুষের অধিকার নিয়ে দুটো বড় দল হয়েছে। এক দল সাধারণ মানুষকে সভ্যতার পিলসুজ বলছেন। তাদের মাথায় বাতি জ্বলছে, আর গা বেয়ে গরম তেল পড়ছে গড়িয়ে। আর এক দল এই ব্যবস্থাকে অন্যায় বলে ঘোষণা করছেন। এ রাজনীতির কথা, এতে আমার রুচি নেই।

কোন মতামতও নেই ?

মতামতের দাম যদি পাই, তবেই ভেবে দেখব।

বিরূপাক্ষ আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম : এখন মাথা খারাপ করে লাভ কী! কেউ তো আমার কথা শুনবে না!

বিরূপাক্ষ এ কথার উত্তর দিলেন না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন।

রাস্তার দু ধারে আম আর নিমের গাছ। তারপর শস্যের ক্ষেত। অন্ধকার দূর হয়ে প্রভাতের আলো ফুটে উঠছে। পাঁচ ঘণ্টা ধরে এই তেষট্টি মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে। নওগঙ্গ আঠারো মাইল দূরে। সেখানে আমরা চা খাব। আমার মনে হল, বিরূপাক্ষর মন এই চায়ের জন্য চঞ্চল হয়েছে। আর এই অতৃপ্তির জন্যই তাঁর অনেক এলোমেলো কথা মনে আসছে।

মিনতি পিছন ফিরে বললেন : এক দিনেই কি সব দেখা সম্ভব হবে ?

বিরূপাক্ষ বললেন : চার পাঁচ ঘণ্টা যথেষ্ট সময়।

কিন্তু সব মন্দির তো আর এক জায়গায় নয়!

নাই বা হল, জায়গা তো একটাই। একটা গোটা শহর দেখবার পক্ষেও যথেষ্ট সময়।

মিনতি এ কথা মেনে নিলেন কিনা জানি নে, মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অভিমন্যু বলে উঠল : আমি এক দিনেই দেখতে পারব।

হেসে বললুম : তুমি যে বীর পুরুষ!

দু একজন যাত্রী খাজুরাহোতে রাত কাটাবার বিষয় আলোচনা করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ভাল ক্যামেরা আছে। বলছিলেন, দুপুর রোদে ছবি খুব ভাল হবে না। ছবির জন্যই তাঁদের রাতে থাকতে হবে। আর একজন বললেন, দুপুর রোদে দেখাও ভাল হয় না। ভাল জিনিসও দেখতে খারাপ লাগে।

খাজুরাহোর ইতিহাস নিয়েও তাঁদের আলোচনা হল। আমি তা মন দিয়ে শুনলুম। নবম থেকে ত্রয়োদশ এই চারশো বছর ধরে এই অঞ্চলের উপর রাজত্ব করেছিলেন চান্দেল্লা রাজারা। চন্দ্রবংশীয় রাজপুত তাঁরা। আর এই বুন্দেলখণ্ডের নাম তখন জেজাকভুক্তি ছিল। প্রথম কয়েক পুরুষের পরিচয় এখন আর পাওয়া যায় না। দশম শতাব্দীতে হর্ষ ও তাঁর পুত্র যশোবর্মণের নাম ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যে প্রতিহার রাজা দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট তৃতীয় ইন্দ্রের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন, তাঁকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে হর্ষ বিখ্যাত হয়েছিলেন। খাজুরাহোর একটা শিলালিপি থেকে জানা যায় যে যশোবর্মণই সেখানে প্রথম মন্দির নির্মাণ করেছিলেন —বিষ্ণুর মন্দির। কানিংহাম সাহেব মনে করেন যে এই মন্দির হল লক্ষ্মণের মন্দির।

যশোবর্মনের পুত্রের নাম ধঙ্গ। মাউএর একটা শিলালিপি পড়ে জানা যায় যে তিনি কনৌজের রাজাকে পরাজিত করে একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এঁর সময়ে যে অনেক মন্দির নির্মিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। একটা শিলালিপিতে আছে যে তিনি একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ধঙ্গের পৌত্র বিদ্যাধর একজন ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন। একাদশ শতাব্দীর প্রথমে মহম্মদ গজনী তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন। অজেয় কালিঞ্জর দুর্গে থেকে বিদ্যাধর যথেষ্ট বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। এই যুদ্ধের পর থেকেই খাজুরাহোর গৌরব শেষ হয়ে গেল। রাজা বুঝলেন যে সমতলের

এই রাজধানী রক্ষা করা সহজ কাজ নয়। তাই মাহোবা অজয়গড় ও কালিঞ্জর দুর্গে অবস্থান করে মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করাই শ্রেয় ভাবলেন।

খাজুরাহোর মন্দিরগুলি দেখে একটি জিনিস স্পষ্ট হবে যে চান্দেল্লা রাজারা সমস্ত ধর্মকেই সম্মান করেছেন। নিজেরা প্রথমে বৈষ্ণব ছিলেন, পরে শৈব হয়েছিলেন। জৈন ধর্মেরও প্রতিপত্তি ছিল খাজুরাহোতে। বৌদ্ধ ধর্মেরও যে প্রভাব ছিল তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। বুদ্ধের একটি বিরাট মূর্তি ছিল। এখন সেটি জাদুঘরে রক্ষিত হচ্ছে।

বাস এসে নওগঙ্গের বাজারের ভিতর দাঁড়াল। অনেকক্ষণ দাঁড়াবে। যাত্রীরা সবাই নেমে পড়ে চায়ের দোকানে গিয়ে ভিড় করল। চেয়ার টেবিলে বসে ছোটা হাজরি বা ব্রেকফাস্ট খাবার মতো রেস্তোরাঁ দেখতে পেলুম না। কিন্তু দেশী ব্যবস্থা ভালই আছে। যে যেখানে পারল ঢুকে পড়ে বসে দাঁড়িয়ে চারিধার সরগরম করে তুলল। মিনতি বললেন: গরম পকৌড়া খাব।

অভিমন্যু বলল: জিলিপি।

গরম জিলিপিও ভাজছে। আমরা দুইই খেলুম। তারপর চা। ভোরের হাওয়ায় তখনও সিরসিরে শীত আছে। এই গরম জলযোগ মন্দ লাগল না।

একজন বললেন: এখানকার ধুবেলা প্যালেসে একটা সুন্দর জাদুঘর আছে। সময় থাকলে দেখে নেওয়া যেত।

আর একজন বললেন: সকাল সাড়ে দশটার আগে তা খোলে না।

আরও কয়েক মাইল এগিয়ে একটা পাহাড় দেখবার জন্য কয়েকজন যাত্রী ঝুঁকে পড়েছিলেন। শুনলুম, এই পাহাড়ের উপরে মহারাজা ছত্রসালের একটা ভাঙা দুর্গ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই রাজা নাকি যমুনা থেকে নর্মদা পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।

এই রাস্তাটা পাহাড় ঘুরে গেছে। ডান দিকে একটা অসম্পূর্ণ স্মৃতিসৌধ দেখতে পেলুম। মহারাজারই স্মৃতিসৌধ। পুত্রদের মধ্যে বিবাদের জন্য এই সৌধ সম্পূর্ণ হয় নি, বিশাল রাজ্যটাও সেদিন ভেঙে গিয়েছিল।

যাত্রীদের মধ্যে একজন ছাতারপুরের লোক ছিলেন। একাধিকবার তিনি খাজুরাহো দেখেছেন। তিনিই নানা রকম গল্প শোনাচ্ছিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি নেমে যাবেন বলে পাশের যাত্রীরা আরও ব্যস্ত হয়ে উঠছিলেন। ভদ্রলোক নেমে যাবার আগেই সব কথা ভাল করে জেনে নেওয়া দরকার। একজন প্রশ্ন করলেন: খাজুরাহোতে খাবার মেলে তো?

ভদ্রলোক হেসে বললেন: মেলে বইকি।

কিন্তু এত সংক্ষিপ্ত উত্তরে কারও শান্তি হল না। তা লক্ষ্য করে তিনি বললেন: বাস যেখানে গিয়ে দাঁড়াবে, সেখানে নেমেই আপনাদের খাজুরাহো দেখা হয়ে যাবে। ডান দিকে পাশাপাশি অনেকগুলো খাবারের দোকান, বাইরে টেবিল চেয়ার পাতা আছে। গাছের ছায়াও আছে। ভাত ডাল রুটি পুরী তরকারি নানা রকমের মিষ্টি। মাছ মাংস খাবার ইচ্ছা হলে কাছেই একটা হোটেলে যাবেন। নেমেই যদি অর্ডার দেন, ইচ্ছা মতো খাবার পাবেন। রাতে যদি থাকতে চান তো রেস্ট হাউস আছে, হোটেলও আছে। রেস্ট হাউসে বিলিতি ব্যবস্থা, সাহেবরাও থাকে। হোটেলে দিশি কারবার, চলনসই ব্যাপার। হোটেলে থাকার জন্য তো যাচ্ছেন না, যাচ্ছেন দেখতে। একটা রাত না থাকলে দেখে সুখ পাবেন না। দুপুর রোদে আর যাই সম্ভব হোক, সৌন্দর্য উপভোগ পুরোপুরি হয় না।

এই কথায় আমার অজন্তা ইলোরার কথা মনে পড়ল। এই সব অপরূপ স্থানও আমরা দুপুরে দেখেছি। না দেখে উপায় ছিল না। ঔরঙ্গাবাদ থেকে ইলোরা হয়তো প্রভাতে দেখতে পারা যেত, কিন্তু

পথে দৌলতাবাদ দেখতে দেরি হয়ে যায়। অজন্তা তো দূরের পাল্লা। সেখানে পৌঁছতে দেরি হবেই। এই জন্যই বোধহয় কাছে রেস্ট হাউস তৈরি হয়েছে। শৌখিন মানুষেরা এই রেস্ট হাউসে এসে থাকবেন, আর সৌন্দর্য দেখবেন প্রত্যুষে ও প্রদোষে, জ্যোৎস্না রাতে চাঁদের আলোতেও দেখবেন। এ সবের জন্য সময়ের দরকার, প্রয়োজন পয়সারও। আমাদের সে সৌভাগ্য নয়।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন: আজকের রাতটা তাহলে সেখানেই থাকতে বলছেন!

আর একজন বলে উঠলেন: জিনিসপত্র যে স্টেশনে জমা করে এলাম!

ভদ্রলোক হেসে বললেন: আমি কিছুই বলছি না। আপনাদের যা সুবিধা হয়, তাই করবেন।

খানিকটা দূর থেকে এক ভদ্রলোক বললেন: কতগুলো মন্দির, আর ঘুরে ঘুরে দেখতে হলে কতটা সময় লাগবে, তার একটু আভাস দিন তো!

ভদ্রলোক বললেন: মন্দির এখন আর বেশি নেই। পঁচাশিটার মধ্যে এখন কুড়িটা মাত্র দাঁড়িয়ে আছে। বয়স তো কম হয় নি, এক হাজার বছর পুরো হয়েছে। দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি এ সবের নির্মাণ শুরু হয়েছিল, এক শো বছর ধরে এই মন্দিরগুলো গড়ে উঠেছিল। তিন জায়গায় এরা ছড়িয়ে আছে। যেখানে আপনাদের বাস থামবে তার বাঁ হাতে রাস্তার পশ্চিমে দেখবেন সমস্ত বিখ্যাত মন্দির। সরকার সম্প্রতি এই মন্দিরগুলো সংস্কারে মন দিয়েছেন, ফুলের বাগান করছেন, সিনেমার ছবি তুলে ভারতের সর্বত্র দেখাবারও ব্যবস্থা করেছেন।

কতগুলো মন্দির আছে এই গ্রুপে?

সেরেছেন! গুনে তো কোন দিন দেখি নি!

মোটমাট কুড়িটা মন্দির বললেন কিনা, তাই জিজ্ঞেস করলাম।

প্রায় সব কটাই বলতে পারেন। দাঁড়ান, একটু হিসেব করে বলি। ঈস্টার্ণ গ্রুপে তিনটে হিন্দু আর তিনটে জৈন মন্দির, সাদার্ণ গ্রুপে ছুটো হিন্দু মন্দির, মোট হল আটটি। তা হলে প্রায় বারোটি মন্দির ধরে নিতে পারেন। প্রায় বলছি এই কারণে যে মন্দিরের সংখ্যা আমি গুনে দেখি নি। সবাই কুড়িটা বলে, আমিও তাই বলছি। ওয়েস্টার্ণ গ্রুপে ছু সারিতে গোটা বারো মন্দির নিশ্চয়ই হবে।

হরপালপুর থেকে ছাতারপুরের দূরত্ব মাত্র চৌত্রিশ মাইল। পথের উপর প্রভাতের রৌদ্র তীব্র হয়েছে। বাতাসও উত্তপ্ত হচ্ছে। ছাতারপুর পৌঁছতে বুঝি আর দেরি নেই। এ ভদ্রলোক নেমে গেলে খাজুরাহোর খবর আর পাওয়া যাবে না বলে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠছেন। একজন বললেনঃ কুড়িটা মন্দির ভাল করে দেখা তো সম্ভব নয়! কোন্ কোন্ মন্দির মন দিয়ে দেখব একটু বলে দিন।

আর এক জন বললেন: খুব ভাল প্রস্তাব।

ছাতারপুরের ভদ্রলোক হেসে বললেন: কাণ্ডারিয় মহাদেবের মন্দিরটি ভাল করে দেখলেই সব মন্দির দেখার কাজ হবে। উড়িষ্যার মন্দিরের মতো সকল মন্দিরের গঠন রীতি একই রকম। শুধু কারুকার্যে কিছু প্রভেদ আছে। তাও এত সূক্ষ্ম প্রভেদ যে বার বার দেখবার পরেও আমি মনে রাখতে পারি নে। যাঁরা ছবি তোলেন, তাঁদের ছুর্দশা দেখে আমার কষ্ট হয়।

কেন?

জিজ্ঞেস করেন, সুরসুন্দরীর সুর্মা পরার মূর্তিটি কোথায়? তিনি কোন ছবির বইয়ে দেখেছেন, অথচ সে মূর্তি কোন্ মন্দিরের গায়ে আছে, তা কে বলে দেবে!

অনেকে তাঁর কথা শুনছিলেন মনোযোগ দিয়ে। ভদ্রলোক বললেন: এক বার পুরীর জগন্নাথ দর্শনে গিয়ে কতগুলো নাম শিখেছিলাম, এখানে আপনারাও কতগুলো নাম শুনবেন।

কী নাম ?

মন্দিরের বিভিন্ন অংশের নাম। উড়িষ্যার মন্দিরে শুনেছি দেউল জগমোহন ভোগমণ্ডপ আর নাটমন্দির। এখানে শুনবেন গর্ভগৃহ অন্তরাল মণ্ডপ অর্ধমণ্ডপ। কোন কোন মন্দিরে মহামণ্ডপ ও প্রদক্ষিণ পথও আছে। উড়িষ্যার কলসের মতো এখানেও কলস আছে, শিখর আমলক স্তূপিকা। আরও যে সব নাম আছে, তা শুনলে ঘাবড়ে যাবেন।

একজন বললেন : একটু যদি বুঝিয়ে দেন—

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন : নিজেই বুঝতে পারবেন। খুব উঁচু ভিতের উপর মন্দিরগুলো তৈরি হয়েছে। অন্য জায়গার মতো দেওয়াল নেই চারি ধারে। ধাপে ধাপে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাবেন। প্রথমে পাবেন অর্ধমণ্ডপ, তারপর মণ্ডপ, অন্তরাল পেরিয়ে দেবতার গর্ভগৃহ। বড় মন্দিরে একটা মহামণ্ডপ ও প্রদক্ষিণ পথও পাবেন। এ দুটি মন্দিরেরই অংশ, আলাদা কিছু নয়।

ভেবেছেন উপরে উঠেই মন্দিরের দরজা পাবেন! তা নয়। উঁচু ভিতটা একেবারে সমতল। তার উপর থেকে মন্দির গাঁথা শুরু হয়েছে। মন্দিরের গায়ের কারুকার্য দেখতে হলে উপরে উঠে প্রদক্ষিণ করতে হবে। দু তিনটি সমান্তরাল সারিতে কত অদ্ভুত কারুকার্য নিচে থেকে উপর পর্যন্ত চলে গেছে। পর পর চারটি শিখর নিচু থেকে উঁচু হয়ে গেছে। সবচেয়ে ছোটটি অর্ধমণ্ডপের উপর, আর গর্ভগৃহের উপরে সবচেয়ে বড়টি! এই শিখরে কলস স্তূপিকা ও আমলক। শিখরের গায়েও কত সূক্ষ্ম কারুকার্য! উরুশৃঙ্গে কণ্টকিত মূলমঞ্জরী।

উঁচু উঁচু ধাপ ভেঙে মন্দিরের দ্বারে পৌঁছতে হয়। সুন্দর তোরণটি দাঁড়িয়ে দেখবেন। তারপর ভেতরটা। কোন বই দরকার হবে না, গাইডও না, নিজেই সব বুঝতে পারবেন। মণ্ডপ থেকে গর্ভগৃহে যাবার পথের নাম অন্তরাল। সেখানে একটি চন্দ্রশিলার

বড় ধাপ আছে, সেটিও দেখবেন। আর দেখবেন ভিতরে আলো আসবার ব্যবস্থা। পার্সি ব্রাউন সাহেব বলেছেন যে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর হতে পারত না। আধো আলো আধো আঁধারে গর্ভগৃহের মধ্যে এক অদ্ভুত গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা চুপ করে শুনছিলুম। ভদ্রলোক বললেন: মন্দিরের কারুকার্যের সম্বন্ধে আরও দু একটি নতুন শব্দ আপনাদের শুনিয়ে দিই। মন্দিরের বাইরেটার নাম অন্তরভিত্তি, তার দেওয়াল ঢেউখেলানো। উঁচু জায়গার নাম রথ আর নিচুটা সলিলান্তর। এরই ওপর দু তিন সারি মূর্তি। দেবদেবীর মূর্তি ছাড়াও আছে অষ্ট দিকপাল অপ্সরা সুরসুন্দরী নাগ বিদ্যাধর ও শার্দুলের মূর্তি। তরুশাখা হাতে নারী মূর্তির নাম শালভঞ্জিকা। তাদের পায়ের নিচে বামন গণমূর্তি। সবার উপরে মিথুন মূর্তি। কত অপরূপ, কত বিচিত্র, কত নগ্ন।

এই বদ্ধকাম মিথুন মূর্তি নিয়ে অনেক আলোচনা পড়েছি। উড়িষ্যার মতো এখানেও নাকি অনেকের বিশ্বাস যে মন্দির গাত্রে এই সব মূর্তি বজ্রপাত থেকে মন্দিরকে রক্ষা করে। কেউ ধর্মের কথা বলেন, কেউ তিব্বতী তান্ত্রিকদের কথাও টেনে আনেন। কেউ বলেন, নরনারীর মিলন দিয়ে আত্মার সঙ্গে দেবতার মিলন দেখানো হয়েছে। কেউ বলেন, লালসার চিত্র দেখিয়ে যাত্রীর ভক্তি পরীক্ষা হচ্ছে। কেউ আবার শিল্পীর স্বাধীন সৌন্দর্য বিলাসের কথা উল্লেখ করে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করেছেন। ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখে রবীন্দ্রনাথও কিছু বলেছেন। সে কথা এখানে থাক।

প্রান্তর পেরিয়ে এবারে লোকালয় দেখা দিয়েছে। আমরা বোধহয় ছাতারপুর পৌঁছেছি। ব্যাকুল ভাবে একজন বললেন: আপনি কি এখানেই নামবেন?

এখানে নয়, সামনে।

ওই হল, কিছু তো জানা হল না!

আবার কী জানবেন। আপনারা দেখতে যাচ্ছেন, প্রাণ ভরে দেখবেন। এক দিনে প্রাণ না ভরে, ফিরবেন না।

তা কী করে হয়!

কেন হয় না! এ তো গান নয় যে শুনে প্রাণ ভরবে। তা যদি ভরতো তা হলে তীর্থে আর যাত্রী হত না, খাজুরাহোতেও না।

না না, আমি রাত্রি বাসের কথা বলছি। সঙ্গে যে আমার শয্যা নেই।

ভদ্রলোক হেসে বললেন: বাস থেকে নেমে চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরে ঢুকবেন। সেখান থেকে চলে আসবেন কাণ্ডারিয় মহাদেব ও জগদম্বী মন্দির। একে একে সব মন্দির দেখে হোটেলে কিছু খেয়ে নেবেন। ভাল কথা, এখানে প্রবেশের জন্য বোধহয় কয়েক পয়সার টিকিট লাগবে।

খাওয়ার পরে কোথায় যাব?

খাবার দোকানের সামনে গাছের ছায়ায় টাঙ্গা পাবেন। যদি ক্লান্ত না হন, তা হলে হেঁটেই যাবেন। পূবের মন্দিরগুলো দশ মিনিটের পথ। বাঁধানো রাস্তা দিয়ে না গিয়ে ক্ষেতের মাঝখান দিয়েই চলে যাবেন। জৈন মন্দিরগুলো আপনাদের ভাল লাগবে। যদি দক্ষিণের দিকে যেতে না পারেন, তা হলে দুঃখ করবেন না।

কিন্তু দুঃখ হচ্ছে আপনি নেমে যাচ্ছেন বলে।

ভদ্রলোক হাসলেন। হেসে বললেন: পথের দুঃখ বেশিক্ষণ মনে থাকে না।

ছাতারপুরে ভদ্রলোক নেমে গেলেন। আমরাও নামলুম। চা খেলুম। খোলা হাওয়ায় খানিকক্ষণ বেড়িয়ে আবার বাসে চেপে যাত্রা শুরু করলুম। প্রয়োজনের চেয়ে বাস বেশিক্ষণ দাঁড়াচ্ছে বলে যাত্রীদের মধ্যে বেশ অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। বিরক্ত হবারই কথা। মন এখন খাজুরাহোয় পৌঁছে গেছে। কিন্তু বাস পৌঁছয় নি। যেন ইচ্ছে করেই দেরি করছে। বাতাস গরম হয়েছে, আকাশের

রোদে মাটি উঠছে তেতে। তবু এদের তাড়া নেই। তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিতে এরা চাইছে না। এখনও যে অনেক পথ বাকি।

ড্রাইভারের পাশে যিনি বসে ছিলেন, তিনি বললেন : আর কত দূর!

অর্ধেকের বেশি পথ আমরা পেরিয়ে এসেছি।

উত্তরটা কে দিলেন, দেখতে পেলুম না।

মিনতিকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। এবারে মাথা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজলেন। অভিমন্যুও মায়ের কোলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। চলার একটা নেশা আছে। চলবার সময় আমাদের ঘুম পায়। আমরা মোটরে ঘুমোই, ট্রেনে ঘুমোই, উড়োজাহাজের চেয়ারগুলো তো ঘুমের সব চেয়ে উপযোগী। আমারও ঘুম পাচ্ছিল। এ ঘুম শ্রান্তির নয়, শেষ রাতে উঠবার জন্যও নয়। এ ঘুম চলার নেশার। নেশাখোরের ঝিমুনির মতো।

বাস কবার দাঁড়াল, আর কতক্ষণ দাঁড়াল, সে হিসেব আর রাখি নি। কলরবে যখন সমস্ত যাত্রী জেগে উঠল, তখন আমিও জাগলুম। বাস এসে খাজুরাহোয় দাঁড়ায় নি, দাঁড়িয়েছে বামিঠা নামে একটা পুলিসের থানার সামনে। খাজুরাহো এখান থেকে মাত্র সাত মাইল।

শুনলুম, সাতনা থেকে যে বাস আসে পান্না হয়ে, সেও এখানে দাঁড়ায়। কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না। যাত্রীরা এখানে অধৈর্য হয়ে পড়ে। যত গরম, তত আগ্রহ। বাস ড্রাইভারও নির্দিষ্ট সময়ের অজুহাতে সময় নষ্ট করে না। খাজুরাহোয় পৌঁছে তারও ছুটি। আমরা যখন ঘুরে ঘুরে মন্দির দেখব, সে তখন ছায়ায় বাস রেখে আরামে শুয়ে ঘুমোবে। বিকেলে আবার তার যাত্রা। আবার পাঁচ ঘণ্টা চাকরি। একটা সিগারেট খেয়েই ড্রাইভার চালাতে বসল।

সাত মাইল পথ কোথা দিয়ে পেরিয়ে এলুম মনে নেই। নদীর উপর নূতন পুলের গল্প শুনলুম। আর শুনলুম পাণ্ডব ফলসের গল্প। সাতনা যাবার পথে সেই সুন্দর জায়গাটি। বাস এক ঘণ্টা দাঁড়ায়। যাত্রীরা নেমে গিয়ে দেখে আসে। আমরা খাজুরাহোয় এসে নামলুম।

৩২

মিনতি যে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন আমরা তা বুঝতে পারি নি। আঁচল টেনে নিচে নেমেই বিরূপাক্ষকে কিছু বললেন। বিরূপাক্ষ চিন্তিত ভাবে তাকালেন চারি দিকে।

একেবারে মন্দিরের সামনে এসে বাস দাঁড়িয়েছিল। যাত্রীরা নেমেই একটা তাঁবুর দিকে ছুটলেন। সেখানে টিকিট বিক্রি হচ্ছে। টিকিট কেটে বিরাট এক প্রান্তরে ঢুকতে হবে। তার ভিতর ফুলের বাগান আর অনেক মন্দির। মিনতি আমার দিকে চেয়ে বললেন: আপনি এগোন ভাই, আমরা আসছি।

অভিমন্যু আমার কাছে ছিল, এবারে মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

বিরূপাক্ষ তাঁদের জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়েছিলেন, বললেন: হোটেলে একটা ঘর দেখি।

আমার জিনিস আমি বাস থেকে নামাই নি। ড্রাইভার দায়িত্ব নিতে রাজী ছিল না। বললুম: নিও না। ও হারালে আমার দুঃখ হবে না।

ডান হাতে যে খাবারের দোকানগুলো দেখতে পাচ্ছিলুম, তার পিছনেই নাকি একটি হোটেল আছে। বিরূপাক্ষরা সেই দিকে এগিয়ে গেলেন। আমাকে ডাকলেন না বলে আমি মন্দিরের দিকেই পা বাড়িয়ে দিলুম। টিকিট কাটলুম। তারপর মিশে গেলুম অন্য যাত্রীদের সঙ্গে।

এখানে গাইড দেখছি নে। মন্দিরের পরিচয় তার সামনেই লেখা আছে। কোন্‌টা কী মন্দির তা জানবার জন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন নেই। তবে তার জন্য কাছে যেতে হয়। আমি ছাতারপুরের সেই ভদ্রলোকের পরামর্শ মতো চৌষট্টি

যোগিনী মন্দির থেকেই পরিক্রমা শুরু করলুম। এই মন্দিরটির হদিস নেবার জন্য আমাকে একজনের সাহায্য নিতে হয়েছিল। সরোবরের নামটিও তাঁরই কাছে জেনেছিলুম। শিবসাগর হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে চৌষট যোগিনী মন্দির। আমার মনে হল, মন্দিরটি পুরোপুরি গ্র্যানাইট পাথরে তৈরি। দূর থেকে অন্যান্য মন্দির দেখে মনে হয়েছে যে সেগুলো হলদেটে বালিপাথরে তৈরি।

কানিংহাম সাহেব মনে করতেন, এটি কালী বা শিব মন্দির। মাঝখানের মূল মন্দিরটি এখন নেই। ছোট ছোট চৌষট্টিটি ঘরে এক সময় যোগিনীর সংখ্যা ছিল চৌষট্টি। এখন মাত্র তিনটি যোগিনী মূর্তি আছে। এইটিই সব চেয়ে প্রাচীন মন্দির বলে সকলের বিশ্বাস।

খানিকটা দূরে একটি ছোট শিবের মন্দির আছে। কিন্তু সেখানে আমি গেলুম না। একই রকমের এত মন্দির দেখতে পাচ্ছি যে সব দেখার লোভ হচ্ছে না। যাত্রীরা যেখানে ভিড় করে আছে, সেই কাণ্ডারিয় মহাদেবের মন্দিরে চলে এলুম। বাঁ দিকে আরও কয়েকটি মন্দির আছে, তা পরে দেখব।

বিরাট একটি জায়গা জুড়ে এই মন্দিরগুলো ছড়িয়ে আছে। লাল কাঁকরের পথ। স্থানে স্থানে ফুলের গাছ লাগানো হচ্ছে। এক সারি গোলাপ, কিংবা নানা রঙের বোগেনভিলা। মালিরা গাছের পরিচর্যা করছে। খাকী উর্দিপরা কিছু লোক বোধহয় মন্দিরের পাহারায় নিযুক্ত। রাস্তার ধারের একটা বড় গাছের নিচে থেকে এক ভদ্রলোক ছবি নেবার জন্য চেষ্টা করছিলেন। এক মহিলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বোধহয় বিরক্ত হচ্ছিলেন বিলম্বের জন্য।

কাণ্ডারিয় মহাদেবের মন্দিরটি এখানে সব চেয়ে বৃহৎ। দৈর্ঘ্যে ও উচ্চতায় এক শো ফুটের বেশি, প্রস্থে ছেষট্টি ফুট। পিছনের দিকটায় বাঁশ বেঁধে সংস্কারের কাজ পুরো দমে হচ্ছে। ভিৎটা এক

বড় যে নিচে দাঁড়িয়ে মন্দিরের কিছুই দেখা যায় না। এই রকমের ভিৎ শুধু এ মন্দিরে নয়, এখানকার সমস্ত মন্দিরেই আছে। অন্যত্র এমন দেখি নি। সিঁড়ি দিয়ে উঠে যে মন্দিরের দ্বার, সেই তোরণের উপর নানা দেবদেবীর মূর্তি, গায়ক বাদক কীর্তিমুখ মকর মিথুন। অর্ধমণ্ডপ ও মণ্ডপের ভিতরের ছাদও অপূর্ব শিল্পমণ্ডিত। গর্ভগৃহে তপস্যারত সন্ন্যাসীর চিত্র মকরাসীন গঙ্গা ও কূর্মাসীন যমুনা। মাঝখানে শিবের মর্মর লিঙ্গ।

মন্দিরের বহির্গাত্রেও মূর্তির শেষ নেই। সারির পরে সারি। কোনখানে অষ্ট দিকপালের মূর্তি, কোনখানে দেবদেবী নাগ নাগিনী অপ্সরা সুরসুন্দরী মিথুন ও শার্দূল। মহামণ্ডপের ব্র্যাকেটের উপর নারীমূর্তিগুলি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। যেমন ছন্দোময় দেহ, তেমনি ভাবময় মুখ। কারুকার্য নেই এমন একটি জায়গা অনেকক্ষণ ধরে খুঁজে আমি নিরাশ হলুম।

কাণ্ডারিয় মহাদেবের মন্দিরের পাশে জগদম্বী দেবীর মন্দির। এ দুয়ের মাঝে একটি ঐতিহাসিক শার্দূল আছে। মহাদেবের একটি মন্দির নাকি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। শুধু একটি মণ্ডপের নিচে এই শার্দূল। পিছনের পায়ে বসে সামনের পা দিয়ে একটি নারীর দু হাত ধরেছে। সেই রূপসী নারীও বসে তার দু হাত শার্দূলের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। দুজনে মুখোমুখি। শার্দূলের মুখে হিংসা নেই, নারীর মুখেও নেই ভয়। জগতে সমস্ত পুরুষ বুঝি এই রকম শার্দূল মূর্তিতে নারীকে অধিকার করতে চায়।

জগদম্বী দেবীর মন্দিরটি একদা বিষ্ণুর মন্দির ছিল বলে প্রত্নতাত্ত্বিকের বিশ্বাস। তার প্রমাণ নাকি গর্ভগৃহে প্রবেশের দরজায় অন্য মূর্তি। মন্দিরে এখন মকরবাহন গঙ্গা। তাতে কালি লেপে এখন কালী বলে পুজো করা হচ্ছে। এটি পঞ্চায়তন মন্দির ছিল, কিন্তু চারি দিকের ছোট মন্দির ভেঙে পড়ে গেছে। কারুকার্য কাণ্ডারিয় মহাদেবের মন্দিরের মতোই। তবে যাঁরা ছবি তুলবেন,

তাঁরা অষ্ট দিকপালের মধ্যে দক্ষিণের দেওয়ালে যমের, আর পশ্চিমে ত্রিমুখ অষ্টমুখ শিবের ছবি নিতে পারেন। যাঁরা এক বেলার জন্ত আসেন তাঁদের ছবি নেবার কষ্ট দেখে দুঃখ হয়। সূর্যের সঙ্গে যেন তাঁদের শত্রুতা। কোন দিকে সূর্য থেকে মূর্তির ছায়া ফেলেছে মূর্তির উপর, কোন দিকে সূর্য না থেকে অন্ধকারে রেখেছে ভাল কোন মূর্তি।

একে একে অনেকগুলো মন্দির দেখলুম। একটির সঙ্গে আর একটির মিল যত, অমিল তত নয়। অনেকগুলিই পূর্বমুখী। ভাল করে খুঁটিয়ে না দেখলে নূতন কিছু চোখে পড়ে না। চিত্রগুপ্তের মন্দিরকে ভরতজীর মন্দিরও বলে। কিন্তু মন্দিরের দেবতা হলেন সূর্য। পাঁচ ফুট লম্বা দেবতা পায়ে বুট পরে সাত ঘোড়ার রথে যাত্রা করেছেন। মন্দিরের বাহিরের চিত্রে কিছু বৈচিত্র্য আছে। এক দল মানুষ পাথর বইছে, হাতীর যুদ্ধ, শোভাযাত্রা, শিকার ও নৃত্যের দৃশ্য। মন্দিরের একাংশে বিষ্ণুর একটি মূর্তি, তার একাদশ মুখ, মাঝেরটি বিষ্ণুর আর দশটি দশ অবতারের।

দুশো গজ দূরে একটি চতুষ্কোণ সরোবর। তার নাম চোপরা ট্যাঙ্ক। এ নাম কেন হল সে সম্বন্ধে কোন কারণ খুঁজে পেলুম না। যাত্রীরাও কেউ জানেন না। শুনলুম গাইড বইএও কিছু লেখা নেই। এই সরোবরের মাঝে কয়েকটি স্তম্ভের উপর একটি গৃহ আছে। এক সময় হয় তো এটি চারতলা মন্দির ছিল, এখন ভেঙে পড়েছে। কোন্ দেবতার মন্দির ছিল, তাও আজ জানবার উপায় নেই।

উত্তরে আরও খানিকটা হাঁটলে বিশ্বনাথ ও নন্দীর মন্দির। এর পরে আর কোন মন্দির নেই। দক্ষিণে সিঁড়ির দু পাশে দুটো হাতী দেখতে পেলুম। উপরে উঠে দেখলুম, উত্তর থেকেও এমনি সিঁড়ি উঠেছে, তার দু পাশে দুটো সিংহ। মন্দিরও দুটো, বিশ্বনাথ ও নন্দীর মন্দির একেবারে মুখোমুখি।

বিশ্বনাথের মন্দির আমি প্রথমে দেখলুম। কাণ্ডারিয় মহাদেবের মন্দিরের সঙ্গে প্রভেদ শুধু আকারে। অনেক ছোট মন্দির। কিন্তু দেখতে প্রায় একই রকম। মন্দির গাত্রের মূর্তিগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার উৎসাহ ফুরিয়ে গেছে। কয়েক জন বিদেশী নরনারী বেপরোয়া ভাবে ছবি নিচ্ছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য করে আমি কয়েকটি সুন্দর মূর্তি দেখলুম। দক্ষিণের দেওয়ালে একটি নারী শিশুকে আদর করছে। উত্তরের দেওয়ালে একটি নারী বাঁশী বাজাচ্ছে। আর একজন ডান হাতে এক থোকা ফল ধরে আছে, তার বাম হাতে কব্জিতে একটি টিয়ে পাখী, সে হাতটি রেখেছে নিজের কোমরে।

নন্দীর মন্দিরে একটি বিরাট নন্দীর মূর্তি, ছ ফুট উঁচু, লম্বায় আরও বড় হবে। তার মসৃণ দেহ আলোয় ঝকঝক করছে।

এখান থেকে নেমে খানিকটা দক্ষিণ-পশ্চিমে যে মন্দিরে এসে উঠলুম, তার নাম পার্বতীর মন্দির। কিন্তু পার্বতীর কোন মূর্তি নেই। এক জায়গায় বিষ্ণুর মূর্তি দেখে অনেকে এটিকে বৈষ্ণব মন্দির বলেই মনে করেন। কিন্তু এখন মকরবাহন গঙ্গা দেবীরই পূজো হচ্ছে। এই মন্দিরকে পার্বতীর মন্দির কেন বলা হয় তার কোন যুক্তিই খুঁজে পেলুম না।

লক্ষ্মণের মন্দিরকে কেউ রামচন্দ্রের মন্দির, কেউ চতুর্ভুজ মন্দির বলেন, কেউ বা দেবী মন্দির বলেন। আসলে এটি বিষ্ণুর মন্দির ছিল। পঞ্চায়তন মন্দির। চারি দিকে চারটি ছোট মন্দির, পঞ্চমটি ছিল গরুড়ের। এখন আর সেটি নেই।

মাথার উপরে সূর্য তখন অগ্নি বর্ষণ করছেন। জঠরে ক্ষুধা। যত্ন করে মন্দির দেখার বাসনা ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে। এক নজরে ভিতরটা দেখে বেরিয়ে এলুম। দেওয়ালে লক্ষ্মীর মূর্তি দেখলুম শিব ও ব্রহ্মার মাঝখানে। তার উপরে নবগ্রহ। দরজায় সমুদ্র মন্থনের দৃশ্য। গর্ভ গৃহে ত্রিমুখ চতুর্ভুজ বিষ্ণুর মূর্তি। মাঝখানের মুখ মানুষের মতো, বাকি দুটি নরসিংহ ও বরাহের।

বাহিরে একটি নূতন ধরনের চিত্র দেখলুম। ছোট একটি মন্দিরের গাত্রে একজন গুরু শিষ্যদের বিদ্যাদানে বসেছেন। মূল মন্দিরে হাতী ও ঘোড়ার শোভাযাত্রা, যুদ্ধের দৃশ্য, নানা শস্ত্রে সজ্জিত সেনা। এ ছাড়াও আছে সূর্যপুত্র রেবন্ত অশ্বারোহণে শূকর শিকার করছেন। একজন পরিচারক তাঁর মাথায় ছত্র ধারণ করে আছে। শার্দুল ও নারী মূর্তি তো আছেই।

এর খুব কাছেই মতঙ্গেশ্বর মন্দির। উল্লেখযোগ্য কথা দেখতে কিছুই পাই নি, কিন্তু জানতে পেরেছি। খাজুরাহোর সমস্ত মন্দিরের ভিতর এইটিই নাকি সব চেয়ে পবিত্র মন্দির। এর সামনে বরাহের খোলা মন্দির। যাত্রীরা যাঁরা এইখানে পরিক্রমা শেষ করছেন, তাঁরা কেউ সিঁড়ি ভেঙে বরাহের মূর্তি দেখতে উঠছেন না। ক্লান্তিতে তাঁদের উৎসাহ ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু কাণ্ডারিয় মহাদেবের মন্দিরের দিকে তাকিয়ে আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না। মেরামতের জন্য যে সিঁড়ি বাঁধা হয়েছে, মনে হল এক বিদেশী ভদ্রলোক সেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেছেন। দূর থেকে ভাল দেখা যাচ্ছিল না। আমি তাড়াতাড়ি অনেকটা এগিয়ে গেলুম। আরও আশ্চর্য হলুম ভদ্রলোকের বয়স অনুমান করে। মাথার চুল তাঁর গোলাপী নয়, একেবারে সাদা। যে মহিলাটি নিচে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে কিছু দেখাচ্ছিলেন, তিনিও যথার্থ বৃদ্ধা। শুধু দেহে নয়, চলনেও খানিকটা শ্লথ ভাব এসেছে। কিন্তু দুজনেরই মন আছে শিশুর মতো সজীব। তা না হলে কয়েকখানা ছবির জন্য এমন দুঃসাহসের কাজ করতে পারতেন না।

কী ভাবছেন?

এ কি, আপনি!

পিছনে কণ্ঠস্বর শুনে আমি ফিরে দেখলুম, মিনতি হাসছেন। আমার চমকানি দেখে বললেন : ভয় পেলেন নাকি?

না না, ভয় নয়। ভেবেছিলুম, হোটেলে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব।

হাসতে হাসতেই মিনতি বললেন: তাও ভাল, হাসপাতালে দেখতে আসবেন বলেন নি।

অভিমন্যু কোথায়?

বাপের সঙ্গে মন্দির দেখছে।

আপনি বুঝি আজ দেখবেন না ভেবেছিলেন!

শুয়ে থাকতেও পারলাম না।

মিনতির শরীর সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করতে আমার সঙ্কোচ হল। বললুম: ওদের কাণ্ড দেখেছেন?

ওই বুড়ো সাহেবের কথা বলছেন!

না, তাঁর মেমসাহেবের কথা।

মেমসাহেব আবার কী করলেন?

আমাদের মেমসাহেবরা কি স্বামীকে এমন দুঃসাহসের কাজ করতে দিতেন! মাটিতে মাথা কুটে এতক্ষণ তাঁকে নামিয়ে আনতেন না!

মিনতি এক রকমের অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমার কৌতুক তিনি হালকা ভাবে নিতে পারলেন না। বললেন: আপনি ঠিকই বলেছেন। স্বামীদের আমরা এগিয়ে দিতে পারি নে, আমরা টেনে রাখি। এ দেশের মায়েরা শুধু ছেলেদের নয়, স্ত্রীরাও তাদের স্বামীদের আঁচল দিয়ে ঢেকে রেখেছে।

না না, আমি তা বলি নি।

আমি তাই বলছি। এ সত্যি কথা, একে গোপন করে লাভ কী!

জীবনের এ একটা অন্ধকার দিক। এ নিয়ে আলোচনা ভাল লাগে না। তাই বললুম: আসুন, একটা মন্দির দেখি।

মন্দির দেখা তো আপনার শেষ হয়ে গেছে। তার চেয়ে খাবার দোকানে চলুন। ওঁরাও এখুনি এসে পড়বেন।

সত্যি কথা। পায়ের নিচে এতক্ষণ ছায়া ছিল না,, এবারে খানিকটা ছায়া দেখছি। মধ্যাহ্নের সূর্য হেলেছে পশ্চিমের আকাশে। তাড়াতাড়ি ফিরে বললুম: অভিমন্যুর নিশ্চয়ই খুব ক্ষিধে পেয়েছে!

মিনতি হেসে বললেন: সবারই।

এই মুহূর্তে আমার মনে হল যে মিনতি এই জন্যেই হোটেল থেকে বেরিয়েছেন। স্বামি-পুত্রের ক্ষুধার সময় বুঝি ঘরের ভিতর শুয়ে থাকা চলে না। ওই বুড়ি মেমসাহেবও কি তাঁর সন্তান ও স্বামীর কথা এমনি করে ভাবেন!

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে চলবার পর মিনতি বললেন: আপনি ঠিকই বলেছেন। ভারতবর্ষ যদি কোন দিন স্পুটনিক তৈরি করে, আর একজন মানুষের দরকার হয় মহাশূন্যে পাঠাবার জন্যে, তা হলে লোক পাওয়া কঠিন হবে। যার বাপ মা নেই, ভাই বোন নেই, স্ত্রীপুত্র কন্যা আত্মীয়পরিজন কেউ কোথাও নেই, তেমনি এক জন মানুষ খুঁজে বার করতে হবে।

আমার বুকের ভিতরটা এক রকমের অদ্ভুত বেদনায় মুচড়ে উঠল। আমারই তো বাপ মা নেই, ভাই বোন নেই, স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয়-পরিজন কেউ কোথাও নেই। গভীর ভাবে বললুম: বেশি খুঁজতে হবে না।

কেন?

আমি এগিয়ে যাব।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস আমি চেপে গোপন করলুম। কিন্তু মিনতি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। একেবারে নিঃশব্দে এলেন খাবারের দোকান পর্যন্ত, তারপর বললেন: আমাকে আপনি ক্ষমা করুন।

আমি হাসবার চেষ্টা করে বললুম: আপনার অপরাধ কী!

না বুঝে আমি আপনাকে দুঃখ দিয়েছি।

এই কথা!

হাসি আমার কান্নার মতো দেখাল কিনা জানি নে, অভিমন্যু ছুটে এসে আমাকে রক্ষা করল। মায়ের হাত ধরে বলল: সেই থেকে তোমাকে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি।

মিনতি তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

গাছের নিচে খানকয়েক টেবিল পাতা। টেবিলের চারি ধারে কাঠের চেয়ার। নানা জনে নানা রকমের খাবার খাচ্ছে। বিরূপাক্ষ যে টেবিলে বসে ছিলেন সেখানেও কয়েক জন চা খাচ্ছিল। আমাদের দেখতে পেয়ে তারা উঠে গিয়ে একখানা দড়ির খাটিয়ায় বসল। আমরা তাদের জায়গায় জাঁকিয়ে বসলুম।

ভাত ডাল পাওয়া যায়, পুরি তরকারিও। ডালডার নয়, ঘিয়ের পুরি। শুধু মাছ মাংস নেই। তার জন্য কাছে একটা হোটেল আছে। ভাতের বদলে আমরা পুরি খেলুম, দই বা রাবড়ির বদলে খেলুম খানিকটা মালাই। একেবারে সাদাসিধে খাওয়া, কিন্তু বেশ তৃপ্তি হল।

একটু তফাতে একখানা টাঙ্গা দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়াটা ঘন ঘন মাটিতে পা ঘষছে। বোধহয় অনেকক্ষণ দৌড়য় নি। টাঙ্গা-ওয়ালাকে কিন্তু তার গদিতে দেখলুম না। বিরূপাক্ষ বললেন: ছাতারপুরের সেই টাঙ্গা।

মিনতি হেসে উঠলেন।

হাসলে যে?

ছাতারপুরের টাঙ্গা নয়, ছাতারপুরের ভদ্রলোক যে টাঙ্গার কথা বলেছিলেন—

ওই হল, অতক্ষণ ধরে বলতে গেলে সিগনালে ট্রেন আটকে যাবে।

বিরূপাক্ষর চাকরির কথা মনে পড়ল। কিন্তু আমি কিছু বলবার

আগে তিনিই আবার বললেন : মিথ্যে বলছি না। ট্রেন পাসিঙের আইন-কানুন সব মানতে হলে ট্রেন আর চলবে না। সব দাঁড়িয়ে থাকবে।

কিন্তু আইন-কানুন না মানার জন্যেই নাকি দুর্ঘটনা ঘটছে!

মানলেও ঘটত। আইন না মানলে মুখোমুখি ঠোকাঠুকি হয়, কিন্তু সে আর কটা হচ্ছে! বেশির ভাগই তো দেখছেন চলতে চলতে গড়িয়ে পড়ছে।

তা ঠিক।

আমাদের অপ্রাসঙ্গিক কথা আর বেশি দূর এগোল না। টাঙ্গাওয়ালা এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল : টাঙ্গা চাই বাবু?

বিরূপাক্ষ মিনতির দিকে তাকিয়ে বললেন : টাঙ্গা! না, চাই নে। এ বেলা আমরা বিশ্রাম করব।

মিনতি বললেন : গোপালবাবু তো দেখবেন!

বিরূপাক্ষ বললেন : এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হবে গোপালবাবু, একটা রাত থেকেই যান না!

হেসে বললুম : যাত্রা এক হলে থাকতেই হত।

মিনতি বললেন : এক যাত্রাতেও যে পৃথক ফল হয়ে গেছে।

মিনতি যে স্বাতিদের কথা বলছেন, তা বুঝতে কষ্ট হল না। বললুম : সেখানেও এক যাত্রা নয়। চলুন, আপনাদের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে ও-ধারটা আমি দেখে আসি।

ও-ধার মানে ঈস্টার্ণ গ্রুপ। পাকা সড়ক ধরে না গিয়ে ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে যাত্রীরা পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন। আমিও তাঁদের অনুসরণ করে এগিয়ে গেলুম।

৩৩

ছোট একখানি গ্রাম। এই গ্রামেরই নাম খাজুরাহো। একদা হয়তো অনেক খেজুর গাছ এই গ্রামে ছিল, তাই তার নাম খাজুরাহো। খেজুর গাছ আজও আছে, যেমন আর দশটা গ্রামে। আবার খেজুরের সঙ্গে খাজুরাহোর কোন মিল না থাকতেও পারে।

এই দিকে তিনটি হিন্দু ও তিনটি জৈন মন্দির। এক দিকে ব্রহ্মা বামন ও জবারি, খানিকটা দূরে ঘণ্টাই, আদিনাথ ও পার্শ্বনাথ। যাত্রীদের অনেকে একটা হনুমানের বিরাট মূর্তি দেখেছেন। তাই নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। একটা শিলালিপিতে নাকি ৯২২ খ্রীষ্টাব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। তা হর্ষের যুগ। কাজেই খাজুরাহোর সেইটেই সব চেয়ে প্রাচীন শিলালিপি।

খাজুরাহো সাগর নামে একটি সরোবরের তীরে ব্রহ্মার মন্দির। মন্দিরে কিন্তু ব্রহ্মার মূর্তি নয়, শিবের চতুর্মুখ লিঙ্গ। বামনের মন্দিরে অবশ্য বিষ্ণুর বামন অবতারের মূর্তি। মন্দিরটি দেখতে জগদম্বী ও চিত্রগুপ্তের মন্দিরের মতো, কিছু বড়। ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বুদ্ধের একটি মূর্তি দেখলুম। আর দেখলুম সস্ত্রীক ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে আর হরপার্বতীর বিবাহ। জবারির মন্দিরে বিষ্ণুর চতুর্ভুজ মূর্তি।

জৈন মন্দিরের সঙ্গে হিন্দু মন্দিরের বিশেষ পার্থক্য নেই। যা আছে তা নিজে লক্ষ্য করা যায় না, কোন বিশেষজ্ঞকে ডেকে বুঝে নেবার দরকার। মন্দিরের গায়েও হিন্দু দেবদেবীর চিত্র।

একটি মন্দিরের নাম ঘণ্টাই কেন হল, তা বুঝতে দেরি হল না। স্তম্ভগুলির গায়ে শিকল বাঁধা ঘণ্টার নক্সা। কানিংহাম সাহেব

এটিকে প্রথমে বৌদ্ধ মন্দির মনে করেছিলেন। বাহিরে একটা বিরাট বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। সেটি এখন এখানকার জাতুঘরে আছে। তারপরে যখন মন্দিরের ভিতরে অনেক দিগম্বর মূর্তি দেখা গেল, তখন এটিকে জৈন মন্দির বলে স্বীকার করতে তাঁর দ্বিধা হল না।

এরই দক্ষিণে নূতন ও পুরাতন অনেকগুলি জৈন মন্দির। উত্তাপে ও শ্রান্তিতে দেখবার বাসনা তখন ফুরিয়ে এসেছে। তবু কোন রকমে ঘুরে ঘুরে কিছু দেখলুম। আদিনাথ ও শক্তিনাথের মন্দিরে উল্লেখযোগ্য কিছু না দেখলেও পার্শ্বনাথের মন্দিরটি উপেক্ষা করবার উপায় নেই। মনে হয় জৈন মন্দিরের এইটিই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মন্দির গাত্রে অপ্সরার মূর্তিগুলি সত্যিই অপূর্ব। দক্ষিণের দেওয়ালে কয়েকটি নারীর মূর্তি আছে, প্রসাধনরত নারী, নারীর পত্রলিখন, হেঁট হয়ে কাঁটা তুলছে, আদর করছে শিশুকে। বইএ এ সমস্ত ছবি দেখেছি।

দক্ষিণ গ্রুপের মন্দির দেখবার উৎসাহ আর ছিল না। শুনলুম যে সেখানে তুলাদেও শিবের মন্দির আর চতুর্ভুজ বিষ্ণুর মন্দির আছে। বিষ্ণুর মূর্তি নাকি ন ফুট উঁচু। আরও অনেক যাত্রীর সঙ্গে আমরা জাতুঘরের কাছে ফিরে এলুম।

কোন গৃহের ভিতর এ জাতুঘর নয়। দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একটা খোলা জায়গায় অপূর্ব কারুকার্য করা প্রবেশের দ্বার। গাছের ছায়া সেখানে মায়া ঘনিয়ে রেখেছে। কোন টিকিট কেটে এই জাতুঘরে ঢুকতে হয় না, দক্ষিণা দিতে হয় ভিতরের ছবি তোলবার জন্য। একজন প্রহরী দ্বারের পাশে বসে ছাপা ছবি আর বই বিক্রি করছে। অলস ভাবে যাত্রীরা যাতায়াত করছে দ্বার দিয়ে।

ভিতরে ঢুকে দেখলুম, সেখানে সারি সারি পাথরের মূর্তি। এই মুলুকে যা কিছু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল, সব এখানে যত্ন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বুদ্ধের সেই বিরাট কালো মূর্তিটিও দেখলুম।

মাথার উপরে সূর্য যদি আগুন বর্ষণ না করতেন, তা হলে হয়তো মনোযোগ দিয়ে দেখতে ইচ্ছে হত। এখন ইচ্ছে হল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসবার। বাহিরে ছায়ার বুঝি অনেক বেশি আকর্ষণ।

কিন্তু দ্বারের সামনে এসে চমকে উঠলুম। গাছের ছায়ায় কে আঁচল দুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্বাতি নাকি! না, স্বাতি নয়, মিনতিও নয়। এ আর কোন মেয়ে। ও-ধারের মন্দির থেকে বেরিয়ে আগে এখানে পৌঁছেছে। সঙ্গীরা এখনও এসে পৌঁছয় নি। নিঃসঙ্গ যাত্রী।

কিন্তু স্বাতির কথা আমার কেন মনে এল! বম্বেতে স্বাতি কি এখন একজন সঙ্গীর অপেক্ষায় এমনি করে দাঁড়িয়ে আছে! না না, তা কেন থাকবে! জো রায় তো সারা দিন সবাইকে সঙ্গ দেবেন। তবে কি আমি স্বাতিকে কোন দিন এমনি করে অপেক্ষা করতে দেখেছি! মনে পড়ছে না।

আমার বাস ছাড়তে এখনও দেরি আছে। কোন গাছের ছায়ায় আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। মিনতিদের হোটেলে গিয়ে তাদের বিশ্রামে ব্যাঘাত করতে আমি চাই নে। আবার গিয়ে আমি মন্দিরের এলাকায় ঢুকলুম। একটা গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়লুম সবুজ ঘাসের উপর। ঘুম এল না, কিন্তু জেগে জেগে অনেক স্বপ্ন দেখলুম।

এই তো গত পুজোয় আমরা দক্ষিণ ভারত দেখতে বেরিয়ে ছিলুম। এক সঙ্গে সমুদ্র দেখেছি, মন্দির দেখেছি, অজন্তার গুহা দেখেছি। মন ভরেছে, মন ভরিয়ে দিয়েছে স্বাতি। হৃদয় ভরা ঐশ্বর্য নিয়ে আমি দেশে ফিরেছি।

কন্যাকুমারীর সাগর বেলায় নয়, সোমনাথের সমুদ্র তীরেও নয়, এমনি এক উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে আমরা অজন্তা গুহার নিচে একটা ঝরনার ধারে বসে ছিলুম। একটুখানি ছায়ায় একটা বড় পাথরের উপর স্বাতি বসেছিল। তারপর ডেকেছিল আমাকে। সঙ্কীর্ণ স্থান। তবু তার নিমন্ত্রণ ছিল অন্তরঙ্গ। আমাকে ইতস্তত করতে দেখে

নিজের হাতটাই বাড়িয়ে দিয়েছিল। আর দ্বিধা করা চলে নি। আমি এসে ঘেঁষে বসেছিলুম।

সেদিনের সব কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে। দু একজন মানুষকে দেখা যাচ্ছিল কাছে ও দূরে। কে লক্ষ্য করছে, আর কে করছে না, তা আমরা দেখলুম না। পৃথিবীতে আমাদেরও একটা অধিকার আছে, সে অধিকার থেকে নিজেদের কেন বঞ্চিত করব!

নদীর উপর দিয়ে গাছের নিচে দিয়ে পাহাড়ের ছায়ায় হাওয়া বইছিল। এখানকার মতো রৌদ্রের উত্তাপ ছিল না এতটুকু, ছিল একটু নেশার মতো শিরশিরে শীত। স্বাতি তার শাড়ির আঁচল এক হাতে চেপে রেখেছিল, ছেড়ে দিলে বোধহয় ছোঁয়াছুয়ি হয়ে যাবে।

স্বাতি চুপ করে ছিল, আর আমি ভাবছিলুম কী ভাবব। ভাববার মতো কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। হিউএন চাঙের কথা ভাবব! ফা হিয়েন! ভারতবর্ষের কোথায় তারা যান নি! দুঃসাহসী ছিল তাঁদের ভ্রমণের পথ।

কী আশ্চর্য! এই কথাটি যেন কোথায় আমি পড়েছিলুম। 'দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে'। কোথায় পড়েছি, সহসা মনে পড়ছিল না।

স্বাতি হঠাৎ প্রশ্ন করেছিল, কী ভাবছ?

একটি কবিতার লাইন মনে পড়েছে। ভাবছি, কোথায় পড়েছি।

বল।

দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে—

স্বাতি হেসে বলেছিল, এই কবিতা তোমার এখানে কেন মনে এল?

তা তো জানি না।

স্বাতি হেসে বলেছিল—

তুলে নিল দ্রুত রথে
দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এ যে শেষের কবিতা। পরের লাইনটি সে বলে নি। অকস্মাৎ থেমে গিয়েছিল। এত কাছাকাছি বসে বুঝি বলা যায় না—তোমা হতে বহু দূরে।

এই মুহূর্তে আমার মন একটা স্বপ্নময় অতীতের পরিক্রমা করে এল। মন হল থমথমে, যেন নেশা ধরেছে। বলতে ইচ্ছা হয়েছিল—

আমার শূন্যতা তুমি পূর্ণ করি দিয়েছ আপনি।

কিন্তু এই আমিটা কে! গরিব বাংলার একটা ভবঘুরে বাউণ্ডুলে ছেলে বই তো আর কিছু নয়! আমার সমাজ কী! আমার পরিচয় কী! কিসের আমার মর্যাদা! কত দেশ তো ঘুরে ঘুরে দেখলুম, কত কীর্তি, কত নরনারী। এ সব আমার দেশের ভেবে বুক হয়তো ভরে উঠেছে, কিন্তু আমাকে নিয়ে বুক ভরেছে কার! আমার মূল্য যে মাপা হয়েছে চাঁদির টাকায়, চাঁদের জ্যোৎস্নায় নয়। এত সহজে আমার নেশা হলে চলবে কেন! নিজেকে আমি সামলে নিয়েছিলুম।

স্বাতি হঠাৎ আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার নিজের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নেই? কোন কৌতূহল?

কী আশ্চর্য! স্বাতিও কি আজ আমারই মতো ভাবছে! বলেছিলুম, ভুলে থাকি। প্রয়োজন হয় না বলেই বোধহয় মনে পড়ে না।

ভারতের অর্ধেকটা আমরা দেখে নিলাম, কিন্তু জীবনের কিছুটাও কি দেখতে পেয়েছি?

জীবনটা যদি জগতের মতো খোলামেলা হত, নিশ্চয়ই দেখতে পেতুম। সেটা সংকীর্ণ বলেই এত অন্ধকার।

আমি কেন সঙ্কীর্ণ ভাবতে পারি নে! কেন আমি আলো-হাওয়ার মতো জীবনকেও ছড়িয়ে দিতে চাই! এত দেখেও কি আমাদের মুক্তি হবে না?

আমি তাকে চেতনার জগতে ফিরিয়ে আনতে পারি নি।

স্বাতি বলেছিল, সত্যি বল তো, আমরাও কি বেরোতে পারি না দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে? যেমন—

কথাটা সে শেষ করতে পারে নি। তার কি সেই অন্ধকার গুহার প্রাণবন্ত মানুষ দুটির কথা মনে পড়েছে! সেই ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ নরনারীর কথা! এখানেও যে আমরা বড় কাছাকাছি বসে আছি। শুধু তো সৌরভ নয়, মনের উত্তাপও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তাদের মতো দুঃসাহস আমাদের কোথায়!

দূরে সেই দুঃসাহসীদের আমরা দেখতে পেয়েছিলুম। তারাও এই দিকে নেমে আসছিল! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তাদের দেখা হয়ে গেল! না, আমরাই এখানে অনেকক্ষণ বসে আছি! দেখতে আর কতটুকু সময় লাগে! সময় লাগে তো জানতে। মানুষকে জানতেই সব চেয়ে বেশি সময় দরকার। এক দিনে জানা যায় না, এক জীবনেও হয়তো বাকি থেকে যায়। মানুষের জীবন যে অনেক সঙ্কোচ দিয়ে, অনেক সংস্কার দিয়ে, অনেক অসত্য দিয়ে ঢাকা। তাইতেই বুঝি হাত বাড়িয়ে স্বাতির উত্তর দিতে পারলুম না, তাই চল।

সে বড় নাটকীয় হত। বর্তমান শতাব্দীর শিক্ষিত মানুষের মতো সভ্য হত না। তাই আমি কবিতায় তার উত্তর দিয়েছিলুম, আমি তো গরিব যাযাবর।—

তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান;
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।

স্বাতির ঋণ আমার আজও শোধ হয় নি।

এ কি, ঘুমোচ্ছেন নাকি?

মিনতির কণ্ঠস্বর শুনে আমি চমকে উঠে বসলুম। শুধু মিনতি নয়, অভিমন্যুকে নিয়ে বিরূপাক্ষও এসেছেন। বললেন: আপনার বাস যে ছেড়ে যাচ্ছে!

তাই নাকি।

আমি লজ্জা পেয়েছিলুম। তাই দেখে বিরূপাক্ষ বললেন: ভেবেছিলুম আপনাকে জাগাব না। কিন্তু মিনতি মানল না।

তাঁদের সঙ্গে মোটরবাসের দিকে আসতে আসতে মনে হল যে বিদায়ের কথা মেয়েরাই মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু মিলনের কথা কে শোনায় জানি নে।

বাসে উঠবার সময় অভিমন্যু বলল: মামা আমাদের ছেড়ে যাবে না?

মিনতি বললেন: আবার কবে দেখা হবে ভাই?

বিরূপাক্ষ বললেন: পথের পরিচয় পথেই যেন শেষ হয় না ভায়া।

কণ্ঠ আমার বাষ্পে গেল ভরে। আমি কোন উত্তর দিতে পারলুম না। শুধু মাথা নেড়ে তাদের স্নেহের আদেশ আমি মেনে নিলুম। বাস ছেড়ে দিল।

বম্বেতে স্বাতিও আমায় এমনি করে বিদায় দিয়েছিল। মিনতিরা যেমন ডেকে আমাকে সঙ্গী করেছে, স্বাতিরাও তেমনি আমায় কলকাতা থেকে ডেকে এনেছিল। এক সঙ্গে ফিরলেও কোন ক্ষতি ছিল না। তবু তারা আমায় বিদায় দিল। জীবনের নিঃসঙ্গতা এরা বারে বারে আমায় মনে করিয়ে দিচ্ছে।

ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনের জনবহুল প্ল্যাটফর্মে মামা মামী দাঁড়িয়ে ছিলেন। ট্রেন ছাড়বার আগের মুহূর্তে আমি তাঁদের প্রণাম করলুম। স্বাতি আমার পাশে পাশে এগিয়ে গাড়ির দরজার কাছে চলে এল, তারপর প্রণাম করল পায়ে হাত দিয়ে। সঙ্কোচে আমি দূরে সরে গিয়েছিলুম, আর মুখ তুলে স্বাতি হেসেছিল। এমন সুন্দর হাসি আমি অনেক দিন দেখি নি। কিন্তু আনন্দের বদলে মন আমার বেদনায় ভরে গেল। বড় অসহায় মনে হল নিজেকে।

ট্রেনের শেষ ঘণ্টা পড়ল ঢং ঢং করে, গার্ডের বাঁশি বাজল। সেই সঙ্গে স্বাতির কথাও শুনতে পেয়েছিলুম : নিজের ঐশ্বর্যের কথা তুমি জানো না গোপালদা, তাই এমন ভয় পাও। তোমার সম্পত্তি কি কেনা হয়ে যায় নি!

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল। হাতল ধরে আমি উঠে পড়েছিলুম। তারপরে ফিরে দেখেছিলুম স্বাতিকে। স্বাতিও সরে দাঁড়িয়েছে। তার দু চোখের দৃষ্টি বাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই আমি তার কথা ভুল শুনি নি। আমার অতীত আর বর্তমানে একটা কঠিন জট পাকিয়ে ভবিষ্যৎকে চেপে ধরতে চাইছিল।

আর আমার কোন ভয় থাকা উচিত নয়। জো রায়ের সঙ্গে সে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াক। তার মন নিশ্চয়ই আমার মনে বাঁধা পড়ে গেছে। জগতের সেরা সম্পদ আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। হোক কথা, হোক কল্পনা, জীবনের চেয়ে স্বপ্নেই যে সুখ বেশি। সে সুখ আমি পেয়েছি। প্রসন্ন হাসি দিয়ে স্বাতির উত্তর আমি দিয়ে এসেছি।

অবন্তী পর্ব সমাপ্ত

রম্যাণি বীক্ষ্য

মানুষের নূতন দেশ দেখার বাসনা কতকটা নেশার মতো। কেউ সে সুযোগ পান, কেউ পান না। কিন্তু শখ সবারই সমান। যাঁরা ভ্রমণ করেন, তাঁদের একটা সঙ্গীর দরকার, যে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এর জন্য ভ্রমণকাহিনীই সবচেয়ে ভাল সঙ্গী। আর যাঁরা বাড়িতে বসে ভ্রমণের আনন্দ পেতে চান, তাঁদের কাছেও ভ্রমণকাহিনী অপরিহার্য। এদের সবার জন্য লেখা হয়েছে রম্যাণি বীক্ষ্য। পর্বে পর্বে এই গ্রন্থ রচনা করে লেখক শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী শুধু রবীন্দ্র-পুরস্কারেই সম্মানিত হন নি, গত কয়েক বৎসরে বাঙলার ভ্রমণ-সাহিত্যকে অভাবনীয় রূপে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

রম্যাণি বীক্ষ্য নামটি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলমের একটি শ্লোকের প্রথমাংশ। রবীন্দ্রনাথ এর অনুবাদ করেছেন 'সুন্দর নেহারি'। তার মানে, নানা রম্য স্থান প্রত্যক্ষ করে মনে যে ভাব এল, তারই অভিব্যক্তি এই রচনায়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে যা কিছু মনোরম দ্রষ্টব্য স্থান আছে, সাবলীল ভাষায় ও মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থকার এক ধারাবাহিক ভারত-দর্শনের কাহিনী পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। এই গ্রন্থে ভারতের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়ই শুধু নয়, বর্তমানের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আলোচনাও আছে। তীর্থ-মাহাত্ম্যের পৌরাণিক বিবরণ দিতে গিয়ে বিদগ্ধ গ্রন্থকার মন্দির-স্থাপত্য ও তার কিংবদন্তী জনশ্রুতিকেও আলোচনার বলয়ের মধ্যে টেনে এনেছেন। এতে নূতন ও পুরাতন কাল মিলিয়ে ভারতের একটি সামগ্রিক রূপ পাঠকের দৃষ্টির সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

কিন্তু শুধু মাত্র ভ্রমণ-বিবরণই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য নয়। ভ্রমণ-কাহিনীর সঙ্গে একটি জীবন-ঘনিষ্ঠ কাহিনীও বইগুলির ভিতর এক অপূর্ব স্বাদের সঞ্চার করেছে। ভ্রমণে যাঁরা উৎসাহী নন, জীবনে যাঁরা শুধু প্রাণরসেরই সন্ধানী, উপন্যাসের রসের আকর্ষণে তাঁরাও এই গ্রন্থের প্রতিটি পর্ব সাগ্রহে পাঠ করবেন। ভ্রমণ-রসসিক্ত উপন্যাস অথবা উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ—এই দুই নামেই বইগুলিকে অভিহিত করা চলে।

ধনী মামা অঘোর গোস্বামী তাঁর স্ত্রী ও অনূঢ়া কন্যা স্বাতিকে নিয়ে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের জন্য হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরতে এসেছেন। এই সময় প্ল্যাটফর্মে অপ্রত্যাশিত ভাবে এক পাতানো ভাগনে গোপালের সঙ্গে দেখা। গোপাল লোকাল ট্রেনের যাত্রী, কেরানীর কাজ করে কলকাতায়। মার্জিত রুচি ও শিক্ষায় তার আত্মপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত। মামা-মামী তাকে সঙ্গী হবার

অনুরোধ জানালেন, আর স্বাতির দৃষ্টিতে গোপাল আবিষ্কার করল এক আন্তরিক আবেদন। চলতি ট্রেনে তাকে উঠে পড়তে হল।

প্রথম গ্রন্থ অন্ধ্র পর্বে ভ্রমণের অবকাশে স্বাতি ও গোপাল এল দুজনের কাছাকাছি। গোপালের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও বিদ্যাবত্তায় ,স্বাতি প্রথম থেকেই মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু সমাজ ও মনের দুরকম প্রয়োজনে স্বাতির চরিত্র হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট। ওয়ালটেয়ার ও সীমাচলমে, বিজয়ওয়াড়া ও মঙ্গলগিরিতে, অমরাবতী নাগার্জুন সাগর ও তিরুপতিতে আমরা দুজনকে দেখি পাশাপাশি।

তামিল পর্বে তারা একত্র আছে—মাদ্রাজ মহাবলীপুরম ও পক্ষীতীর্থে, কাঞ্চীপুর ও তাঞ্জোরে, ত্রিচিনপল্লী ও মাদুরায়, ধনুষ্কোডি রামেশ্বর ও তিরুচেন্দুরে। তারপর কন্যাকুমারীতে এসে দেখি যে অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মোহনের মধ্যে স্বাতি ও গোপাল বিবেকানন্দ শিলাকে সাক্ষী রেখে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছে নীরবে।

তারপর কেরল পর্বে তাদের ঘরে ফেরার পালা। কন্যাকুমারী থেকে ত্রিবেন্দ্রাম, বর্কলা, পেরিয়ার স্যাঙ্কচুয়ারি। যমজ শহর এর্ণকুলম কোচিন থেকে ত্রিচুর গুরুভায়ুর। সেখান থেকে কালিকটে সমুদ্র দেখে নীলগিরি পাহাড়।

কর্ণাট পর্ব শুরু হয়েছে উটাকামণ্ডে। সেখান থেকে কর্ণাটক রাজ্য। হালেবিড বেলুর ও শ্রবণবেলগোলার প্রাচীন নিদর্শন দেখে তারা এল হায়দ্রাবাদে। ইলোরা ও অজন্তার গুহামন্দিরে এই পর্বের পরিসমাপ্তি।

তারপর গোপালকে দেখা গেল দিল্লী মথুরা বৃন্দাবন ও আগ্রায় ভ্রমণরত। এই বিবরণ সংকলিত হয়েছে কালিন্দী পর্বে। গোপালের পৌরুষ ও নির্লোভ ব্যক্তিত্বের এক আশ্চর্য চিত্র, আর স্বাতির আপাত-পরিহাসপ্রিয়তার অন্তরালে গভীর আত্মমর্যাদাবোধের আন্তরিক পরিচয়।

দিল্লীতে রাণা ব্যানার্জীর সঙ্গে মামী মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তারই পরিণতি দেখি রাজস্থান পর্বে। দিল্লী থেকে জয়পুর আজমের পুষ্কর চিতোর উদয়পুর দেখে তাঁরা আবু রোডে এলেন। সেখানে রাণার বোন মিত্রা এল তার প্রেমিক চাওলার সঙ্গে, কিন্তু রাণা এল না। মামী আহত হলেন, কিন্তু দুঃখ পেলেন না মামা।

রাজস্থান থেকে সৌরাষ্ট্র। এই অঞ্চলের কথা আছে সৌরাষ্ট্র পর্বে। দ্বারকা থেকে বেট দ্বারকা যাবার পথে রঙ্গমঞ্চে এল জো রায়। এই বিত্তবান যুবককে দেখে মামীর অপত্য স্নেহ আবার নূতন করে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। সোমনাথের পথে তিনি স্বাতিকে এরই হাতে সমর্পণ করবেন বলে কৃতসংকল্প হলেন।

জো রায়ের কাহিনী সৌরাষ্ট্র পর্বেই শেষ হয় নি। পরবর্তী গ্রন্থ কোঙ্কণ পর্বেও তা টানা হয়েছে। বম্বেতে জো রায় যখন স্বাতির সঙ্গলাভে সমুৎসুক,

সে তখন গোপালের সঙ্গে পুনা ও গোয়া ভ্রমণে ব্যস্ত। গুজরাতের আমেদাবাদ থেকে গোয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ কোঙ্কণ উপকূলের কথা এই পর্বে বিবৃত হয়েছে।

তারপর সবাইকে পরিত্যাগ করে গোপাল একা দেশে ফিরল। পথে দেখল মধ্য ভারতের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি—ধারা মাণ্ডু ইন্দোর ও উজ্জয়িনী, সাঁচী ভোপাল বিদিশা ও খাজুরাহো। এই কাহিনী পাওয়া যাবে **অবন্তী পর্বে।**

পরবর্তী তিনটি পর্বে সাক্ষাৎভাবে মামা মামী ও স্বাতির কথা নেই। তবে স্মৃতিচারণের খিড়কি পথে তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে মুহুর্মুহু। **উৎকল পর্বে** পুরীর সমুদ্রবেলায়, ভুবনেশ্বরে ও কোনারকে গোপাল খাতার মধ্যে স্বাতিকে প্রত্যক্ষ করেছে। **মগধ পর্বে** শীলা নিয়েছে নায়িকার ভূমিকা এবং সমগ্র দক্ষিণ বিহার ভ্রমণ করেছে এক সঙ্গে। তারপর আবার মিলিত হয়েছে পাটনা ও গয়ায়। ভারতের প্রাচীনতম রাজ্য মগধের কথায় আধুনিক বিহারের কথাও এসে পড়েছে। আর **কোশল পর্বে** বর্ণিত হয়েছে কাশী থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর ভারতের প্রসঙ্গ। বারাণসী ও হরিদ্বারে গোপাল সাবিত্রীকে বলেছে স্বাতির কথা। মসুরিতে চাওলা ও মিত্রার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। গোপালকে তারা দিয়েছে নূতন জীবনের প্রেরণা।

হিমাচল পর্বে গোপাল আবার মামা মামী ও স্বাতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সিমলায় অমৃতসরে ও কাংড়া উপত্যকায় ভ্রমণের অবকাশে আমরা দুজনের মুখেই শুনি জীবনের জয়গান। কিন্তু অপরূপ সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হিমাচল প্রদেশে এই ভ্রমণ শেষ হয় নি। পাঠানকোট থেকে সবাই জম্মুর পথে কাশ্মীর গেছেন, যে কাশ্মীর দেখে আবুল ফজল বলেছিলেন হামেশা বাহারের দেশ, আর জাহাঙ্গীর বাদশাহ বলেছিলেন ভূস্বর্গ। শ্রীনগরের পর্বত-বেষ্টিত লেক ও হাউস বোটে তার আকর্ষণ সীমাবদ্ধ নয়। ঝিলমের তীরে তীরে, গুলমার্গ ও পহলগামের পাহাড়ে, সোনমার্গের হিমবাহে, উলারে, মোগল উদ্যানগুলিতে—সর্বত্র তার সৌন্দর্যের বিজ্ঞাপন। এক দিকে অবন্তীপুর ও মার্তণ্ড মন্দিরে কাশ্মীরের অস্পষ্ট অতীত, অন্য দিকে ক্ষীরভবানী ও অমরনাথে তীর্থযাত্রীর সমারোহ। উত্তরে বিচিত্র দেশ লাদাখ ও দক্ষিণে ডোগরা রাজ্য জম্মুকে নিয়ে আজকের কাশ্মীর সারা বিশ্বের বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। **কাশ্মীর পর্বে** এই রাজ্যের যাবতীয় কথা বিবৃত হয়েছে।

কামরূপ পর্বে সমগ্র আসামের পরিচয় পাওয়া যাবে। শুধু তন্ত্রমন্ত্রের দেশ কামরূপ কামাখ্যা নয়, শুধু শিলঙ আর চেরাপুঞ্জি পাহাড় নয়, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় কোচ ও অহোম রাজাদের সভ্যতার কথাও জানা যাবে, আর জানা যাবে অরুণাচল নাগাল্যাণ্ড ও মণিপুরের কথা এবং এই স্বল্পপরিচিত দেশের বিচিত্র অধিবাসীদের আশ্চর্য পরিচয়।

এর পরে **গৌড় পর্বের** যবনিকা উঠেছে নাটকীয় পরিবেশে। মোটর

দুর্ঘটনায় আহত হয়ে গোপাল দার্জিলিঙের হাসপাতালে। দিল্লী থেকে স্বাতি এসেছে উড়ো জাহাজে। তারপর দুজনে দেখেছে দার্জিলিং কালিম্পঙ ও গ্যাংটক। হিমালয়ের প্রসঙ্গ অপরূপ বর্ণনায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে। কথা প্রসঙ্গে এসেছে পূর্ববঙ্গ ও ত্রিপুরার বিবরণ। প্রাচীন ও আধুনিক গৌড়ের কথা সম্পূর্ণ হয়েছে মালদহে এসে।

ভাগীরথী পর্বে পশ্চিম বাঙলার কথা। রাজধানী কলকাতা যে কত বিচিত্র, নিজের চোখে দুবেলা দেখেও তা জানা যায় না। আর কলকাতাই পশ্চিম বাঙলার সব নয়। বিস্মৃত-প্রায় তাম্রলিপ্ত সপ্তগ্রাম ও কর্ণসুবর্ণ, মুর্শিদাবাদ ও বিষ্ণুপুর, রাঢ় দেশ ও শান্তিনিকেতন, দীঘা গঙ্গাসাগর ও সুন্দরবন—সব দেখা হতে না হতেই মামা মামী এলেন দিল্লী থেকে। স্বাতি ও গোপাল তখন মন্ত্রোচ্চারণ শুনছে : ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব···

এর পরে **হিমালয় পর্ব**। কাশ্মীর ও হিমাচলেই তো হিমালয়ের শেষ নয়, উত্তরাখণ্ড নেপাল সিকিম ও ভুটান ছাড়িয়ে অরুণাচলের শেষ প্রান্তে পরশুরাম কুণ্ড পর্যন্ত এই হিলালয় তার বিশাল মহিমায় সুবিস্তৃত। উত্তরাখণ্ড হল হিমালয়ের হৃৎপিণ্ড। শত সহস্র যাত্রীর প্রণামে নন্দিত কেদার-বদরীর পথে এসেছে স্বাতি ও গোপাল।

কিন্তু রম্যাণি বীক্ষ্যের শেষ হয় নি। অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের পর যেমন খিলপর্ব হরিবংশ, তেমনি রম্যাণি বীক্ষ্যর উনবিংশ পর্ব **মরুভারত**। ভারতবর্ষের বিখ্যাত থর মরুভূমি দেখছে স্বাতি ও গোপাল—বিকানের থেকে যোধপুর ও জয়সলমের, তারপর আরব সাগরের তীরে মরুরাজ্য কচ্ছ। উদ্বাস্তু সিন্ধীরা সেখানে নূতন উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। মরুভারত পর্বে শুধু মরুবাসী রাজস্থানীর কথা নয়, কচ্ছী ও সিন্ধীদের কথাও জানা যাবে।

ভারতের পূর্ব প্রান্তের পরিচয় পাওয়া যাবে **প্রাচী পর্বে**। এক সময়ের অনাদৃত ও স্বল্প-পরিচিত রাজ্যগুলি দেখবার জন্য স্বাতি ও গোপাল এল আসামের গৌহাটি শহরে। অরুণাচল রাজ্যের সংবাদ আহরণ করে এগিয়ে গেল নাগাল্যাণ্ডে—ডিমাপুর থেকে কোহিমায়। সেখান থেকে মণিপুর রাজ্যের ইম্ফল ও মৈরাঙে, কাছাড়ের শিলচর থেকে মিজোরাম রাজ্যের আইজলে। তারপর ত্রিপুরা রাজ্যের ধর্মনগর আগরতলা ও উদয়পুরে ত্রিপুরা সুন্দরীর দর্শন করে ঘরে ফেরা। এই সব রমণীয় রাজ্যের শুধু বর্ণনা নয়, রাজ্যবাসীদেরও শিল্প-সংস্কৃতি ইতিহাস ও রাজনৈতিক চেতনার কথা পাওয়া যাবে এই পর্বে।

তারপর ?

জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক